ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

নিতাই তান্ত্রিকের চোখ

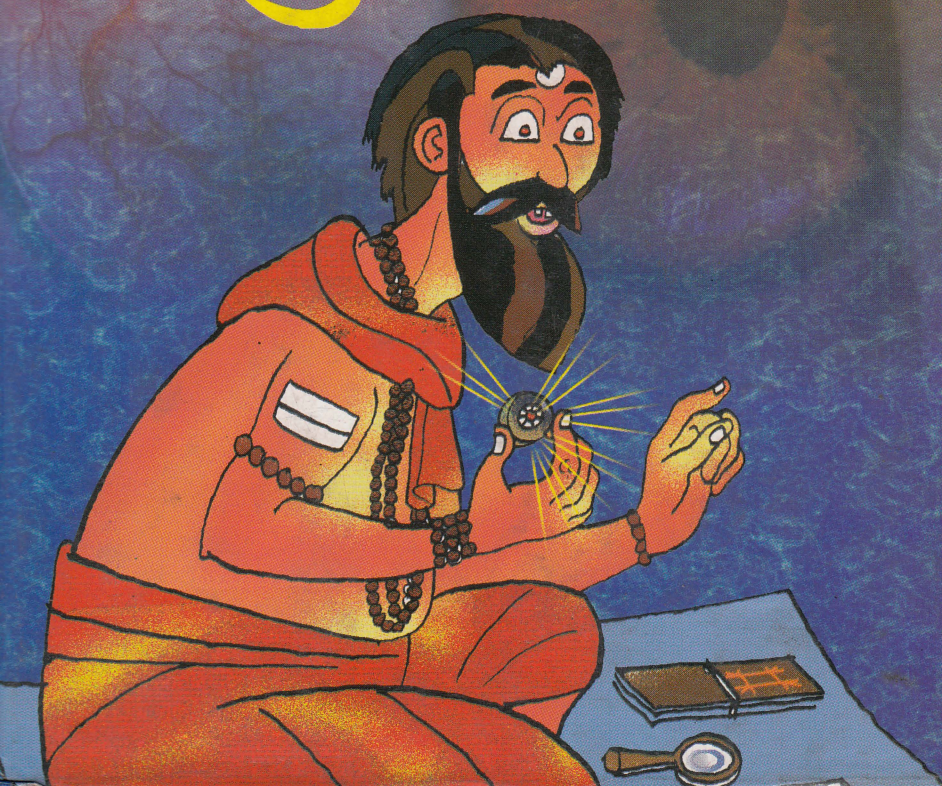

মিজো তান্ত্রিকের চোখ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get More
Free
eBook

VISIT
WEBSITE

Click here

মিজো তান্ত্রিকের চোখ

শ্রীপাদ চট্টোপাধ্যায়

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

॥ নিউ ভৈরব গ্রন্থালয় ॥

১০বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ২০১৩

ISBN 978-93-81673-43-0

প্রকাশক ঃ
ভৈরব গ্রন্থালয়
এস. সাহা চৌধুরী
৪৫, মানিক বোস ঘাট স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ
কেয়া হাজরা

অক্ষর বিন্যাস ঃ
ভৈরব গ্রন্থালয়

মুদ্রকঃ
মডার্ন প্রেস
কলকাতা - ৭০০ ০১৩

মূল্য ঃ
৬০·০০

ভূমিকা

মিজো তান্ত্রিকের চোখ এক অবিশ্বাস্য কাহিনী। কেউ বিশ্বাস করলে বাস্তব, না করলে শুধু গল্প। আমার পঁচিশটি গল্পের মধ্যে এই গল্পটিই যে সেরা তা নয়। মাপে যাই হোক না কেন হাতের পাঁচটি আঙুলই সমান। নানা স্বাদের নানা রঙের গল্পের সমন্বয় এই গ্রন্থে। এ সবই আমার জীবনের অভিজ্ঞতালব্দ কাহিনী দিয়ে গড়া। একটি সাজিতে যেমন অনেকরকম ফুল থাকে আমার ঝুলি থেকে তেমনি অনেক রকম গল্প নিয়ে একটি মালা গেঁথে উপহার দিলাম গল্পপ্রিয়দের।

এইসব গল্পের মান এক নয়। কোনও গল্পে রহস্যের হাতছানি, কোনও গল্পে অলৌকিকত্বের ছায়া, কোনও গল্পে অধরা মাধুরী। অর্থাৎ ভিন্ন স্বাদ ও ভিন্ন রুচির সমন্বয় এর প্রতিটি গল্প। আশা করি এই বইয়ের সব গল্পই পরিণত অপরিণত সকলেরই প্রিয় হবে। তার কারণ আমি বয়সের মাপকাঠিতে গল্প লিখি না। লিখি ছোট বড় সবার জন্য।

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

	বিষয়		পৃষ্ঠা
১.	❁ মিজো তান্ত্রিকের চোখ	[রহস্য]	৫
২.	❁ মহাপ্রভু	[ব্রহ্মদৈত্য]	১৫
৩.	❁ বৈকুণ্ঠের হাড়ি	[চমকপ্রদ]	২০
৪.	❁ বিষমভরার বাঘ	[মজার]	২৬
৫.	❁ বাঘমারণ মন্ত্র	[ঐ]	৩৩
৬.	❁ বুরুডিপাসের আতঙ্ক	[অভিযান]	৪২
৭.	❁ ভোলা ডাকাতের আত্মকাহিনী	[ডাকাত]	৪৯
৮.	❁ আলতাবাবা	[মজার]	৫৭
৯.	❁ গুরুদেবের বিপত্তি	[ঐ]	৭০
১০.	❁ শ্রীযুক্ত ব্যাকরণবিদ	[ঐ]	৭৫
১১.	❁ কুন্তীঘাটের পাঁচালি	[অভিজ্ঞতা]	৮০
১২.	❁ চন্দনবিলের জন্মকথা	[উপকথা]	৮৫
১৩.	❁ দেবীদহর কাহিনী	[ঐ]	৮৮
১৪.	❁ বাজডাঙার মাঠ	[জীবন রহস্য]	৯৩
১৫.	❁ জবানবন্দি	[গোয়েন্দা]	৯৭
১৬.	❁ ঝড়ের রাতে	[ঐ]	১০১
১৭.	❁ দেবশিশু	[অন্যান্য জীবন]	১০৬
১৮.	❁ বনদেবী	[রহস্য]	১১১
১৯.	❁ অদ্ভুত রোগ	[বাস্তব]	১১৭
২০.	❁ গ্রহের ফের	[মজার]	১২২
২১.	❁ শুভ জন্মদিন	[বাস্তব]	১২৭
২২.	❁ অভিমান	[ঐ]	১৩৭
২৩.	❁ মা! আমার মা	[ঐ]	১৪৫
২৪.	❁ রাজবাড়ির রহস্য	[রহস্য]	১৫৯
২৫.	❁ ঝরা বকুলের ওরা	[গোয়েন্দা]	১৬৭

মিজো তান্ত্রিকের চোখ

রিমঝিম বর্ষার দিন। মাঝেমধ্যে বিদ্যুতের চমক আর গুরুগুরু মেঘের গর্জনে দিনটা কেমন বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল। খানাখন্দে ভরা হাওড়া শহরের পথঘাটগুলো নোংরা জল ও প্যাচপ্যাচে কাদায় ভরা। বর্ষার এই ক-টা মাস তাই কর্মের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনো প্রয়োজনে ঘর থেকে বেরাতে ইচ্ছে করে না।

ইলিশমাছ আর খিচুড়ি খেয়ে দুপুরটা তাই অলসভাবেই কাটাচ্ছিলাম। হাতের কাছে একটি বই ছিল, পঞ্চাশটি ভূতের গল্প। প্রথম গল্পটি পড়ে গল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে একটু চিন্তাভাবনা করছিলাম। ভূতের গল্প দুপুরের চেয়েও রাতে জমে। তাই বইটা রাতের জন্য মুড়ে রেখে খবরের কাগজের পাতায় চোখ রাখলাম। সিনেমার পৃষ্ঠায় এসে হঠাৎই থমকে গেল দৃষ্টিটা। খুব ভালো একটা ছবি হচ্ছে পার্বতীতে। মেট্রো গোল্ডুইন মায়ারের ছবি।

স্টুয়ার্ট গ্র্যাঞ্জার হিরো। স্কারামাউচ। ঘড়ির কাঁটায় তখন পৌনে দুটো। তাড়াতাড়ি পাজামার ওপর পাঞ্জাবিটা গলিয়ে নিয়ে একটু ভদ্রোচিত প্রসাধন সেরে পরিপাটি চুল আঁচড়ে ছাতা নিয়ে বেরোলাম।

পথ এখন নির্জন। সবে সকাল হওয়ার মতো। আকাশের রং পচা মাছের আঁশের মতো। সেই সঙ্গে সমানে রিমঝিম বৃষ্টি। কোথায় যে নিম্নচাপ বা ঊর্ধ্বচাপ হয়েছে তা কে জানে? সহ্যের সীমা একেবারেই ছাড়িয়ে গেছে। মাঝেমধ্যে এক আধজন ছত্রপতি পথচারী ছাড়া পথে লোক নেই বললেই চলে। পথের ধারে রুগ্ন কৃষ্ণচূড়ার ভিজে ডালে কাকেরা গা-ঝাড়া দিচ্ছে। একজন বিহারি ঠ্যালাওয়ালা লম্বা লম্বা লোহার রড বয়ে নিয়ে কোথায় যেন চলেছে। তার গায়ের তামাটে রং বৃষ্টিতে ঘামে চ্যাটচ্যাট করছে। একজনের পুরোনো একটি ভাঙা বাড়ির বুকে বসে মুখ চেনা এক পাগল প্রলাপ বকে যাচ্ছে অনবরত। চলার গতি একটু দ্রুত করলাম।

বড়ো রাস্তার ধারে সারি সারি সাইকেল রিকশা অসহায়ের মতো ভিজছে। চালক নেই। চালকদের যুক্তি বৃষ্টিতে ভিজে দশ টাকার ভাড়া টানতে গিয়ে একশো টাকার ওষুধ খরচ হয়ে যাবে।

যাই হোক, জোরে পা চালিয়ে সিনেমা হলে এলাম। কিন্তু বিধি বাম। কেন-না হাওড়া শহরে কাক শালিখ চড়ুই-এর সঙ্গে অনেক ঘুঘুও বাসা বেঁধে আছে তা আমার জানা ছিল। কিন্তু আমার চেয়েও অনেক বেশি বাস্তুঘুঘু যে এখানে ছিল তা-ই শুধু জানতাম না। তারা এসে আমি পৌঁছোবার অনেক আগেই হলটিকে হাউস ফুল করে রেখেছিল। সংখ্যায় তারা অনেক। গিজগিজ করছে। গুড় পড়লে পিঁপড়ে এসে যেমন চারদিক থেকে ছেঁকে ধরে, ঠিক সেইভাবেই হলটিকে ছেঁকে ধরেছে তারা। এই বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য হলের কাছে যাওয়া তো দূরের কথা, তার ধারে কাছেও যাওয়ার উপায় নেই।

এদিকে বৃষ্টি তখন আরও জোরে নামল।

রাগে, ক্ষোভে, হতাশায় এবং বিরক্তিতে ভরে উঠল মন। আজ এই মেঘ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ঘর থেকে না বেরোলেই হত। এই মুহূর্তে কী করব যখন ভাবছি, ঠিক তখনই একটা বাহান্ন নম্বর বাস এসে থামল সিনেমা হলের সামনে। আপাতত বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য তাতেই উঠে পড়লাম।

এই বাস রামরাজাতলা পর্যন্ত যাবে। সেখানে গেলে যা হোক করে কিছুটা সময় অন্তত কাটিয়ে দেওয়া যাবে তবু।

হাওড়া শহরের এই অঞ্চলের বাসের যাত্রীরা এখনও বিশ্বাস করেন না এই শতাব্দীতেই চাঁদে মানুষ গেছে বলে। এমন বিরক্তিকর বাস জার্নি আর কোনো রুটে আছে বলে মনে হয় না। যাই হোক, এক হাত অন্তর থমকে থমকে দাঁড়িয়ে নৌকোর মতো দুলে দুলে ঠ্যালাগাড়িকে সাইড দিয়ে বাস একসময় রামরাজাতলায় এল। বাস থেকে নেমে শরীরটা একটু টান করে আমি নিজেই নামলাম, না আমার বদলে অন্য কেউ নামল তা অনুমান করে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। জায়গাটা দারুণ জমজমাট। প্রতিবছর রামনবমী থেকে শ্রবণ মাসের শেষ রবিবার পর্যন্ত এখানে মেলা বসে। এখন মেলার সময়। গুড়ের জিলিপি আর পাঁপড় ভাজার গন্ধে চারদিকে ম-ম করছে। চারদিকে খেলনা, পুতুল আর কাচের চুড়ির দারুণ রমরমা এখানে। সকালের দিকে এখানে বড়ো বাজার বসে। দুপুর থেকেই জায়গাটা মেলার চেহারা নেয়। মানুষের মিলন মেলায় যেন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এক জায়গায় একজন লোক জাম্বুবানের মূর্তির পাশে বসে পদ্মফুল বিক্রি করছিল। তার কাছ থেকে একটি ফুল কিনে ঠাকুরকে দিলাম।

এমন সময় পেছন থেকে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল। কে ডাকে? ফিরে তাকিয়েই অবাক।

'আরে, ত্রিলোচনদা!'

'তুই এখানে?'

'তুমি এখানে?'

'আমি তো এখানেই থাকি, ব্যাতড়ে। বিয়ে করেছি। তুই গেলে তোর বউদি খুব খুশি হবে। আয় না একদিন আমার বাড়িতে।'

'সে যাবখন। এখন বলো তুমি কেমন আছ? কত দিন পরে দেখা। তোমার এখন চলছে কেমন করে?'

'যেভাবে সারাটা জীবন চালিয়ে এলাম, ধান্দাবাজি করে।' বলেই খিখি করে হাসতে লাগল ত্রিলোচনদা।

ত্রিলোচনদার চেহারাটা এখন মড়িপোড়া বামুনদের মতো। তার ওপর আধা তান্ত্রিকের বেশবাস। বাঁশতলা শ্মশান থেকে ক্যাওড়াতলা পর্যন্ত সর্বত্র

অবাধ বিচরণ ছিল একসময়। থাকত তখন কোঁড়ার বাগানে। পেশা ছিল হাত দেখে পয়সা রোজগার করা। পরে একবার গঙ্গাসাগরের মেলার সময় একদল ফিচেল সাধুর সঙ্গ নিয়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে যায়। তারপরে এই দেখা। এও তো অনেক দিন হয়ে গেল। ত্রিলোচনদা এমনিতেই যাই হোক হাত কিন্তু ভালোই দেখতে পারত। অনেকের অনেক ব্যাপারে হাতে হাতে ফল, এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিন্তু আমি অনেকবার পেয়েছি। এখন নিশ্চয়ই আরও পোক্ত হয়েছে। ওর পরনে লাল চেলি। গলায় মোটা মোটা কুলবিচির মালা। যদিও এটাকে রুদ্রাক্ষ বলে চালানো হয়। যাই হোক, মাথায় ঘাড় অব্দি লটকানো চুল। আমার একটা হাত খপ করে ধরে ত্রিলোচনদা বলল, 'আয় এদিকে আয়।'

আমি ওর সঙ্গে গিয়ে একপাশে ওর আস্তানায় বসলাম। আস্তানাটা পাকাপোক্ত নয়। অস্থায়ী। কেন-না সকালে বাজার বসলে ওকে শংকর মঠে অথবা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে চলে যেতে হয়। দুপুর থেকে রাত্রি পর্যন্ত এখানেই থাকে এবং বিশ্বাসী লোকেদের হাত দেখে।

যাই হোক, একটি তৈলাক্ত বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বেশ জুতসই হয়ে খুব যত্ন করে গাঁজার কলকেটিকে সাজাতে লাগল ত্রিলোচনদা। দেখেশুনে বললাম, 'আগে তো ঘনঘন বিড়ি খেতে। এই কলকে সেবাটা কতদিন ধরলে?'

ত্রিলোচনদা হেসে বলল, 'অনেক দিন। স্বভাবদোষে আরও অনেক নেশাই করে ফেলেছি রে। তা যাক, তোর খবর কী বল? লেখাপড়ার তো গয়ংগচ্ছ হয়ে গেছে অনেক দিন। চাকরিবাকরি কিছু পেলি?'

'তা যদি পেতাম তাহলে কি তুমি আমাকে এই বৃষ্টির দুপুরে রামরাজাতলায় দেখতে পেতে?'

ত্রিলোচনদা হেসে বলল, 'তা ঠিক।' তারপর কলকেটা না ধরিয়েই একপাশে সেটাকে সরিয়ে রেখে বিড়ি ধরিয়ে তাতেই একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'চা খাবি?'

'তা বাদলার বাজারে এক কাপ হলে মন্দ হয় না।'

কাছেই একজন চা-ওয়ালা বসেছিল।

ত্রিলোচনদার নির্দেশে ভাঁড়ে করে দু-ভাঁড় চা এগিয়ে দিল আমাদের দিকে।

দুজনে নীরবে বসে চা খেলাম।

চা-পর্ব শেষ হতেই ত্রিলোচনদা বলল, 'তোর হাতটা একবার দেখি রে? এখনও তোর চাকরিবাকরি কেন হল না সেটাই তো চিন্তার বিষয়। আমি আগেও তোর হাত দেখেছি। খুব একটা খারাপ হাত তো নয়, তাহলে?'

হাত দেখানোর বেলায় প্রত্যেকেরই একটা দুর্বলতা থাকে। তার ওপরে সেটা যদি ফোকোটিয়ায় হয় তো কথাই নেই। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে বাধ্য ছেলেটির মতো আমার হাতটা ওর সামনে পেতে দিলাম। তার কারণ এই একটা ব্যাপারে ত্রিলোচনদার বদনাম নেই। তাই ওর কাছে হাত দেখাতে একটুও দ্বিধা করলাম না। আমার হাতটা বেশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে প্রতিটি রেখার ওপরে তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে হঠাৎই উল্লসিত হয়ে লাফিয়ে উঠল ত্রিলোচনদা, 'মাই গড!'

আমি বললাম, 'কী হল!'

'এ কি তোর হাত?'

'কার হাত তবে?'

ত্রিলোচনদা আমার হাতটাকে আরও টিপে টিপে আতস কাচ দিয়ে আরও ভালোভাবে পরীক্ষা করে বলল, 'উঁহু! ভুল হবার নয়। এত ভুল তো আমি করব না বাবা। তোর কপাল যে খুলে গেছে রে।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে কপালে হাত বুলিয়ে বললাম, 'কোথায় খুলে গেছে? কপাল তো কপালের জায়গাতেই সাঁটা আছে দেখছি।'

ত্রিলোচনদা গম্ভীর মুখে বলল, 'ফাজলামির ব্যাপার নয়। তোর হাতের রেখায় আমি যুবচন্দ্রিমা যোগ প্রত্যক্ষ করেছি।'

'সে আবার কী?'

'খুব শিগগির বাড়ি গাড়ি সম্মান প্রতিপত্তি সবকিছুই পাবি তুই। ধুলো মুঠো করলে সোনা হয়ে যাবে একদিন। সে দিন তোর এসে গেছে। আর কী চাই তোর বল?'

আমি নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। বললাম, 'সত্যি বলছ ত্রিলোচনদা?'

'তুই আমার চেয়ে কত ছোটো। তোকে কখনও মিথ্যে কথা বলতে পারি, না তোর সঙ্গে রসিকতা চলে?'

নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্‌বাণীর কথা শুনলে কে আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে? আমিও পারলাম না। তাই আনন্দে ডগমগ হয়ে বললাম, 'তোমার হাত দেখার পারিশ্রমিক কত ত্রিলোচনদা?'

ত্রিলোচনদা হেসে বলল, 'সে যাই হোক না, তোর কাছ থেকে কখনও টাকা নিতে পারি? তা ছাড়া আমি তো নিজের ইচ্ছেতেই হাত দেখেছি তোর।'

আমি বললাম, 'বুঝলাম, কিন্তু এমন একটা ভবিষ্যদ্‌বাণী, দক্ষিণা না দিলে যদি বিফলে যায়?'

'আমি হাত দেখতে পাঁচ টাকা নিই। তুই এক কাজ কর, ষোলো আনা দে। আর একটু গরম আলুর চপ মুড়ি নিয়ে আয়। বর্ষার বাজারে জমবে ভালো।'

আমি বললাম, 'আলুর চপ মুড়ি আসছে। কিন্তু দক্ষিণা তোমাকে পাঁচ টাকাই নিতে হবে। আর কপাল যদি খোলে তবে পরে তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে যাব।' বলে পাঁচটি টাকা ওর হাতে দিলাম।

ত্রিলোচনদা 'জয় মা, জয় মা, সবই তোমারই ইচ্ছা' বলে আমার দেওয়া টাকাটা ঝুলিতে রাখল। আমিও পাশেরই একটি দোকান থেকে ঠোঙা ভরতি আলুর চপ মুড়ি নিয়ে এসে ভাগাভাগি করে দুজনেই খেতে লাগলাম। সেই সঙ্গে পাশে বসে থাকা চা-ওয়ালাকে আরও দু-ভাঁড় চায়ের অর্ডার দিলাম।

খেতে খেতেই অনেক গল্প হল।

আমি দারুণ কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'সেই যে তুমি উধাও হয়ে গেলে, তা ফিরলে কবে? কোথায় কোথায় ঘুরলে?'

'সে অনেক জায়গায়।'

'তবু?'

'প্রথমেই গেলাম পশ্চিমে। তারপরে উত্তরে হিমালয় ঘুরে চলে এলাম কামরূপ কামিখ্যেয়। সেখানেই ছিলাম দীর্ঘদিন। পরে এখানে এসেছি। তাও তো বছর দুই হয়ে গেল।'

'কামাখ্যা কেমন লাগল তোমার?'

'ভারী চমৎকার। সেখানে এক তান্ত্রিকের সংস্পর্শে এসে কত কি যে শিখেছি তা কী বলব। গাছ উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি। মানুষকে ভেড়া বানিয়ে দিতে পারি।'

'বলো কী? নিজের কপাল ফেরাতে পারো?'

ত্রিলোচনদা খিকখিক করে হেসে বলল, 'পারি বই-কি।'

'তা হলে ফেরাচ্ছ না কেন?'

'ওইখানেই তো গণ্ডগোল রে ভাই। রাজমিস্ত্রি অন্যের ঘর তৈরি করে কিন্তু তার নিজের ঘরটা করে না। কপাল ফেরানোর অনেক জ্বালা, বুঝলি? এসবই ইন্দ্রজালের ব্যাপার। লোকের চোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তা ছাড়া কিছু পেতে গেলেই কিছু দিতে হয়। আর সে দেওয়া যেমন-তেমন নয়। বড়ো কঠিন মূল্য।'

ত্রিলোচনদার কথার কোনো ঘের পেলাম না আমি। বললাম, 'কী তুমি বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো তো, ভাগ্য ফেরাবে কলাকৌশলে। তার জন্য কঠিন মূল্য দিতে হবে কেন?'

ত্রিলোচনদা আমার চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎই বলল, 'এর উত্তর আমার এই ঝোলার ভিতরেই রয়েছে। দেখবি?' বলেই ঝোলার ভিতর থেকে কী যেন একটা বের করে বলল, 'বলতে পারিস, এটা কী?'

আমি বেশ কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে বললাম, 'মনে হচ্ছে এটা একটা চোখ। স্ফটিক পাথর কিংবা কাচের।'

ত্রিলোচনদা বলল, 'মনে হচ্ছে নয়, সত্য সত্যই। তবে কিনা এটা কাচ বা পাথর কোনো কিছুই নয়। মানুষের এবং সজীব। হাত দিয়ে দ্যাখ।'

আমি হাত দিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। জেলির মতো নরম আর বরফের মতো ঠাণ্ডা। সেটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে বুঝলাম মানুষেরই চোখ, ছুরি দিয়ে কেটে অথবা উপড়ে আনা। যেন এইমাত্র কোনো মৃতের শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনেছে কেউ। বললাম, 'আরে, তাই তো! কার এটা?'

'মিজোরামের এক তান্ত্রিক সাধকের। আমার গুরুর কাছ থেকে পেয়েছি এটা।'

'কিন্তু...।'

'কিন্তু কী?'

'এতে পচন ধরেনি কেন?'

'ওইখানেই তো রহস্য! এটা কি তোর আমার চোখ? মিজো তান্ত্রিকের চোখ এটা। চোখের এই মণি কোনো জন্মান্ধর চোখে লাগালে সে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। এর মস্ত গুণ, এর কাছে যে যা চাইবে সে তাই পাবে। অবশ্যই কঠিন মূল্য দিয়ে। ওই যে বললাম না, কপাল ফেরানোর কথা, তা এরই অলৌকিক ক্ষমতার গুণে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'সেইজন্যই বুঝি ভয়ে তুমি ওর কাছে কিছু চাওনি?'

'চেয়েছিলাম। সুন্দরী একটি বউ। পেয়েওছি। কিন্তু তারপরই যা আমি হারিয়েছিলাম, তুই ছেলেমানুষ, তা তোর কাছে বলবার নয়।'

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'এই জিনিস যদি এতই বিপজ্জনক, যার কাছে কিছু চাইলে সে কঠিন মূল্য না নিয়ে অর্থাৎ মারাত্মক রকমের ক্ষতি না করে কিছু দেবে না, তখন সেটাকে তুমি অযথা বয়ে বেড়াচ্ছ কেন?'

'সেও আর এক রহস্য। কেউ যদি মূল্য দিয়ে আমার কাছ থেকে একে কিনে নিয়ে যায়, তবেই আমি মুক্তি পাব এর অশুভ প্রভাব থেকে। আর যদি আমি কোথাও ওটিকে ফেলে দিয়ে আসি, তবে ওটা নিজের থেকেই আবার আমার কাছে ফিরে আসে।'

'বলো কী!'

'হ্যাঁ। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার কী জানিস, এটা কাছে থাকলেই সবসময় মনে হয় এর কাছে কিছু না কিছু চাই।'

আমি একটু গম্ভীর হয়ে বললাম, 'এসবই তোমার গাঁজার প্রভাব। আজ থেকে তুমি কলকে সেবা বন্ধ করো, দেখবে এমন কোনো ঘটনাই আর হবে না।'

ত্রিলোচনদা দুঃখ পেয়ে বলল, 'তুই অবিশ্বাস করছিস?'

'কোনো বুজরুকিতেই আমি বিশ্বাস করি না। আমি যদি ওটা তোমার কাছ থেকে কিনতে চাই, তুমি দেবে আমাকে?'

'তুই কি খেপেছিস?'

'না। আমি ওর সত্যাসত্য যাচাই করে দেখব। তাই ওটা আমার চাই। তা ছাড়া তুমি তো বলেইছ আমার যুবচন্দ্রিমা যোগ আছে। তাই হয়তো ওর কাছে কিছু চাইবার সময় হয়েছে আমার।'

'বেশ তবে নে। একটা টাকা দে। কেন-না মূল্য দিয়ে কিনে নিতে হয় তো। আপাতত আমি ওর হাত থেকে পরিত্রাণ পাই। তুইও পরীক্ষানিরীক্ষার পর একসময় কাউকে গছিয়ে দিস এটা। তবে এর গুণাগুণের ব্যাপারটা ক্রেতাকে আগে থেকে জানিয়ে তবেই বেচবি, কেমন? কেন-না এটাই নিয়ম।'

আমি একটা টাকা দিয়েই কিনে নিলাম সেটা। তারপর সেটাকে হাতের মুঠোয় নিয়ে বললাম, 'তোমার অলৌকিকত্ব যদি সত্য হয়, তাহলে আমি যেন লক্ষাধিক টাকার মালিক হই।'

ত্রিলোচনদা হঠাৎই উন্মাদের মতো হয়ে উঠল। চিৎকার করে বলল, 'না-না-না। চাস না। কিচ্ছু চাস না ওর কাছে। ও দেবে। কিন্তু যা নেবে তার মূল্য অনেক বেশি।' বলেই কিছুক্ষণ উদাস চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোর চাওয়া তো হয়েছে। যা চেয়েছিস তা ঠিকই পাবি। এখন আমার জিনিস আবার আমাকেই ফিরিয়ে দে তুই। এক টাকা দিয়ে আমিই আবার ওটা তোর কাছ থেকে কিনে নিতে চাই।'

'কেন?'

'আমার যা হবার হোক। তোর সর্বনাশ যেন না হয়।'

এবার আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম ত্রিলোচনদার কথায়। তাই ভয়ে ভয়ে আবার ওটা এক টাকার বিনিময়ে ত্রিলোচনদাকেই ফিরিয়ে দিলাম। দরকার নেই বাবা, কী থেকে কী হয় তা কে জানে?

এরপরে আর কোনো কথা নয়। ত্রিলোচনদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা বাড়ি চলে এলাম আমি। কিন্তু বাড়ি এসেই অবাক। দেখি বাড়ির চারদিকে লোকে লোকারণ্য। কী ব্যাপার! ব্যাপার কী! সবাই আমার মুখের দিকে কেমন যেন চোখে তাকিয়ে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। বাড়ির ভিতরে কান্নার রোল। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত ওপরে উঠতেই যে নিদারুণ সংবাদ পেলাম, তাতে আর ঠিক রাখতে পারলাম না নিজেকে। কান্নায় ভেঙে পড়ে আমিও লুটিয়ে পড়লাম ঘরের মেঝেয়। এইমাত্র খবর এসেছে আমার

বড়দা কোম্পানির কাজে ব্যাঙ্গালোর যেতে গিয়ে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই কোম্পানির তরফ থেকে মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হিসাবে এক লক্ষ টাকা আমরা পেয়েছিলাম। এরপরে ছিল অন্যান্য বাবদ দাদার সঞ্চয়ের আরও তিন লক্ষ টাকা। তারও পরে অপ্রত্যাশিতভাবে পাওয়া গেল আরও দু-লাখ পঁচিশ হাজার টাকা। অর্থাৎ দ্বিতীয় হুগলি সেতুর জন্য আমাদের পৈতৃক বাড়িটা ভাঙা পড়বে এইরকম নোটিশ এলো। নোটিশে লেখা ছিল এই টাকাটা সরকার আমাদের চার কিস্তিতে দেবেন। কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই সকলকে বরাবরের জন্য এই বাড়ি ছেড়ে আমাদের জন্য নির্ধারিত সরকারি কোয়ার্টারে চলে যেতে হবে, অন্যথায় বাধ্যতামূলকভাবে পুলিশি হস্তক্ষেপে উচ্ছেদ করা হবে আমাদের।

এই ঘটনার অনেক দিন পরে ত্রিলোচনদাকে একদিন মৌড়িগ্রাম স্টেশনে বদ্ধ উন্মাদ হয়ে ঘুরতে দেখেছিলাম। সেই শেষ দেখা। ওর ওই মর্মান্তিক পরিণতিতে সত্যই দুঃখ পেয়েছিলাম।

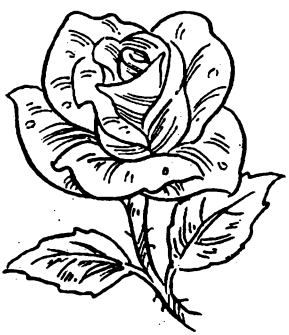

মহাপ্রভু

দারুণ এক প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে আমার শৈশব ও বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছিল। চারদিকে ঘন গাছপালার আচ্ছাদনে ঢাকা একটি বাগানের এক প্রান্তে বিশালকায় একটি প্রাসাদের একাংশে আমাদের দুটি ঘর। সামনে উঠোন। রান্নাঘর। একপাশে ছাদে ওঠার সিঁড়ি। বাড়িটা কোঠা এবং ছাদযুক্ত হলেও পুরোনো বাড়ি। চুনবালি খসা। ইট বের করা। কিন্তু তবুও সেই বাড়িই ছিল আমার স্বর্গ।

সারাটা দুপুর আমার কেটে যেত সেই বাগানময় ঘুরে ঘুরে। কখনও জামরুল গাছের ডালে উঠে বসে থাকতাম। গাছের কোটরে শালিখে বাসা বাঁধত, ডিম পাড়ত, সেই ডিম ফুটে ছানা হলে কী আনন্দই না হত আমার। তবে কিনা পাখির বাসা থেকে কেউ পাখি চুরি করলে ওদের বাবা-মা যখন চ্যা চ্যা করে কাঁদত, তখন আমার চোখেও জল আসত। কখনও বা খেলার

ছলে ঢুকে পড়তাম হলুদ ফুলে ভরা কালকাসুন্দের ঝোপে। ভাঙা পাঁচিলের ধারে বিশাল তেঁতুলগাছের কাছটিতে যেতে খুব ভয় করত আমার। কেননা একেই জায়গাটা ছিল সাপখোপে ভরা ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। তার ওপর ওর পেছনেই ছিল বিদঘুটে নোটাবুড়োর বাড়ি। আচার্যি বামুন। অনেক তুকতাক জানতেন। সবাই বলত লোকটা আসলে ডাইন। তাই ভয়ে ওদিকে যেতাম না।

অলস দুপুরে ঘুঘুর ডাক শোনা, শালিখ কোকিলের গান শোনা আর বেড়াল-কুকুর ও কাঠবিড়ালি তাড়া করে অথবা প্রজাপতি ফড়িং-এর পেছনে ছুটে সময় কাটানোতেই বেশি আনন্দ ছিল আমার।

শীতকালে বাগানের মাটিতে সবুজ ঘাসের বুকে চট বিছিয়ে সুর করে নামতা পড়ার মজাই ছিল আলাদা। কী সুখের দিন ছিল তখন! আর একটা শখ ছিল আমার, সেটি হল পুতুল গড়া। ভালো মাটি দেখলেই কালী দুর্গা ইত্যাদির পুতুল তৈরি করতাম। সেগুলো মোটেই শিল্পকর্ম হিসেবে ভালো হত না। তবুও সেগুলোকে পুজোআর্চা করে পাশের ডোবার জলে বিসর্জন দিতাম। আর জলকাদা ঘাঁটার ফলেই প্রায়ই ভুগতাম সর্দিজ্বরে। আর একটি নেশা ছিল দু'একটি ছেলেপুলেকে কাছে পেলে তাদের নিয়ে মুখে সিঁদুর পাউডার মেখে রাংতার মুকুট পরে যাত্রা করার। কী ছেলেমানুষিই না করতাম তখন। হায় রে! কোথায় হারিয়ে গেল সেইসব দিন।

আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল একটি কুয়োতলা। তার পাশেই ছিল বেশ বড়োসড়ো একটি নিমগাছ। সেই নিমগাছের একটি ডাল আমাদের ছাদের প্রায় অর্ধেকটা অংশ আচ্ছাদন করে রেখেছিল। তবে কিনা তার ফলে আমাদের আলো-বাতাসের কোনো অসুবিধে হত না।

বিকেলবেলা ছাদে বসে মায়ের মুখে রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের গল্প শুনতাম। শান্ত পিসিমা, পদ্মদি—ওরাও আসত মাঝে মাঝে। শীতের দিনে, দুপুর অথবা বিকেলে পাড়ার ছেলেরা এসে বাগানের একটা অংশ পরিষ্কার করে ডাংগুলি খেলত। ব্যাডমিন্টন খেলত। আর অন্যসময়ে চলত গুলি খেলা ও ঘুড়ির মরশুমে ঘুড়ি ওড়ানোর পালা। সবচেয়ে মজা লাগত যখন বড়ো বড়ো ছেলেরা এসে জামরুলগাছ ও নিমগাছকে বেড় দিয়ে ঘুড়ির মাঞ্জা দিত। ওরা চলে যাবার সময় ওদের কাছ থেকে একটু

মাঞ্জা দেওয়া সুতো চেয়ে নিয়ে আমিও ঘুড়ি ওড়ানোর চেষ্টা করতাম। কিন্তু পারতাম না। ঘুড়ি গোত্তা খেয়ে দেওয়ালে অথবা গাছের গায়ে লেগে ফর্দাফাই হয়ে যেত।

যাই হোক, এবার ওই নিমগাছটির কথা বলি। মা বলেছিলেন ওই নিমগাছে নাকি ঠাকুর আছেন। কী ঠাকুর? না ব্রহ্মদত্যি। উনি দেবতার মতো। কারও কোনো ক্ষতি করেন না, ভয় দেখান না। তাই মা সবসময় গাছতলাটি পরিষ্কার রাখতেন, সন্ধ্যেবেলা ধুনো-গঙ্গাজল দিতেন। আমাকেও সাবধান করে দিয়েছিলেন এই বলে যে, ভুলেও যেন কখনও ওই গাছতলাটি নোংরা না করি। তা মায়ের কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতাম। আমার জীবনে মা ছিলেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

তা যাক, মার উপদেশমতো আমি সবসময়ই নিমগাছের তলাটিকে পরিষ্কার রাখতে চেষ্টা করতাম। ঝাঁটপাট দিতাম। ছোটো বালতিতে করে ডোবা থেকে জল তুলে এনে গাছের গোড়ায় ঢালতাম। জায়গা তাই ঝকঝক করত সবসময়। আর জোড় হাত করে গাছের গুঁড়িতে মাথা ঠেকিয়ে মনে মনে বলতাম, 'ঠাকুর আমি ছোটো ছেলে। যদি কখনও ভুলবশত কোনো অপরাধ করে ফেলি তা হলে যেন আমার ওপর রাগ কোরো না তুমি। আমাকে ক্ষমা কোরো।'

ওই গাছে যে ঠাকুর আছেন তা অনেকেই কিন্তু বিশ্বাস করত। আমাদের বাড়ি এবং বাগানের ওপারে ছিল ভণ্ডলুদাদের বাড়ি। ভণ্ডলুদার বউ আমাকে ছেলের মতো ভালোবাসতেন। ওঁদের কোনো ছেলেপুলে ছিল না। ও ছাদ থেকে এ ছাদে আমার মায়ের সঙ্গে গল্প করতেন আর বলতেন, 'আপনার ছেলের যে রকম ঠাকুর-দেবতায় ভক্তি, নিমগাছের ওপর ওর যা যত্ন, তাতে গাছের ঠাকুর ওর ওপর খুবই সদয় হবেন। ওর কখনও কোনো বিপদ-আপদ হবে না। ও খুব বড়ো হবে দেখে নেবেন।'

শুনে ভালো লাগত আমার। তাঁর আশীর্বাদ যে আমি পেয়েছি তা আমি আমার জীবন দিয়ে অনুভব করেছি। তবে দুঃখ এই, তাঁকে কিন্তু আমি একবারও চোখের দেখা দেখতে পেলাম না। তবে কিনা তাঁর উপস্থিতি অনেকবার নানাভাবে উপলব্ধি করেছি। কীভাবে করেছি সেই কথাই এবার বলব।

ছেলেমানুষ। তাই আমার সবসময় খুব ইচ্ছে হত তাঁকে দেখবার। কিন্তু তিনি দেখা দিতেন না। তিনি তো সচরাচর কাউকে দেখা দেন না। তার উপর ছোটোদের তো নয়ই। তাই তাঁর দেখা পেতাম না। তবে এক এক সময় হত কি ছাদে বসে আছি, হঠাৎ দেখি সুগন্ধি ফুলের সুবাসে অথবা ধূপ-ধুনোর গন্ধে ভরে উঠত চারদিক। মা তখনই কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করতেন। আমিও করতাম। শান্ত পিসিমা, পদ্মদিরা থাকলে ওঁরাও করতেন; বলতেন, 'মনে হয় উনি কাছাকাছিই আছেন।'

কখনও মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেলে হঠাৎ শুনতে পেতাম কেউ যেন একটা লোহার বলকে একবার এদিক থেকে ওদিক, একবার ওদিক থেকে এদিকে গড়িয়ে দিচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করতাম, 'ও কীসের শব্দ মা?'

মা বলতেন, 'মহাপ্রভু ভাঁটা খেলছেন।'

ভাঁটা খেলা কাকে বলে তা জানতাম । তবে তখন যেন কেমন ভয় করত।

একদিন গভীর রাতে আবার ওরকম শব্দ হলে বাবা বললেন, 'একবার উঠে গিয়ে লুকিয়ে দেখব কীভাবে কী হয়? কীসের শব্দ ওটা?'

মা আতঙ্কিত হয়ে বারণ করলেন, 'দরকার নেই। ওটা ওঁর নিজস্ব ব্যাপার। দেখে ফেললে যদি উনি বিরক্ত হন, তা হলে কিন্তু ওঁর কোপে পড়ে যাব।'

অতএব বাবা গেলেন না।

এর কিছুদিন পরেই হঠাৎ একদিন একটা অলৌকিক ব্যাপার ঘটল।

আমাদের পাড়ায় হরিসভা উপলক্ষে কেষ্টমঙ্গল হচ্ছিল, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে মা-বাবা দুজনেই গেলেন কেষ্টমঙ্গল শুনতে। কেষ্টমঙ্গল জমে উঠতে অনেক রাত হয়ে গেল। তবুও মায়ের মন। মনটি পড়ে আছে ঘরের দিকে। তাই একসময় বাবাকে ডেকে বললেন, 'যাও না, একবার ঘরে গিয়ে দেখে এসো না কী করছে ছেলেটা। একা আছে। হঠাৎ যদি পাশ ফিরতে গিয়ে ঘুম ভেঙে যায় তো ভয় পাবে।'

বাবা বললেন, 'ঠিকই বলেছ। একবার গিয়ে দেখে আসাই ভালো।' এই বলে বাবা বাড়ির দিকে চললেন। ঘন ঝোপঝাপ ও আগাছার প্রান্তর পেরিয়ে বাবা বাইরের দরজার শিকল খুলে ভেতরে ঢুকেই শিউরে উঠলেন। দারুণ

৬য়ে নিশ্চল হয়ে গেলেন তিনি। বাবা দেখলেন ঘরের মুখোমুখি দক্ষিণ দিকে সিঁড়ির ধাপে মুণ্ডিতমস্তক এক জ্যোতির্ময় পুরুষ একদৃষ্টে আমার ঘরের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

বাবা যে কী করবেন কিছু ভেবে পেলেন না।

মহাপুরুষ কঠিন গলায় বাবাকে বললেন, 'আর কখনও এইভাবে ছেলেকে একা রেখে কোথাও যাবি না।' বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন বাইরের দরজা দিয়ে।

বাবা এত ভয় পেলেন যে আর মাকে ডাকতে যাবার সাহস পেলেন না। ঘরে সে আমাকে জাপটে ধরে কাঁপতে লাগলেন থরথর করে।

বাবার ফিরতে দেরি দেখে অনেক পরে মাও ফিরে এলেন। এসে সব শুনেই তো অবাক। আনন্দে বাবা-মা, দুজনেরই চোখে জল এসে গেল। তাঁদের একমাত্র সন্তানের প্রতি করুণাবতার মহাপ্রভুর এই অসীম করুণার নিদর্শন পেয়ে অভিভূত হয়ে গেলেন তাঁরা। তবে সেই থেকে আমাকে একা রেখে কেউ আর কখনও কোথাও যেতেন না।

পরে বাবার মুখে মহাপ্রভুর বর্ণনা যা শুনেছিলাম, তা এইরকম—

মুণ্ডিতমস্তক। জ্যোৎস্নার মতো ফুটফুটে দেহ জুড়ে রূপের জোয়ার। গলায় পইতে। খালি গা। পরনে ধুতি। পায়ে খড়ম। হাতে একটি বেউড় বাঁশের দণ্ডি। অতি অপরূপ। মূর্তিও বেশ শান্ত এবং সৌম্য।

মহাপ্রভুকে দর্শন করে বাবা নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ওঁর অনেক পরিবর্তনও হয়েছিল। চট করে রেগে যেতেন না। আমাকে বকাঝকা করতেন না। আর আমি? মনের মধ্যে মহাপ্রভুর কাল্পনিক একটা ছবি এঁকে তাঁর ধ্যান করতাম। দিব্যচোখে তাঁকে দেখতে না পেলেও কল্পচোখে তাঁকে দেখতাম। স্কুলে, ঘরের বাইরে কখনও কোথাও গেলে সেই নিমগাছকেই মহাপ্রভু জ্ঞানে প্রণাম করে যেতাম। ফুলের অঞ্জলি দিতাম। দেখতে দেখতে এই নিমগাছই আমার প্রাণ, আমার আরাধ্য দেবতা হয়ে উঠল। শীতকালে কচি কচি রক্তাভ নিমপাতায় গাছের শাখাপ্রশাখাগুলি যখন ভরে উঠত, তখন আনন্দে মেতে উঠত মন। কত পাখি এসে বসত গাছের ডালে। কলরব করত। কী ভালো যে লাগত! আর যখন তখনই ফুলের সুবাস বা ধূপের গন্ধ পেলে তাঁর উপস্থিতি টের পেয়ে ভাবে বিভোর হয়ে যেতাম।

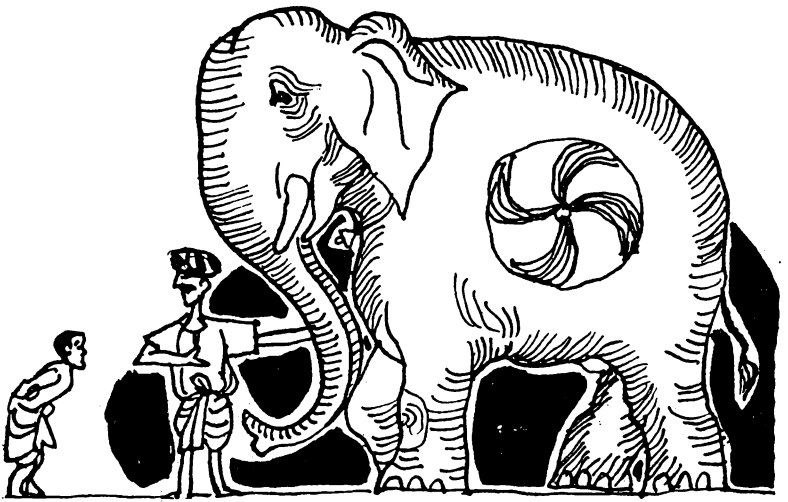

বৈকুণ্ঠের হাতি

বৈকুণ্ঠের একটি হাতি ছিল। ও থাকত লালগঞ্জের কাছে কুন্দপুর নামে এক গ্রামে। হাতি পোষার মতো আর্থিক ক্ষমতা বৈকুণ্ঠের ছিল না। তা হঠাৎ এক রাতে হাতির ডাকে ঘুম ভেঙে গেলে, ও একটা লাঠি হাতে ছুটে চলল বাগানের দিকে। গিয়ে দেখে একটি দামাল হাতি ওর কলাবাগানের অর্ধেক প্রায় তছনছ করে দিয়েছে।

বৈকুণ্ঠ সাহসী ছিল খুব। একটুও ভয় না পেয়ে ও লাঠি উঁচিয়ে ধেয়ে গেল হাতির দিকে। আর কী আশ্চর্য! হাতিটা ওকে তেড়ে আসা দূরের কথা, ওকে দেখেই শুঁড় দুলিয়ে সেলাম জানাল। এই অভাবনীয় ঘটনায় অভিভূত হল বৈকুণ্ঠ। ও লাঠি ফেলে হাতির গায়ে হাত বুলিয়ে অনেক আদর করতে লাগল। তারপর ওর শুঁড় ধরে নিয়ে এল বাড়ির উঠোনে। ছোট্ট একটি ঘরে বউ আর পাঁচ বছরের ছেলেকে নিয়ে থাকত বৈকুণ্ঠ। ওর হাঁকডাকে বউ-বাচ্চাও ঘুম থেকে উঠে এল হাতির কাছে। আর হাতিটা করল কী বৈকুণ্ঠের উঠোনে দুলে দুলে নাচ শুরু করল। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে শুঁড় তুলে পিছনের পায়ে ভর করেও নাচতে লাগল।

বৈকুণ্ঠ আর ওর বউ তো হাতির নাচ দেখে অবাক। হাতি যে এমন

নাচতে পারে তা কে জানত? গল্পে গুজবে এমন শোনা যায়। কিন্তু বাস্তবে? হাতি নাচছে এমন দৃশ্য কেউ দেখেনি। তাই অভিভূত হয়ে গেল ওরা।

বৈকুণ্ঠের বউ বুদ্ধিমতী। বলল, 'দ্যাখো, এ হাতি বুনো হাতি নয়। নিশ্চয়ই কারও পোষা হাতি অথবা কোনও সার্কাস দলের। তা না হলে এমন নাচ ও শিখল কী করে? তাছাড়া মাঝে মাঝে পা দুটোকে নিয়ে এমন করছে যেন ওর সামনে কোনও বল আছে, আর ও বল খেলছে।'

বৈকুণ্ঠ বলল, 'ঠিক বলেছিস বউ। যাক, ও যেখান থেকেই আসুক এখন ও আমাদের। দেখছিস না দেখামাত্রই কেমন পোষ মেনে গেল।'

দেখতে দেখতে সকাল হয়ে গেল। বৈকুণ্ঠের উঠোনে হাতি দেখে তো অবাক সবাই। ছেলেবুড়ো কেউ বাদ গেল না। সবাই এসে ভিড় জমাল বৈকুণ্ঠের উঠোনে। ওর বউ তেল সিঁদুর দিয়ে হস্তিবরণ করল। তাদের মনে আনন্দ আর ধরে না।

গ্রামের মানুষ বৈকুণ্ঠের হাতির পিঠে চাপা বা ঘোড়ায় চাপার অভ্যাস ছিল। কেননা শোনপুরের পশুমেলায় দোকান বসলে ও কাজ পেত। তখনই এ সবে ও রপ্ত হয়েছিল। তাই হাতির আদর-কদর কীভাবে করতে হয় তা ও জানত। এখন তার নিজেরই হাতি। হাতির পিঠে চেপে সে তাই সর্বত্র ঘুরে বেড়াত। এর ফলে অভাবিতভাবে রোজগারও হতে লাগল ওর। এক আনা, দু-আনা, চার আনা, আট আনা, এমনকি এক-দু'টাকাও মিলতে লাগল। সবাই হাতিকে এইসব দিলে হাতি শুঁড়ে করে তা নিয়ে ওর মালিক বৈকুণ্ঠকে দিতে লাগল। এইভাবে কোনওদিন একশো, কোনওদিন দুশো টাকা পর্যন্ত আয় হতে লাগল বৈকুণ্ঠের। ওর সংসার সুখে-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠতে লাগল। হাতির খোরাকের জন্যও ওকে চিন্তা করতে হল না। চারদিক থেকে এত কিছু আসতে লাগল যে তাতেই হাতির পোয়াবারো।

ইতিমধ্যে হাতির একটা নামও দিয়েছে বৈকুণ্ঠ। হাতির নাম রাজলক্ষ্মী। বৈকুণ্ঠর ভাষা রাজলক্ষ্মী বোঝে। বৈকুণ্ঠ যদি বলে হাতি ওঠো, রাজলক্ষ্মী উঠে পড়ে। বসো বললে বসে। ঘাড় নাড়তে বললে ঘাড় নাড়ে। তবে সে শুধু বৈকুণ্ঠের কথাতেই। আর কারও কথায় নয়।

তা এইসময় একদিন কোথা থেকে যেন এক বামন এসে জুটে গেল বৈকুণ্ঠের কাছে। বৈকুণ্ঠ তাকেও রাখল। হাতির স্নান করানো গা মোছানো

ইত্যাদি কাজে একজন লোকের সাহায্যের খুব দরকার। রাজলক্ষ্মী অবশ্য বামনটাকেও মেনে নিল ভালোভাবে।

এই বামনটাই একদিন বুদ্ধি দিল বৈকুণ্ঠকে গ্রাম ছেড়ে হাতি নিয়ে শহরে যাবার জন্য। শহরে গেলে আরও বেশি পয়সা জুটবে। কথাটা দারুণ মনে ধরল বৈকুণ্ঠের। বলল, 'ঠিক বলেছিস বুদ্ধুরাম। শহরে গেলে অনেক পয়সা পাব। তাই দিয়ে ছেলেকে স্কুলে পাঠাব। পাকা দালান ওঠাব। শহরেই যাব আমরা।'

এই কথামতো বৈকুণ্ঠ বউ-বাচ্চাকে ঘরে রেখে বুদ্ধুরাম বামনকে নিয়ে পরদিন খুব ভোর-ভোর রওনা হল শহরের দিকে। এই অঞ্চলে শহর বলতে একদিকে পাটনা, অপরদিকে সমস্তিপুর, মজঃফরপুর। তা ওরা মজঃফরপুরের দিকেই চলল।

যেতে যেতে পথেই রোজগার হল কত। হাতি কখনও নাচে, কখনও গা দোলায়। বৈকুণ্ঠ হাতির পিঠে বসে থাকে। বুদ্ধুরামকে হাতি শুঁড়ে বসিয়ে পথ চলে। সেখানে বসে বুদ্ধুরাম নানা কৌতুক করে। তাতেও পয়সা মেলে প্রচুর।

সত্যি কথা বলতে কী মজঃফরপুরে এসে রাজলক্ষ্মীর পয়ে বৈকুণ্ঠের তখন প্রতিদিন পাঁচশো থেকে হাজার টাকা পর্যন্ত আয় হতে লাগল। সেই টাকার কিছুটা সে নিজের জন্য রেখে বাকিটা মানিঅর্ডারে পাঠাতে লাগল বউয়ের কাছে। বউ আবার সেইসব টাকার কিছুটা সংসারে খরচ করে বাকি টাকা বৈকুণ্ঠের কথামতো জমা দিতে লাগল পোস্টঅফিসে।

এইভাবেই দিন যায়। বামন বুদ্ধুরামও আহ্লাদে থাকে। হঠাৎ একদিন বুদ্ধুরাম একটা বুদ্ধি দিল বৈকুণ্ঠকে। কানে কানে কথাটা বলতেই উল্লসিত হল বৈকুণ্ঠ। তারপরই শুরু করল ধান্দাবাজির কাজ।

মজঃফরপুর ছেড়ে এবার ওরা এল সমস্তিপুরে। এখানে এসেই বুদ্ধুরাম চারদিকে রটিয়ে দিল, 'যে কেউ এই হাতিকে শুয়ে থাকা অবস্থা থেকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারলে হাতির মালিক তাকে একশো টাকা পুরস্কার দেবে। যে তা পারবে না সে ওই একশো টাকা হাতির মালিক বৈকুণ্ঠকে দেবে। তবে বাজি ধরার আগে টাকাটা অবশ্য জমা রাখতে হবে মালিকের কাছে।'

এমন প্রস্তাব শুনে সবাই ছুটে এল বাজি ধরতে। কিন্তু তারা তো জানত না একমাত্র বৈকুণ্ঠের কথা ছাড়া কারও কথাই শুনত না হাতি। যে যতই বলুক না কেন হাতি নট নড়ন-চড়ন।

তা অনেকেই বাজি ধরল। হারল। একশো টাকা খোয়ালো। লাভ হল বৈকুণ্ঠের। সারাদিনে এবার চার পাঁচ হাজার টাকাও লাভ হতে লাগল।

কত বীরপুরুষ কত কসরত করল। কেউ কেউ কলার কাঁদি নিয়ে এসে একটু দূরে রাখল। ভাবল এবার খাবার লোভে হাতি ঠিক উঠে দাঁড়াবেই। কিন্তু না। বয়ে গেছে হাতির। সে যেমন শুয়ে থাকার তেমনি শুয়েই রইল।

অবশেষে টাকার লোভে কোথা থেকে এক বিটলে বামুন এসে জুটল সেখানে। লোকটা বাঙালি। অনেকদিন ধরেই রয়েছে এ দেশে। বামুন এসে অনেক আদর করল হাতিকে। গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, 'ওঠ বাবা ওঠ। তুই একবার উঠে দাঁড়ালে গরিবের বড়ই উপকার হয়।'

হাতির বয়ে গেছে। তার উঠে দাঁড়ানোর নামটি নেই।

বিটলে বামুন অনেক চেষ্টা করেও যখন হাতিকে ওঠাতে পারল না, তখন একটা উপায় বের করল। উপায়টা অবশ্য আগেই থেকেই স্থির করে এসেছিল সে। তাই একটু সূচ নিয়ে সেখানে এসেছিল। সে একটু এদিক সেদিক করতে করতে হঠাৎ সবার নজর এড়িয়ে সেই সূচটা হাতির কুস্থানে পিট করে বিঁধিয়ে দিতেই ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল হাতি।

হই হই করে উঠল সকলে। এর আগের হেরোর দল সবাই একবাক্যে বলল, 'দাও দাও, বামুনকে টাকা দাও। অনেক টাকা কামিয়েছ বাবা তোমরা। এবার তোমাদের টাকা দেবার পালা।'

বৈকুণ্ঠের তো চোখ কপালে উঠে গেল। কীভাবে হয়ে গেল এমন কাণ্ড তা সে ভেবেও পেল না। রাজলক্ষ্মী তো বৈকুণ্ঠের কথা ছাড়া ওঠে না। তা যাক, বৈকুণ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে বামুনের জমা টাকা ও বাজির টাকা মিলিয়ে দুশো টাকা দিয়ে দিল।

এরপর ওখানকার পাট চুকিয়ে ওরা চলে এল একেবারে পাটনা শহরে। গোল ঘরের কাছে ময়দানে ঘাঁটি করল ওরা। যেহেতু শহর বাজার, তাই রেটও চড়িয়ে দিল একটু। তবে এবারে আর ওঠা-বসা নয়। কেননা সেদিনের পর থেকে ওঠা-বসায় বড়ই নারাজ রাজলক্ষ্মী। তাই অন্য পরিকল্পনা করা হল।

এবারে ঠিক হল হাতিকে একবার ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ' একবার 'না' বলাতে

হবে। যেহেতু রাজধানী শহর, তাই বাজির টাকার অঙ্কও বেশি। অর্থাৎ পাঁচশো টাকা জমা। জিতলে হাজার টাকা। সেই সঙ্গে জমার টাকাও ফেরৎ।

আবার ভিড় জমল। আবার চলল বাজি ধরা। চলল অনেক কসরত। সার্কাসের ট্রেনারও এল কতজন। কিন্তু না। বৈকুণ্ঠের হাতির কাছে হার মানতে হল সকলকেই। হাতি শুধুই গা দোলাতে, লেজ নাড়তে লাগল, কিন্তু ঘাড় নাড়াল না কিছুতেই। ফলে বাজি ধরে হারতে লাগল সবাই। আর ফুলে ফেঁপে ঢোল হতে লাগল বৈকুণ্ঠ।

খবর গেল সেই বিটলে বামুনটার কাছে। বামুন তো টাকার লোভে এসে হাজির হল বৈকুণ্ঠের হাতির কাছে। বলল, 'আমি ধরব বাজি। আমিই হাতিকে ঘাড় নাড়িয়ে 'হ্যাঁ' আর 'না' বলাব।'

বৈকুণ্ঠর মুখ তো চুপসে গেল বামুনকে দেখে। কেননা সে বুঝে গেছে এই বিটলেটার অসাধ্য কিছু নেই। কিন্তু কী আর করা যাবে? দিন দশ বিশ হাজার আয় যেখানে, সেখানে এক হাজার টাকা গেলে কী এমন যায় আসে?

বৈকুণ্ঠ বলল, 'ধরো বাজি।'

বিটলে বামুন পাঁচশো টাকা জমা দিয়ে হাতির কাছে গেল। তখন শীতকাল। তাই আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়ে এসেছিল। বামুন সবার অলক্ষ্যে সেই সূচটা পকেট থেকে বের করে হাতিকে দেখিয়ে বলল, 'কী ভায়া, চিনতে পারো?'

হাতি একবার আড়চোখে বামুনকে দেখেই ঘাড় নাড়ল। অর্থাৎ 'হ্যাঁ', চিনতে পেরেছি। তুমিই সেই যন্তর।

বামুন বলল, 'আর একবার দেব নাকি?'

হাতি সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে জানাল, 'না'।

হই হই করে উঠল সকলে। একবাক্যে বলল, 'বাঃ রে বাঙালি।'

বৈকুণ্ঠ আর কী করে? বাজি ধরার সেই পাঁচশো টাকা ও ঘোষণার এক হাজার টাকা দিয়ে বামুনকে বিদায় জানাল।

এরপর আর এখানে থাকা যায় না। তাই আবার গ্রামে ফিরে যাওয়ারই মতলব করল বৈকুণ্ঠ। এদিকে হাতিও খুব নারাজ বেঁটে বামনটার ওপরে। কেননা হাতি বেশ বুঝতে পেরেছে এই মর্কটটার বুদ্ধিতেই এসব খেলায় মন দিয়েছে তার মালিক। তাই বামনটা ওর কাছে গেলেই 'হ্যায়্‌রয়ো' করে

শুঁড়ের এক ঘা বসিয়ে দিত। অবস্থা খারাপ দিকে যাচ্ছে দেখে বামনটাও আর কাছে থাকতে চাইল না। কিছু টাকা-পয়সা নিয়ে কেটে পড়ল একদিন।

তবে বৈকুণ্ঠকে কিছু বলত না রাজলক্ষ্মী। সে তো জানে মনিব তার খুবই সহজ সরল।

খেলা দেখানোর পাট যখন শেষ, বৈকুণ্ঠ তখন হাতির গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, 'চল রাজলক্ষ্মী, আবার আমরা যেখানকার সেখানেই ফিরে যাই। এই কদিনে প্রচুর টাকা রোজগার করেছি আমরা। আর নয়। বেশি লোভ করে কাজ নেই। লোভে পাপ, পাপে বিড়ম্বনা। আবার আমরা আগের মতো পথে পথে ঘুরেই পয়সা রোজগার করব।'

রাজলক্ষ্মী তো খুব খুশি। মনিব মাহুতকে পিঠে বসিয়ে সে আবার নানারকম ঢঙ দেখিয়ে পয়সা নিতে নিতে কুন্দপুরের দিকে চলল।

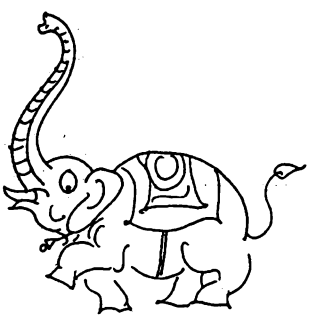

বিষমভরার বাঘ

মাঠের মাঝখানে মস্ত এক মজা দীঘি। নাম বিষমভরা। এককালে এই দীঘি বিষমভাবে ভরা ছিল বলেই হয়তো এইরকম নাম হয়েছিল। কালে দীঘি শুকিয়ে গেল। দীঘি শুকিয়ে গিয়ে ভরে গেল শরবনে। তার সঙ্গে আরো নানারকম গাছপালা গজিয়ে দীঘিটা পরিণত হলো এক গভীর জঙ্গলে। সেই জঙ্গলে একদিন হঠাৎ কোথা থেকে যেন এক বাঘ এসে বাসা বাঁধল।

বাঘটাকে প্রথম দেখল কুশো বাগদী।

তখন বৈশাখ মাস। মাসের শুরুতেই কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় ভিজে মাটি লাঙল দেবার উপযোগী হয়ে উঠল। তাই খুব ভোরে হাল বলদ নিয়ে কুশো চলল মাঠের দিকে।

ভোরের দিকে ফাঁকা মাঠে মনের আনন্দে লাঙল দিচ্ছে কুশো। এমন সময় তার মনে হলো বিষমভরার জঙ্গলের দিকে পিছন ফিরবার সময় কে যেন তার পিঠের ওপর আলতো করে হাত রাখছে। একবার দুবার করে পর পর তিনবার এইরকম হবার পর কুশোর মনে সন্দেহ হলো। সেই দিগন্ত বিস্তৃত ফাঁকা মাঠে কুশো তখন ভয় পেয়ে গেল খুব। মনে মনে ভাবল, ভূতুড়ে ব্যাপার নয় তো? এবার সে খুব হুঁশিয়ার হয়ে পিছন দিকে নজর রেখে বিষমভরার কাছে এলো। বিষমভরার কাছে এসে যেই না সে পিছন হয়েছে, অমনি আড়চোখে তাকাতেই দেখতে পেল জঙ্গলের ভেতর থেকে একটা ইয়া কেঁদো বাঘ বেরিয়ে এসে তার পিঠের ওপর থাবা দিয়ে তাকে আলতো করে ছুঁচ্ছে।

যেই না দেখা অমনি কুশোর চক্ষুস্থির। তবে আর পাঁচজনের চেয়ে কুশোর বুদ্ধিটা একটু সরেস বলে সে তক্ষুণি দৌড়-ঝাঁপ না করে আগের মতোই লাঙল দিতে দিতে মাঠের একেবারে ওপ্রান্তে গিয়ে চোঁ চোঁ দৌড়। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে একেবারে গ্রামের ভেতরে গিয়ে চিৎকার করে উঠল—ওরে কে কোথায় আছিস রে, শিগ্‌গির আয়। বিষমভরায় বাঘ বেরিয়েছে।

কুশোর চিৎকার শুনে গাঁ সুদ্ধু লোক সকলেই ছুটে এলো প্রায়। দুলেদের লক্ষ্মী চোখ দুটো বড় বড় করে বলল—সত্যি বলছ বাঘ? নাকি বাঘের মতো দেখতে অন্য কোন প্রাণী?

কুশোর গা দিয়ে তখন কালঘাম ছুটছে। বলল—কি যে বলো সব। বাঘ বাঘই। বাঘের মতো দেখতে আবার অন্য কোন প্রাণী হয় নাকি? তাছাড়া আমি নিজে চোখে দেখেছি। ইয়া মোটা কেঁদো বাঘ। থাবা বার করে আমার পিঠের ওপর রাখছিল। নেহাৎ বরাৎ জোর, তাই বেঁচে গেছি এ যাত্রা।

গাঁয়ের প্রবীণ হরি ডাক্তার বললেন—তা তোমার হাল বলদের কি হলো?

—সে সব মাঠেই পড়ে রয়েছে ডাক্তারবাবু। কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে এসেছি আমি। একেবারে বুনো বাঘ। বন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। এখনো রক্তের স্বাদ পায়নি বোধ হয়। পেলে আমাকে সহজে ছাড়ত না।

ডাক্তারবাবু এবার কপাল কুঁচকে বললেন—তবে তো মহা সমস্যার বিষয়। তুমি যখন নিজে চোখে দেখেছ বাঘকে, তখন আর তোমার কথায় অবিশ্বাস করি কি করে বলো? এখন বাঘটাকে না মারতে পারলে তো বিপদের শেষ থাকবে না। মানুষ গরু সব খেয়ে শেষ করে দেবে একধার থেকে।

গ্রামের আরো পাঁচজন যারা জড় হয়েছিল, তারাও সকলে একজোট হলো এবার। বলল—তবে আর দেরি কেন? বাঘটাকে কোন রকমেই এখান থেকে পালাতে দেওয়া হবে না। লাঠি-সোঁটা নিয়ে সব এক্ষুণি তৈরী হয়ে পড়ো।

কুশো বলল—সেই ভালো। দিনের আলোয় কোন অসুবিধেও হবে না। চলো সব দল বেঁধে যাই।

এ খবর শুধু যে এই গ্রামেই চাপা রইল তা নয়। আশপাশের গ্রামগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। বিষমভরায় বাঘ ঢুকেছে। বাঁচতে চাও তো সবাই এসো।

আশপাশের গ্রামের লোকেরাও তখন সঙ্গে সঙ্গে নানারকম ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তারপর সবাই মিলে জোট বেঁধে চলল বিষমভরার দিকে।

বিষমভরায় গিয়ে সর্বাগ্রে সকলে মিলে বিষমভরার চারপাশ ঘিরে ফেলল। কিন্তু ঘিরলেই বা হবে কি? বিষমভরা কি একটুখানি জায়গা? গোটা বিষমভরা ঘিরতে গিয়ে সমস্ত দলটাই হাল্কা হয়ে গেল প্রায়। কাজেই সকলে সাহস হারিয়ে অস্ত্রশস্ত্র লাঠি-সোঁটা হাতে নিয়ে বিষমভরার বনের বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল হাঁ করে। ভেতরে ঢুকতে সাহস হলো না কারো। বাইরে থেকেই সবাই বলতে লাগল—কই কুশো! কোথায় তোমার বাঘ?

বাঘ তখন কোথায়? একেবারে গভীর বনের ভেতরে।

অনেক চেষ্টা করেও তাকে দেখা গেল না।

কুশো এদিক সেদিক ঘুরে বলল—এই, এইখানেই ব্যাটা আমাকে থাবাচ্ছিল।

লক্ষ্মী দুলে বলল—তা তো হলো। কিন্তু বাঘকে এখন পাই কোথা?

যেই না বলা অমনি একটা ঝোপের একটু অংশ নড়ে উঠল। আর কুশোও অমনি লাফিয়ে উঠে সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—ঐ। ঐ যে। ঐ দেখো বাঘ। ঐ ব্যাটা বসে আছে।

কুশোকে ঐভাবে লাফিয়ে উঠতে দেখে বাঘটা ভয় পেয়েই হোক বা রেগে গিয়েই হোক একেবারে এক লাফে কুশোর ঘাড়ের ওপর বসে পড়ল।

কুশো তো 'বাবা রে মারে' বলে চিৎকার করে উঠল তখন।

অন্যান্য লোকেরাও তখন ছুটে এলো। তারপর সবাই মিলে এলোপাতাড়ি বাঘটাকে বেশটি করে ঘা কতক দিতেই কুশোকে ছেড়ে দিয়ে বাঘটা এক লাফে বনের ভেতর গিয়ে ঢুকল।

সেই যে ঢুকল আর বেরুলো না।

বাঘের চেহারাটা সবাই তখন চাক্ষুষ দেখে আর তাকে ঘাঁটাতে সাহস করল না কেউ। সবাই মিলে যুক্তি করে চলল তখন থানায়।

এখানকার থানা হলো রায়না থানা। গ্রামের নাম নাড়ুগ্রাম। নাড়ুগ্রাম থেকে রায়না অনেক দূর। তবুও সবাই মিলে দল বেঁধে থানায় গিয়ে বাঘের কথা বলল। বাঘটাকে যাতে সরকারি কায়দায় ধরা হয় বা গুলি করে মারা হয়, তার জন্য চেষ্টা করতে বলল।

থানার দারোগাবাবু সকলের কথা বেশ মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন—ঠিক আছে। তোমরা নিজেরাই আরো দু'একবার চেষ্টা করে দেখো বাঘটাকে মারতে পারো কিনা। তারপর যদি একান্ত না পারো, তখন যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে। আর যদি কেউ মারতে পারো, তবে তাকে নগদ পঞ্চাশটা টাকা আর একটা দোনলা বন্দুক আমরা পুরস্কার দেবো। একথা গ্রামের সবাইকে গিয়ে জানিয়ে দাও।

সবাই তখন গ্রামে ফিরে চারিদিকে ঘোষণা করে দিল কথাটা। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ঘোষণা করাই সার হলো। শুধু হাতে বা সামান্য একটা ধারালো অস্ত্র নিয়ে যে বাঘ মারবে এমন সাহসই বা কার আছে? তাই ঘোষণা শুনে বাঘ মারবার জন্য সাহস করে এগিয়ে এলো না কেউই।

এদিকে পুরস্কারের কথা শুনে কুশোর মন তো অস্থির হয়ে উঠল। সে ভাবল, বাঃ রে। আমি দেখলুম বাঘ, আর বাঘ মেরে টাকা লুটবে আর একজন? এ কখনই হতে দেওয়া যায় না। টাকাটা যে আর একজন নেবে বা বাঘ মারার সম্মানটা যে আর একজন পাবে, কুশো তা কোনমতেই সহ্য করতে পারবে না। কেননা যে লোকটা বাঘ মারবে, লোকের মুখে মুখে তখন তার নামই ছড়িয়ে পড়বে। কুশো যে বাঘটাকে প্রথম দেখেছিল সে

কথা কেউ ভুলেও বলবে না বা সে নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাবে না। তাই না ভেবে কুশোর মেজাজ গেল বিগড়ে। সে তখন নিজেই হঠাৎ পণ করে বসল যে, বাঘটাকে যখন সে-ই দেখেছে, তখন বাঘ মারার সম্মানটাও সে-ই লাভ করবে। অর্থাৎ সে নিজেই মারবে বাঘটাকে।

কুশোর কথা শুনে কুশোর বউ তো অবাক। বলল—সে কি! তুমি গিয়ে বাঘ মারবে কি? এই তালপাতার সেপাইয়ের মতো চেহারা নিয়ে? বাঘ মারা কি যা তা লোকের কাজ? বাঘ মারতে গেলে হিম্মতের দরকার হয় কতো।

কুশো বলল—সে হিম্মৎ আমারও আছে। কেন, আমি কি পুরুষমানুষ নই?

কুশোর বউ এবার কপাল চাপড়াতে লাগল—হায় হায়! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? কি খেতে পাও তুমি যে বাঘের সঙ্গে লড়বে?

কুশো বলল—কোনরকমে বাঘটাকে মারতে পারলেই পঞ্চাশটা টাকা নগদ পেয়ে যাবো বুঝলি? সেই সঙ্গে পাবো একটা দোনলা বন্দুক।

—টাকাটা না হয় কাজে লাগল। কিন্তু বন্দুক নিয়ে তুমি কি করবেটা শুনি? কেমন করে বন্দুক ছুঁড়তে হয় তা তুমি জানো? সামান্য একটা গুলতি দিয়ে কাক মারতে পারো না, আর তুমি ছুঁড়বে বন্দুক?

কুশো বলল—খবরদার বলছি। আমাকে অমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিস না। যেমন করেই হোক বাঘ আমি মারবোই।

কুশোর বউ বলল—বেশ। তাহলে বাঘ মারবার সময় আমাকেও তোমার সঙ্গে নিতে হবে। মরি তো দুজনেই মরব।

কুশোর বউয়ের কথা কুশোর বেশ মনঃপূত হোল। বলল—তা মন্দ বলিস্‌নি বউ। তোতে আমাতে দুজন মিলেই বাঘ মারতে যাবো। কি বল?

এই বলে একদিন ভর সন্ধ্যেবেলা কুশো আর কুশোর বউ চলল বিষমভরার বাঘ মারতে। সন্ধ্যেবেলা গেল তার কারণ বাঘটা লোকজনের ভয়ে দিনের বেলা বেরুত না। বেরুত রাত্রিবেলা।

সেদিন ছিল পূর্ণিমা।

সন্ধ্যের পর সারা মাঠ চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। গ্রামের কাউকে কিছু না জানিয়ে কুশো আর কুশোর বউ বেশ মোটা দেখে একখানা লাঠি আর একগোছা শক্ত দড়ি নিয়ে সাহসে ভর করে চলল বাঘ মারতে।

তারপর মাঠে নেমে যেই না ওরা বিষমভরার কাছে এসেছে, অমনি

বাঘটা করল কি বিকট গর্জন করে তেড়ে এলো দুজনকে। বাঘের সে কি গর্জন! গর্জনের চোটে বাঘ মারা তো দূরের কথা, ভয়ে কুশোর হাত থেকে লাঠি দড়ি দুটোই ছিটকে পড়ল মাটিতে।

কুশোর বউ চেঁচিয়ে উঠল—ওগো তুমি কেন বাঘ মারতে এসেছিলে গো?

বাঘ তখন কুশোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একেবারে দু'হাতের থাবা দিয়ে জাপটে ধরেছে কুশোকে।

কুশোও প্রাণপণে জড়িয়ে ধরেছে বাঘের গলাটা।

সে এক দেখবার মতো দৃশ্য। যেন বাঘে আর কুশোতে বিজয়া দশমীর কোলাকুলি হচ্ছে। দুজনেই দুজনকে জড়িয়ে ধরে সে কি দারুণ ধস্তাধস্তি।

কুশোর বউও এদিকে তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছে—ওগো কত্তা গো! তুমি কেন ঝকমারি করে বাঘ মারতে এসেছিলে গো?

কুশো প্রাণপণে বাঘের গলাটাকে জড়িয়ে থাকতে থাকতেই বলল—তুই খামোকা চেল্লাস না বউ। যা বলি তা কর দিকিনি। আমি কোনরকমে ঠেলে ঠেলে বাঘটাকে একটা গাছের কাছে নিয়ে যাই আর তুই দড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে বেশটি করে গাছের সঙ্গে বেঁধে দে ব্যাটাকে। তারপর দেখ ধোলাই কাকে বলে। এমন মার মারবো যে তখন বুঝতে পারবে কার পাল্লায় পড়েছে বাছাধন।

এই বলে কুশো যথাশক্তিতে বাঘটাকে জড়িয়ে ধরে কোনরকমে ঠেলে-ঠুলে নিয়ে চলল।

ভাগ্যক্রমে কাছেই একটা খেজুর গাছ ছিল। সেই খেজুর গাছের গায়ে বাঘটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল কুশো। তারপর যেই না কুশো বাঘটাকে গাছের সঙ্গে ঠেকিয়েছে, কুশোর বউ অমনি তাড়াতাড়ি দড়ি দিয়ে বেশটি করে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলল বাঘটাকে।

কুশোকে তখন পায় কে! আনন্দে কুশোর বুকের ছাতি তখন এত্তোখানি হয়ে উঠল। বাঘের গলা ছেড়ে দিয়ে পড়ে থাকা লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে সে তখন বেদম প্রহার শুরু করে দিল বাঘটাকে।

বাঘ তো ওরকম মার বাপের কালে খায়নি কখনো। তাই মারের চোটে দারুণ হাঁক-ডাক শুরু করে দিল। বাঘের হাঁক-ডাকে আশপাশের গ্রামের

লোকেদেরও পিলে চমকে উঠল তখন। তারা ভাবল বাঘটা বোধ হয় ক্ষেপেছে। তাই যে যার ঘরে খিল-কপাট লাগিয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল সব।

এদিকে মারের পর মার তার ওপর মার খেয়ে যখন দেখা গেল বাঘটা আর একটুও নড়াচড়া করছে না—একেবারে মরে গেছে, তখন কুশো আর কুশোর বউ মরা বাঘটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল তাদের ঘরের দিকে।

পরদিন সকালে গ্রামের লোক কুশোর ঘরে রক্তাক্ত কলেবরে মরা বাঘটাকে দেখে তো খুবই অবাক হয়ে গেল। তখন বিস্ময়ের আর অন্ত রইল না তাদের। একবাক্যে সকলেই কুশোর প্রশংসা করতে লাগল।

লক্ষ্মী দুলে তাড়াতাড়ি খবর দিয়ে এলো থানায়।

খবর পেয়ে দারোগাবাবু নিজে এলেন বাঘ দেখতে।

বাঘ দেখে সকলের সামনেই কুশোর হাতে গুণে গুণে পঞ্চাশটা টাকা পুরস্কার দিলেন। সেই সঙ্গে দিলেন একটা দোনলা বন্দুক।

বন্দুকটা অবশ্য কুশো নিল না। দারোগাবাবুর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল—আমরা গরীব মানুষ হুজুর। চাষবাস করে খাই। বন্দুক নিয়ে কি করব? তার চেয়ে আপনি একটা 'সার্টিফিকেট' লিখে দিন। বাঁধিয়ে রেখে দেবো।

দারোগাবাবু তাই করলেন। কুশোর পিঠ চাপড়ে তাকে একটা সার্টিফিকেট লিখে দেবেন বলে চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন মরা বাঘটাকে গরুর গাড়িতে করে থানায় পৌঁছে দিতে।

গ্রামের সর্বত্র কুশোকে নিয়ে তখন ধন্য ধন্য রব উঠেছে।

বাঘমারণ মন্ত্র

দুমকার প্রাকৃতিক পরিবেশ চিরকালই অনবদ্য। লাল মাটির ঢেউ খেলানো প্রান্তরে সবুজের সম্ভার নিয়ে দিগন্তবিস্তৃত শাল মহুয়ার বন সত্যিই নয়নমনোহারী। সাঁওতাল পরগনার এই সদর শহর মালভূমি অঞ্চলে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন সার্কাসের তাঁবু পড়েছে কতকগুলো।

শুধুমাত্র গ্রীষ্মের দাবদাহের সময়টা বাদ দিয়ে প্রায়ই যেতাম আমি দুমকাতে। বর্ষায়, শরতে, শীতে, বসন্তে। বসন্তে যখন পলাশে, শিমুলে লালে লাল হয়ে যেত চারদিক—তখন মনে হত যেন রঙের আগুন জ্বলছে। আর বর্ষায় ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধের সঙ্গে গাছপালার গন্ধ মিশে একাকার হয়ে গেলে মনে হত প্রকৃতির এই স্বর্গরাজ্যে একমাত্র আমিই রাজা।

দুমকায় রাঙামাসিরা যতদিন ছিলেন ততদিনই আমার সম্পর্ক ছিল দুমকার সঙ্গে। তারপর ওঁরা ভাগলপুর চলে গেলে আর কখনও দুমকায়

যাইনি। শুনেছি, এখন ওখানকার অনেক প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে। রাঙামাসির ছেলে রুনু ছিল আমারই সমবয়সী। দুমকায় গেলে সারাদিন ওর সঙ্গেই টো টো করে ঘুরতাম। তা সেবার বর্ষার শেষে এবং শরতের শুরুতে যখন দুমকায় এলাম, জলভরা মেঘ তখনও আকাশের পট থেকে বিদায় নেয়নি। দুমকার তখন অনবদ্য রূপ।

তবুও এই সুন্দরের পটভূমিতে হঠাৎ করেই একদিন নেমে এল মৃত্যুর মরণছায়া। জলভরা মেঘের সঙ্গে আতঙ্কের মেঘ একাকার হয়ে দুর্যোগকে যেন আরও বেশি করে ঘনিয়ে আনল। দুমকায় গিয়ে যা শুনলাম তাতে রীতিমতো আতঙ্কিত হলাম।

রুনু বলল, 'তুই তো জানিস না কী সব কাণ্ড হচ্ছে এখানে।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কী হচ্ছে?'

'এখানে বাঘের মতো কোনও জন্তুর শরীরে অপদেবতা ভর করেছে। সে এসে রোজ একটা করে গরু মোষ কিংবা অসতর্ক কোনও মানুষকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার ভয়ে এখন আমরা কেউ আর সন্ধ্যের পর ঘর থেকে বাইরে বেরোই না।'

'সেকি শুধু রাতের অন্ধকারেই আসে? দিনে কোনও আতঙ্ক ছড়ায় না?'

'না। দিনের আলো সহ্য করতে পারে না বলেই হয়তো সে দিনে আসে না। আসে রাত্রি গভীর হলে।

'তা হলে জন্তুটা যে বাঘের মতো তা বুঝলি কী করে?'

'তার পায়ের ছাপ দেখে সবাই বলে।'

'তা হলে তো বাঘই। বাঘের মতো কেন?'

'মধ্য রাতে মাঝে মাঝে তার ডাক শোনা যায়। কিন্তু সে ডাক কোনওমতেই বাঘের ডাক না। জন্তুটাকে দেখবার জন্য, তাকে ধরবার জন্য অনেক ফাঁদ পাতা হয়েছিল। কিন্তু সবই বিফল হয়েছে। গতকাল অত ঝড়-জলেও মহেশ মুর্মু নামে একজন আদিবাসীকে তুলে নিয়ে গেছে।'

শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এর আগে কত রাত পর্যন্ত আমরা চাঁদের আলোয় পদ্মদীঘির টলটলে জলে পদ্মের শোভা দেখতাম, এখন আর তা হবার উপায় নেই। তখনও ভয় ছিল। সে ভয় ভালুকের। তবে তারা সহসা লোকালয়ের দিকে আসত না।

যাই হোক, আমি যেদিন দুমকায় এলাম, সেদিনের আকাশ ঝলমলে থাকলেও মধ্যরাত থেকে প্রবল বর্ষণ শুরু হল। আর সে রাতেই শুনলাম জন্তুটার বীভৎস ডাক। ডাক শুনে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তবে সে ডাক যে বাঘের ডাক নয় তা যে কেউ শুনলেই বলে দিতে পারে।

রাত শেষ হলে, বৃষ্টি থামলে, আবার রোদ ঝলমলে আকাশ। সেইসঙ্গে দুঃসংবাদ,. মাসিদেরই গোয়ালঘরের মাটির দেওয়াল ভেঙে একটি গরুকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে জন্তুটা।

একটু বেলায় জলযোগপর্ব শেষ হলে রুনুকে বললাম, 'জন্তুটা ঠিক কোন-দিক থেকে এসেছে বা কোনদিকে গেছে একটু দেখে এলে হয় না?'

'তাতে লাভ? তাছাড়া কী করে বুঝব সেটা কোনদিক থেকে এসেছে?'

'কেন, কাদায় ওর পায়ের ছাপ তো আছে।'

রুনু কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, 'চল তবে দেখে আসি।'

আমরা দুজনে এই যুক্তি করে কাউকে কিছু না জানিয়েই বাড়ি থেকে বেরোলাম। তারপর বাঘের পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে এগিয়ে চললাম একটা ঢালু প্রান্তরের দিকে। বাঘের পায়ের ছাপ সর্বত্র নেই। যেখানে কাদা সেখানেই আছে। যেখানে পাথর সেখানে নেই। তবে আমাদের পথ চিনিয়ে দিল ধৃত গরুটির রক্তের দাগ। বাঘটি যে গরুটিকে বয়ে নিয়ে যেতে বেগ পেয়েছিল বা তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেছে তার প্রমাণ সর্বত্র আছে।

ঢাল পেরোলেই একটি ঘন শালবন। বাঘ গরুটিকে নিয়ে সেই শালবনেই ঢুকেছে। এখানে কাদার ওপর তার পায়ের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট।

রুনু বলল, 'আর এগোনো ঠিক হবে না। বাঘ ওই শালবনেই আছে।'

আমি বললাম, 'তবু চল না গিয়ে দেখি ওর ঠেকটা কোনখানে। তোদের গরুটাকে কতদূর পর্যন্ত নিয়ে গেছে সেটা তো একবার দেখা দরকার।'

'দেখে লাভটা কী? মাঝখান থেকে বেশি বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে নিজেদেরই জীবন বিপন্ন হবে।'

'কেন বাঘটা তো দিনে আসে না। কারও কোনও ক্ষতি করে না। দিনে নিশ্চয়ই সে ঘুমোয়।'

'কিন্তু লোকের কথা যদি সত্যি হয়, বাঘটা যদি বাঘভূত হয়, তাহলে?

'তাহলে যা হয় হবে, চল তো।'

রুনু বলল, 'যেতে ইচ্ছে যে আমারও নেই তা নয়। তবে কিনা ওই জঙ্গলে নিরস্ত্র শুধু হাতে যাওয়া ঠিক হবে না। তুই একটু বস, আমি দুটো বল্লম জোগাড় করে নিয়ে আসি।'

রুনুর কথামতো আমি বসে রইলাম। একটু পরেই ও এল। তবে একা নয়, সঙ্গে দুটি আদিবাসী ছেলে। দু'জনেরই হাতে তীর কাঁড়। রুনুর হাতে দুটো বল্লম। তার একটা আমি নিলাম। আর একটা ওর কাছে রইল।

আমরা ঢাল পেরিয়ে প্রথমে লালমাটির ঢালে এলাম, তারপর বাঘের পদচিহ্ন ধরে ঢুকে পড়লাম শালবনের ভেতর। পাথুরে মাটি বলে কাদার ভাগ কম। তবুও আমরা ঝরা পাতা ও ভিজে মাটি মাড়িয়ে বনের শেষপ্রান্তে এলাম। বাঘের পায়ের ছাপ এখানেও আছে। কিন্তু বাঘের কোনও পাত্তা নেই। নেই গরুটির ভুক্তাবশেষ।

রুনু বলল, 'আর নয়। কথায় আছে 'সাপের লেখা বাঘের দেখা'। ভাগ্য ভাল তাই আমরা বাঘের খপ্পরে পড়িনি। এখানে কারও কিছু হলে হাঁকডাকেও কেউ আসবে না।'

আমিও ভয় পেলাম এবার।

আদিবাসী ছেলে দুটি কিন্তু নির্ভয়। ওরা আমাদের অপেক্ষা করতে বলে সামনের একটি ছোট্ট টিলা পাহাড়ে কাঠবিড়ালের মতো তরতর করে উঠে গেল। গিয়েই দারুণ আনন্দে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল আমাদের।

ওদের ডাকে আমরা দ্রুত উঠে এলাম টিলার ওপরে। গিয়ে দেখি সেখানেই গরুটার অর্ধভুক্ত দেহটা পড়ে আছে। তার মানে বাঘ শিকার নিয়ে এসে এখানেই খায়। কিন্তু বাঘ বাবাজি থাকেন কোথায়?

যাই হোক, আমরা লোকালয়ে ফিরে সকলকেই বললাম একথা। এও বললাম, ওই টিলার ওপর থেকেই বাঘ সন্ধ্যের পর নজর রাখে লোকালয়ের দিকে, তারপর ওৎ পেতে বসে থেকে ওর সুবিধেমতো নিয়ে যায় সামনে যা পায় তাই।

আমাদের কথা শুনে সবাই খুব বকাবকি করল ওইভাবে ওখানে যাওয়ার জন্য।

সে রাতে আবার বাঘ এল। আবার সেই বিজাতীয় ডাক ছেড়ে একজনদের দু'তিনটি ছাগলকে জখম করে নিয়ে গেল একটিকে। মেঘের মতো কালো রঙ। টর্চের আলোর মতো চোখ দুটো জ্বলছে। কী ভয়ঙ্কর!

পরদিন সকালে ভাগলপুরের দিক থেকে একজন শিকারী এলেন। অনেকদিন ধরেই নানারকম ফাঁদ পেতে বাঘটাকে ধরবার বৃথা চেষ্টা করে স্থানীয় মানুষজন সরকারের প্রচেষ্টায় বাঘটাকে যাতে ধরা হয় তার জন্য আবেদন রেখেছিল। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই শিকারী এসেছেন।

আমাদের মুখে ওই টিলার ওপর বাঘের অবস্থিতির বৃত্তান্ত শুনে তিনি টিলাটি দেখতে গেলেন। আমরাও সাহস পেয়ে হই-হই করে সঙ্গে গেলাম। গিয়ে দেখলাম গরুটির ভুক্তাবশেষ সেখানে ঠিক সেইভাবেই পড়ে আছে। কুকুর, শেয়ালেও ছেঁড়েনি তাকে।

শিকারী বললেন, 'বাঘ ধারে কাছেই কোথাও আছে। তবে আজকের রাতই ওর শেষ রাত।'

এদিকে একটা খবর পাওয়া গেল, কয়েকজন লোক জঙ্গলে কাঠ আনতে গিয়ে দেখে এসেছে এই টিলার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে যে জঙ্গল ও টিলা আছে সেখানেই পড়ে আছে ছাগলটির সামান্য দেহাবশেষ।

শিকারী আবার ছুটলেন সেখানে। সবকিছু দেখেশুনে ফিরে এসে সন্ধ্যের আগেই লোকালয়ের মধ্যে যে বড় বটগাছটা আছে তারই একটির ডালে চুপ করে বসে রইলেন। গাছটি এমনই ঘন ডালপাতায় ঢাকা যে সেখানে কেউ লুকিয়ে থাকলে সচরাচর কারও নজরে পড়বে না।

রাত গভীর হলে আজ আর বাঘের ডাক শোনা গেল না। আমরা নিজেদের মধ্যেই কথাবার্তা বলতে লাগলাম যে বাঘ বোধ হয় শিকারীর আবির্ভাব গন্ধে টের পেয়েছে। তাই আজ আর এল না।

রুনু বলল, 'বাঘটা কিন্তু দারুণ ধূর্ত।'

'কী করে বুঝলি?'

'পরশু আমরা ওই টিলা পাহাড়ে গিয়েছিলাম বুঝে পরদিন ও অন্যদিকের পথ ধরেছে। ছাগলটার দেহাবশেষ পাওয়া গেছে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত দিকের টিলায়।'

আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, 'ঠিক বলেছিস তুই। এমন তো আমার মনে হয়নি। আজ শিকারী এসেছে বলে পাত্তাই নেই তার।'

যাই হোক, পরদিন সকালে আমরা বাইরে বেরোতেই এক মর্মান্তিক সংবাদ পেলাম। যে গাছে শিকারী তাঁর একজন সহকারীকে নিয়ে ছিলেন,

সেই গাছের নিচে শিকারীর বন্দুকটি পড়ে আছে শুধু। শিকারী নেই। নেই তাঁর সহকারীও।

অনেক অনুসন্ধানের পর শহরেরই একটি জলাশয়ের ধারে সহকারীর ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ দেখতে পাওয়া গেলেও শিকারীর কোনও হদিশই পাওয়া গেল না।

বাঘাতঙ্কে দুমকা যখন আতঙ্কিত, ঠিক তখনই কোথা থেকে যেন এসে হাজির হল এক আদিবাসী যুবক। সে এসেছিল এখানেই তার কুটুমবাড়িতে। যুবক বলল, 'তোমরা তো আজকাল ঝাড়ফুঁক মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস করো না। বাঘমারণ মন্ত্র আমার জানা আছে। তোমরা যদি বল তো আমিই ওকে জব্দ করে দিতে পারি।'

মানুষ যখন সর্বক্ষেত্রে অসহায় হয় তখন বাধ্য হয়েই দৈবের শরণ নেয়। সবাই তখন যুবককে কাতরভাবে বলল, 'বিশ্বাস অবিশ্বাস মাথায় থাক, তোমার মন্ত্রতন্ত্র যা কিছু জানা আছে তাই দিয়ে তুমি বাঘের উপদ্রব থেকে আমাদের বাঁচাও দেখি।'

যুবকের বয়স পঁচিশ-ত্রিশের বেশি নয়। ছিপছিপে দোহারা চেহারা। ঘাড় অব্দি লটকানো চুল। হাসি হাসি মুখ। এর আগে এই অঞ্চলে কখনও দেখা যায়নি তাকে। সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে যুবক বলল, 'এখানে বাঘের উপদ্রবের অদ্যই শেষ রজনী। তা দাদাভাইরা, শুধু হাত তো মুখে ওঠে না, আমাকেও একটু দেখ তোমরা।'

এখানকার মাতব্বর গোছের একজন বলল, 'ওর জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। প্রত্যেক বাড়ি থেকে দু'দশ টাকা চাঁদা তুলে তোমাকে দেব আমরা। তুমি আমাদের বাঘের উপদ্রব থেকে বাঁচাও।'

যুবক বলল, 'নিশ্চিন্তে থাকো সব। তবে একটা কথা, আজ সন্ধ্যের পর কেউ যেন বেরিও না ঘর থেকে। শুধু আজকের রাতটা একটু কষ্ট করে ঘরে থেকো সব। কাল থেকে আর কোনও ভয়ের ব্যাপার থাকবে না।'

রুনুর বাবা, অর্থাৎ আমার মেসোমশাই বললেন, 'সন্ধ্যের পর ইদানিং আমরা কেউই ঘর থেকে বেরোই না বাঘভূতের ভয়ে। বাস তো বিকেলেই বন্ধ হয়ে যায় যাত্রীর অভাবে। আজ না হয় একটু আগেই ঘরে খিল দেব সব।'

যুবক বলল, 'এতদিনে তোমাদের অনেক গৃহপালিত পশুর ক্ষতি হয়েছে। আজকের জন্য বাঘভূতের খাদ্যের প্রয়োজনে নধর একটা পাঁঠা চাই।'

সঙ্গে সঙ্গে জন্মান্ধ নজর আলি সাহেবের বাড়ি থেকে একটা ইয়া তাগড়াই বোকা পাঁঠা বাঘভূতের সেবার জন্য পাওয়া গেল।

আদিবাসী যুবক একগোছা কাঁঠালপাতা খাওয়াতে খাওয়াতে পাঁঠা নিয়ে হাসিমুখে বিদায় নিল সেখান থেকে।

সে রাতে বাঘের সেই অপ্রাকৃত বিকট সুরের চিৎকারে দুমকার মাটি কেঁপে উঠল আবার। তারপর সব চুপ। সবাই শান্তিতে নিদ্রা গেল।

পরদিন সকালে আদিবাসী যুবক শোরগোল তুলে দিল চারদিকে। বলল, 'আমার যে কথা সেই কাজ। এখন সবাই গিয়ে বাঘভূত দেখে এসে আমার পেটটা ভরিয়ে দাও। মানে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য কর আমাকে।'

আতঙ্কের বাঘ নিপাত গেছে শুনে সে কী আনন্দ সকলের! সবাই ছুটল বাঘভূত দেখতে। রুনু আমিও ছুটলাম। মেসোমশাই মাসীমাও গেলেন।

আমরা গিয়ে দেখি শালবনে ঢোকার মুখে যে ঢালটা আছে, ঠিক সেখানেই জাগুয়ার ধরনের একটা লম্বা কালো বাঘ শিকার মুখে নিয়ে পড়ে আছে। শিকার বলতে সেই তাগড়াই বোকা পাঁঠা। সেও মৃত। বাঘের গায়ে কোথাও কোনও ক্ষত নেই।

সবাই যুবককে ধন্য ধন্য করতে থাকলে যুবক বলল, 'দেখলে তো বাঘমারণ মন্ত্রের শক্তি কতটা। এখন আমার পাওনাটা তোমরা মিটিয়ে দাও। আর এক জায়গায় গর্ত খুঁড়ে বাঘ ও পাঁঠা দুটোকেই তোমরা পুঁতে দাও। এ বাঘ কোথা থেকে এসে জুটেছিল কে জানে? ওর হয়তো গলার কোনও রোগ ছিল তাই ওর ডাকটা ছিল বিকৃত। এ বাঘের ছাল চামড়া ছাড়াতে নেই। ওর শিকারের বেলাতেও ওই একই নিয়ম। ওদের সমাধিস্থ করে সবাই বেশটি করে সাবান মেখে স্নান করে নিও।'

যুবকের নির্দেশমতো সবকিছু হল।

তারপর চাঁদা তুলে প্রায় এক হাজারের মতো টাকা দেওয়া হল তাকে। অতগুলো টাকা পেয়ে যুবক দারুণ খুশি।

এরপর থেকে আমরা আবার আগের মতো নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াতে

লাগলাম। যুবকের সঙ্গেও আমাদের দু'জনের দারুণ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। একদিন একটি টিলায় বসে প্রকৃতির দৃশ্য দেখতে দেখতে যুবককে বললাম, 'আচ্ছা মিতাভাই, তুমি সেদিন কী এমন মন্ত্র বললে যে বাঘটা ওইভাবে হঠাৎ করেই মরে গেল? মন্ত্রের কি সত্যিই কোনও শক্তি আছে?'

মিতা মানে বন্ধু। যার সঙ্গে মিতালি পাতানো হয়। যুবককে তাই আমরা মিতাভাই বলতাম। আমাদের কথা শুনে যুবক বলল, 'দূর বোকা, ওসব বুজরুকি। মন্ত্রে কখনও বাঘ মরে?' বলে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল।

আমি বললাম, 'তাহলে বলো বিনা আঘাতে বাঘটা মরল কী করে?'

যুবক বলল, 'সবাইকে তো বলব না। তোমাদেরই বলছি। বাঘটা মন্ত্রে নয়, চালাকিতে মরেছে। সেদিন সন্ধ্যের আগে ওই পাঁঠাটাকে আমি গলা পর্যন্ত একটি গাছের সঙ্গে এমনভাবে বাঁধি যাতে ও ঘাড় ফেরাতে না পারে, অনবরত ব্যা ব্যা করে ডাকতে থাকে। পাঁঠাটাকে বেঁধে ওর গায়ের বেশিরভাগ জায়গায় সেঁকো বিষ খানিকটা মাখিয়ে রেখেছিলাম। আমি সাপ ধরতে পারি। বিষাক্ত সাপের মারাত্মক বিষ মাখিয়ে আমি অন্য একটি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে একটি খালি পিচের ড্রাম টান করে বেঁধে তার ভেতরে ঢুকে বসেছিলাম। ড্রামটাকে বেঁধে রেখেছিলাম এই কারণে, যদি সেটা ঝটাপটিতে কোনওভাবে উল্টে যায় তাহলে আমিই বাঘের পেটে যাব। ড্রামের খোলা মুখটা ছিল নিচে। ঢাকাটা ওপরে। দু'-একটা পাথর এনে পা আড়াল করে তার মধ্যে আমি বসেছিলাম অধীর আগ্রহে। নিশ্বাস নেবার জন্য এবং পাঁঠাটাকে লক্ষ্য করবার জন্য দুটো ফুটোও রেখেছিলাম ড্রামে। এখানে আশপাশে ওইরকম পরিত্যক্ত পিচের ড্রাম অনেকগুলো পড়ে থাকতে দেখেই এই বুদ্ধিটা খাটিয়েছিলাম। যদিও এতে জীবনের ঝুঁকি ছিল, তবুও আশ্রয়টি ছিল গাছের ডালে বসে থাকার চেয়েও নিরাপদ। তা সন্ধ্যের পর অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই হঠাৎ দেখি বিকট একটা ডাক ছেড়ে বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়ল পাঁঠাটার ওপর। তারপর এক ঝটকায় সেটাকে দড়িবাঁধা অবস্থায় ছিঁড়ে শালবনের দিকে ছুটল। যে বিষ আমি দিয়েছিলাম তার এতটুকু জিভে লাগলেই চকিতে শেষ। হলও তাই। ঢাল পেরিয়ে বনে ঢোকার আগেই বাঘের দৌরাত্ম্যি খতম। একটু পরে আমি ড্রাম থেকে বেরিয়ে ওর পথ অনুসরণ করেই দেখি ওই দৃশ্য। রাতদুপুরে আর কাউকে জ্বালাতন না করে

ঘরে গিয়ে শুয়ে রইলাম। যেহেতু বিষ প্রয়োগ করেছিলাম, তাই মন্ত্রের মহিমা বোঝাবার জন্য বাঘ ও পাঁঠাকে পুঁতে দেওয়ার কথা বললাম। সাবান মেখে স্নান করতে বললাম। আসল রহস্য তো সকলের কাছে ফাঁস করতে নেই, তাই—।'

রুনু আমি অবাক হয়ে সব শুনলাম। তবে এই ব্যাপার নিয়ে কারও সঙ্গে আমরা কোনও আলোচনা করিনি। বাঘমারণ মন্ত্রের প্রভাবেই সে বাঘ বা বাঘভূতের পঞ্চত্ব হয়েছে এটাই সবাই জেনেছিল।

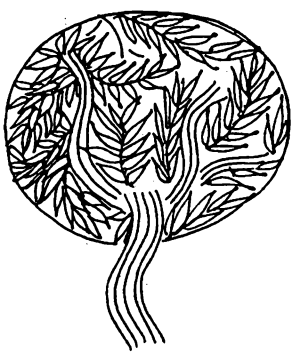

বুরুডিপাসের আতঙ্ক

বাসাডেরা না বুরুডিপাস? চ্যাংজোড়া পেরোলে আরও ভয়ঙ্কর। কাশীদা তামুকপালও অরণ্যময়। সাতগুড়ুম নদীর অববাহিকায় এবং সুবর্ণরেখার উভয় তীরে তখন দুর্ভেদ্য জঙ্গল। লক্ষ্মণ মেটের বাড়ি ছিল বাসাডেরায়। চ্যাংজোড়া পেরিয়ে যেতে হত। তার মুখে আরণ্যক জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনে কাঁটা দিত গায়ে।

আজ থেকে ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগে আমার বয়সই বা কত? খুব জোর বিশ-বাইশ। বি. আর. আই. কেজিপি'র ক্যাজুয়্যাল লেবার হিসেবে 'নো ওয়ার্ক নো পে'-র একটা ছোটখাটো চাকরি পেয়েছিলাম। ঘাটশিলা স্টেশনের অদূরে হিলকার্টের ধারে তাঁবু খাটিয়ে রাত্রিবাস কী মধুময়ই না ছিল! চারদিকে ঘন শাল-মহুয়ার বন। বড়-বড় সেগুন, পলাশ আর তাকে জড়িয়ে ঘন পাতার চিহড়লতায় যেন বর্ণের বাহার। বাঘ-ভালুকের ভয়ে সারারাত আগুন জ্বেলে পাহারা দিত নাইট গার্ড। প্রকৃতির দৃশ্য দেখে ভরে

উঠত মন। দু'চোখ মেলে দূরের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতাম, আর কত কী ভাবতাম! এরই মধ্যে কাজের ফাঁকে অথবা ব্রিজে স্ক্র্যাপ করতে করতে লক্ষ্মণ মেটের মুখে শুনতাম বুরুডিপাসের আতঙ্কের কথা। বুনো হাতির উপদ্রবে তছনছ হয়ে যাওয়া বাসাডেরা অথবা বিধ্বস্ত চ্যাংজোড়ার কাহিনী শুনে ভয় হত। এমনই এক সময় মাঘের শেষে যখন পলাশবনে রঙের আগুন, তখনই একদিন ঠিক হল, আমাদের রেস্ট-ডে-তে আমরা দু'-তিনজন বাসাডেরা গ্রামে গিয়ে লক্ষ্মণ মেটের বাড়িতে থাকব। তারপর ওখান থেকে সোজা চলে যাব বুরুডিপাস। হোক না ভয়ঙ্কর, তবু অরণ্যের ভয়াবহতা কিছুটাও তো অনুভব করতে পারব!

ঘাটশিলার এক টিম্বার-মার্চেন্ট রোজ সকালে ধারাগিরির জঙ্গলে কাঠ আনতে যেতেন। তাঁরই ট্রাকে রওনা হলাম আমরা। রবি, আমি ও কেষ্টদা। লক্ষ্মণ মেট একদিন আগেই চলে গেছেন। দু'দিনের নাগা। আমরা সেই অরণ্য-পর্বতের দেশে ট্রাক-বাহনে অভিযান শুরু করলাম। একসময় অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে বাসাডেরা গ্রামে যখন পৌঁছলাম, তখন সে কী আনন্দ আমাদের! লক্ষ্মণ মেট আমাদের জন্য পথের ধারেই অপেক্ষা করছিলেন। ট্রাক থামতেই আমরা ঝুপঝাপ নেমে পড়লাম।

সবিস্ময়ে আমরা বললাম, 'সত্যি লক্ষ্মণদা, তুমি কী ভাগ্যবান! এত সুন্দর তোমার গ্রাম!'

লক্ষ্মণদা হেসে বললেন, 'কিছুদিন থাকো না, তা হলেই বুঝবে এই সুন্দর কত রোমাঞ্চকর! কীভাবে আমরা বেঁচে আছি এই গভীর বনবাসে।'

লক্ষ্মণদা যাই বলুন না কেন, আমরা অভিভূত। লক্ষ্মণদার বউ আমাদের তেলমাখা মুড়ি, পেঁয়াজ, লঙ্কাভাজা আর ডিমের ওমলেট করে খাওয়ালেন। পাতার জ্বাল দিয়ে একটু ভেলি গুড়ের চায়ের ব্যবস্থাও হল। তাই যেন অমৃত। আশপাশ থেকে অনেক আদিবাসী ছেলেমেয়ে এসে ঘিরে ধরল আমাদের। শহরের মানুষ দেখতে লাগল।

আমরা জলযোগ সেরে নিয়ে গ্রামের মানুষদের বসবাসের বুনো ঝুপড়িগুলো দেখতে লাগলাম। সেগুলোর চেয়েও ভাল লাগল এখানে গাছের ওপর ঘর দেখে।

আমি বললাম, 'লক্ষ্মণদা, গাছের ওপর ঘর কেন? কারা থাকে ওখানে?'

'কেউ থাকে না। তবে খেতে ফসল হলে পাহারা দেওয়ার সময় পাহারাদাররা থাকে। বুনো শূয়োর বা হাতির উপদ্রব খুব এখানে। তারা ফসল নষ্ট করতে এলে ওই মাচাঘরে বসে ক্যানেস্তারা পেটায় পাহারাদাররা। তখন হয় ওরা ভয়ে পালায়, নয়তো সবকিছু তছনছ করে। এমনিতে তো সামনে যাওয়া যায় না ওদের।'

'এখানে বাঘ আছে?'

'আছে বইকী! বাঘ আর ভালুকেরই তো দেশ। সন্ধ্যের পর তাই ঘর থেকে বেরনো নয়। তবে দিনমানে সচরাচর বেরোয় না এরা।'

যাই হোক, আমরা যেজন্য এখানে এসেছিলাম, সেসব ব্যবস্থা হয়ে গেল। বুরুডির একটি বিস্তীর্ণ জলাশয়ের পাশে বসে আমরা পিকনিক করব। জায়গাটা নাকি ভারি মনোরম। লক্ষ্মণদা দু'-একজন আদিবাসীকে তীর-কাঁড় নিয়ে আমাদের সঙ্গে যেতে বললেন। মুরগিও জোগাড় করলেন দু-তিনটে। সবে রওনা হতে যাব, এমন সময় দুঃসংবাদ! বুরুডিপাসের আতঙ্ক আবার মাথাচাড়া দিয়েছে। একটা বাঘ বেশ কিছুদিন ধরে উপদ্রব শুরু করেছে আবার। গ্রামবাসীদের গোরু-ছাগল খেতে-খেতে কাল একজন মানুষকেই নাকি ভরদুপুরে টেনে নিয়ে গেছে।

অতএব আর যাওয়া নয়।

লক্ষ্মণদা বললেন, 'এখন ওদিকে না যাওয়াই ভাল। বাঘ যখন নরখাদক হয়, তখন সে খুবই মারাত্মক। যদিও বুরুডিপাসের সেই আতঙ্ককে এখনও চোখে দেখেনি কেউ, তবুও সে আসে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। মনের মতো শিকারটি তুলে নিয়েই উধাও হয়ে যায়।'

এত আশা, সবই জল। রবি, আমি, কেষ্টদা তিনজনেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

আমি বললাম, 'যা হয় হোক, এতদূর এসে বুরুডিপাস না দেখে যাচ্ছি না। সাবধানে থাকব আমরা। তা ছাড়া সন্ধ্যের আগেই তো ফিরে আসছি।'

লক্ষ্মণদা বললেন, 'কিন্তু...।'

'কোনও কিন্তু নয়। এই সুযোগ হাতছাড়া করলে আর হবে না। এখানকার কাজ আমাদের শেষ হয়ে আসছে। এর পরে একেবারে সিনি কিংবা গিধনিতে। কবে অর্ডার আসে কে জানে!'

তাই আর দ্বিমত নয়। আমাদের যাত্রা হল শুরু।

বুরুডিপাসের সেই বিখ্যাত জলাশয়ের চারপাশ ঘিরে সে কী অরণ্যের গভীরতা! দিনমানেও যেন রাতের অন্ধকার সেখানে। আজ যারা বুরুডিতে পিকনিক করতে যান, ১৯৬১ সালের সে বুরুডির পরিবেশ কল্পনাতেও আনতে পারবেন না তাঁরা। যাই হোক, বনের কাঠকুটো সংগ্রহ করে মুরগির মাংস আর ভাত রান্না করে খেতে খেতেই দুপুর গড়িয়ে গেল। ঠিক এই সময় বাসাডেরায় ফিরতে গেলে বাঘে না খেলেও ভালুকের হাত থেকে নিস্তার নেই।

এদিকে বুরুডির গ্রামবাসীরা সেই নরখাদকের সন্ধানে তোলপাড় করছে চারদিক।

যাই হোক, লক্ষ্মণদা বলে-কয়ে আদিবাসীদের একটি ঝুপড়িতেই আমাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করলেন। আগেই বলেছি, আমার তখন অল্প বয়েস। আমি জেদ ধরলাম রাত্রিবাসই যদি করতে হয়, তা হলে ঝুপড়িতে নয়। এখানেও গাছের মগডালে যেসব ঘর আছে, তারই একটিতে থাকব আমরা।

লক্ষ্মণদা বললেন, 'পাগল নাকি? ওইভাবে কখনও তোরা থাকতে পারিস? ছেলেমানুষি করিস্ না। একটা বিপদ ঘটে গেলে কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।'

কিন্তু রবি আর আমি দু'জনেই নাছোড়বান্দা।

লক্ষ্মণদা বললেন, 'যা ভাল বুঝিস কর। আমি কিন্তু গাছে উঠছি না। কেননা ওখানে আমার ঘুম হবে না। আর ঘুম না হলে কাল ডিউটি করব কী করে? তিনদিন নাগা হলে চাকরি থাকবে?'

রবি বলল, 'কুছ পরোয়া নেই। তুমি যা করবে করো। আমরা গাছেই থাকব।'

আমি বললাম, 'গাছে না থাকলে জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার দেখব কী করে? তুমিই বলো?'

লক্ষ্মণদা বললেন, 'তবে মর তোরা।'

কেষ্টদাও তখন পিছু হটলেন। বললেন, 'আমিও এইসব বেখেয়ালে নেই। আমি ঝোপড়িতেই থাকব।' বলে লক্ষ্মণদার সঙ্গ নিয়ে চলে গেলেন

আদিবাসী পল্লীতে। আমরা দু'জনে খাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে দড়ির মই বেয়ে উঠে পড়লাম টঙে।

সে কী আনন্দ! দেখতে-দেখতে সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হল। অন্ধকারে ঢেকে গেল চারদিক। কিরকিরে পোকার ডাকে কানে যেন তালা ধরে গেল। মশার কামড় আর পোকার কামড়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম আমরা। কিন্তু না পেলাম বাঘের দেখা, না দেখলাম...

হঠাৎ ও কী! একসময় দেখি জোড়া-জোড়া টর্চের আলো চারদিকে যেন ঘোরাফেরা করছে। আমাদের কাছেও টর্চ ছিল। তাই জ্বেলেই দেখলাম কত-কত হরিণ। উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলাম আমরা। ভাগ্যিস টঙে উঠে বসেছিলাম, না হলে এই দৃশ্য কি দেখতে পেতাম কখনও? কিন্তু সে মুহূর্তের ব্যাপার। হঠাৎ কী যে হল, বিদ্যুৎগতিতে উধাও হয়ে গেল তারা। এবারে যে দৃশ্য দেখলাম তা আরও অভিনব। বুরুডির জলাশয়ের ধারে হাঁকডাক করে ঘোরাফেরা করছে কিছু ভালুক। আর কিছু কালো পশমের ডেলা ঘোরাফেরা করছে তাদের ঘিরে। বুঝলাম ওগুলো ওদের শাবক। একসময় তারাও হারিয়ে গেল বনের অন্ধকারে।

রবি বলল, 'জায়গাটা ভালই পছন্দ করেছি আমরা। সমস্ত জন্তু-জানোয়াররাই জল খেতে আসবে এখানে। কিন্তু বাঘ? বাঘের দেখা নেই কেন?'

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই টর্চের আলোর মতো দুটো জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি পড়ল আমাদের ওপর। আমরা ঝুঁকে পড়ে দেখছিলাম অরণ্যের নিশাচরদের। বইয়ে পড়েছিলাম চতুষ্পদ জন্তুদের চোখ রাত্রিবেলা জ্বলে, কিন্তু তা যে এইভাবে, তা আমাদের ধারণাতেও ছিল না।

রবি চিৎকার করে উঠল, 'বাঘ! বাঘ! এই তো! এই তো বাঘ!' ওর টর্চের আলো তখন বাঘের মুখে।

সঙ্গে-সঙ্গে বনভূমি কাঁপিয়ে সে কী ভয়ঙ্কর ডাক! হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনি যেন হঠাৎই থেমে যাওয়ার উপক্রম হল। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনিতে দুলে উঠল গাছের ঘরটা। আর সেই ঝাকুনিতেই যা ঘটবার তা ঘটে গেল। অর্থাৎ চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল রবিটা। কী সর্বনাশ! কোথায় গেল ছেলেটা! আমি ওর নাম ধরে কত ডাকলাম। কিন্তু সাড়াও নেই, শব্দও নেই।

ভয়ে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা হিমস্রোত নেমে এল যেন। আমি জোরে জোরে ক্যানেস্তারা বাজিয়ে ডাকতে লাগলাম সকলকে। একসময় গ্রামের দিক থেকে মশালের আলোর সঙ্কেত দেখা গেলেও আমাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এল না কেউ।

সে-রাতটা যে কীভাবে কাটল, তা আমিই জানি।

পরদিন সকালে যখন এল ওরা, তখন আমার মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা স্বর বেরিয়ে এল শুধু, 'লক্ষ্মণদা, রবি...।'

'কী হয়েছে রবির?'

লক্ষ্মণদাকে সব বললাম।

লক্ষ্মণদা ভীষণ রেগে বললেন, 'ওইজন্যেই আমি বারণ করেছিলাম তোদের। শুনলি না তো আমার কথা? এখন ফিরে গিয়ে সাহেবকে আমি কি বলব? তোদের এখানে আনাটাই আমার ভুল হয়েছে।'

আমি বললাম, 'কাল যে আমি ক্যানেস্তারা পিটিয়ে অত করে তোমাদের ডাকলাম, একবার আসতে পারলে না কেউ?'

'আমরা তো আসছিলাম। আলো দেখিসনি?'

'আসছিলে তো এলে না কেন?'

'বুনো হাতির দল যে ঘিরে ছিল চারদিক। তাই বাধ্য হয়েই ফিরে গেলাম। অরণ্যের ওই গণেশ দেবতা খেপলে কি রক্ষে আছে? তাই আসতে সাহস হয়নি কারও। বাঘের যম হাতি। হাতির যম বাঘ। তোদের টর্চের আলোয় নয়, হাতি দেখেই ভয়ে চিৎকার করেছিল বাঘটা। আর তখনই ঘটে গেছে অঘটন। নিশ্চয়ই রবিটা ভয় পেয়ে পড়ে গেছে বাঘের মুখে। বাঘও তার শিকার পেয়ে কেটে পড়েছে নিজের ডেরায়।'

তবুও শুরু হল খোঁজার পালা।

ঠিক এই সময় এমন একটা দৃশ্য চোখে পড়ল যে, তা দেখে আমরা হাসব না কাঁদব, কিছু ঠিক করতে পারলাম না। আদিবাসীদের শিকারি কুকুরের চিৎকারে আমরা সেই জলাশয়ের ধারে গিয়ে দেখি, বাঘের গলা জড়িয়ে বাঘের পিঠে শক্ত কাঠ হয়ে শুয়ে আছে রবি। আর জলে ভেজা ধূসর বাঘটা এমনই ক্লান্ত যে, জল থেকে ওঠার আর শক্তি নেই তার।

যাই হোক, আমরা বহুকষ্টে উদ্ধার করলাম রবিকে। আর আধমরা বাঘটাকে পিটিয়ে মারল সকলে।

উদ্ধারের পরই রবি জ্ঞান হারাল। অনেক পরে রবির জ্ঞান ফিরলেও, রাতের কথা কিছুই বলতে পারেনি সে। তবে আমরা অনুমানে বুঝলাম, বাঘের ডাকে ভয় পেয়ে রবি পড়বি তো পড় বাঘের ঘাড়েই। বাঘও আচমকা ওইরকম একটা ভারী বস্তু তার ঘাড়ে পড়ায় আরও ভয় পেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে অথৈ জলে। তারপর সাঁতার কেটে প্রাণ বাঁচায়। জলাশয়ের চারপাশে নিশ্চয়ই তখন বুনো হাতির দল। ফলে তাদের নজর এড়িয়ে পালানো সম্ভব না হওয়ায় অর্ধমৃত হয়ে জলেই থাকতে হয় সারারাত। কী কষ্ট বেচারির!

এখন একই গ্রহের ফেরে একজনের পুনর্জন্ম, আর-একজনের মোক্ষলাভ হলেও বাঘের সেই করুণ পরিণতির কথা আজও ভুলিনি আমি। রেলের চাকরি আমি পরের বছরই ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু রবি? সে এখন মস্ত অফিসার।

ভোলা ডাকাতের আত্মকাহিনী

রায়নগর বাঁকুড়া রেলপথে বোঁয়াই চণ্ডী নামে একটা স্টেশন আছে। ছোট্ট স্টেশন। দু'পাশে খেজুর গাছের সারি। মাঝে লাল মাটির বুক চিরে ছোট রেলের লাইন। ভারি চমৎকার জায়গাটা।

এই বোঁয়াই চণ্ডী হলেন অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা। অঞ্চলের লোকেরা বোঁয়াই মাকে ভয় ও ভক্তি করে খুব। দূরের লোকেরাও মান্যগণ্য করে। কলেরা বসন্ত ইত্যাদি মহামারী হলে ঘটা করে পুজো দেয়। বছরে একবার মেলা বসে। হাজার হাজার ছাগবলি হয়।

বোঁয়াই চণ্ডীর মেলায় একবার একটি লোককে আমি দেখেছিলাম। শক্ত সমর্থ বলিষ্ঠ চেহারার লোক। ঘন কালো গায়ের রঙ। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। দেখলে আরো কম বলে মনে হবে। লোকটি একটি খেজুর গাছের নিচে বসে ভিক্ষে করছিল। তখন গরমের দিন। তবুও গায়ে চাদর একটা জড়ানো ছিল তার। আমি লোকটির দিকে তাকাতে সে করুণভাবে বলল—দয়া করে দুটো পয়সা ভিক্ষে দেন গো বাবু।

আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম। লোকটি গরিব ভিখারী। তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রতিটি মানুষেরই উচিত দরিদ্র নারায়ণকে কিছু না কিছু সাহায্য করা। অনাথ আতুর বা কর্মক্ষম বিকলাঙ্গদের পাশে গিয়ে আমরা যদি আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে না দিই তাহলে তারাই বা বাঁচবে কি করে?

কিন্তু এই লোকটি?

এই লোকটি তা নয়।

যদিও বয়স হয়েছে, তবুও ওর চেহারার যা বাঁধুনি তাতে এখনো খেটে খাবার সামর্থ্য রয়েছে ওর।

তাই একটু অপ্রসন্নভাবেই লোকটিকে বললাম—বাপু হে, তুমি কেন ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে পথের ধারে বসেছ? তোমার তো অন্যের দয়ার ওপর নির্ভর করাটা উচিত নয়। এখনো তোমাকে দেখে আমার যা মনে হচ্ছে, তাতে তুমি রীতিমতো খেটে খেতে পারো।

লোকটি আমার কথা শুনে একটু হাসল। বড় ম্লান। তারপর গায়ের চারদটা খুলে করুণভাবে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। আমি দেখলাম লোকটির সারা গায়ে বুকে পিঠে দগদগ করছে ঘা।

লোকটি মৃদু হেসে বলল—কুষ্ঠ।

আমি নরম গলায় সমবেদনার সুরে বললাম—তোমার এমন অসুখ, তুমি চিকিৎসা করাও না কেন? অনেক দাতব্য চিকিৎসালয় তো আছে। বাঁকুড়ায় কুষ্ঠাশ্রম আছে।

—অনেক চিকিৎসা করিয়েছি বাবু। কিন্তু বিনি পয়সায় ওষুধ তো কেউ দেয় না। আর সত্যি কথা বলতে কি, ওষুধ দিলে রোগ বেড়ে যায়।

—সেকি! ওষুধ দিলে রোগ বেড়ে যায়, এমন তো কখনো শুনিনি!

—হ্যাঁ বাবু। এ যে সারবার রোগ নয়। এ আমার অভিশাপ। কতবার ভেবেছি আত্মহত্যা করি। কিন্তু অনেক পাপের ওপর আর এক পাপের

বোঝা আমি বাড়াতে চাই না। এর পর লোকটি তার ডান হাতখানা বাড়িয়ে আমাকে দেখাল—এই দেখুন বাবু।

—দেখলাম। তার ডান হাতের একটি আঙুলও অবশিষ্ট নেই। এতক্ষণ লোকটি তার বাঁ হাত পেতে ভিক্ষে করছিল। তাই ডান হাতের দিকে লক্ষ্য করিনি। এবার করলাম। বললাম—এও কি কুষ্ঠ?

—না বাবু। এ কুষ্ঠ নয়। এই হাতে আমি অনেক পাপ করেছি। তাই প্রায়শ্চিত্ত করব বলে নিজে হাতে আমার প্রত্যেকটা আঙুলকে কেটে ফেলে দিয়েছি আমি। বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম লোকটার চোখ দুটো কি রকম একটু অন্য ধরনের হয়ে গেল। ভয়ঙ্কর কুটিল হয়ে উঠল ওর মুখ। ব্যাপার কি! লোকটি যেন কোন্ সুদূর অতীতের স্মৃতিতে হারিয়ে যাচ্ছে।

আমি শিউরে উঠলাম তার কথা শুনে। বললাম—কি এমন পাপ করেছ তুমি যে এত বড় একটা কঠিন শাস্তি নিজেকে দিলে?

লোকটি আবার যেন বর্তমানে ফিরে এলো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—শুনবেন বাবু, আমার দুঃখের কাহিনী?

—বলো। নিশ্চয়ই শুনব।

—তাহলে শুনুন।

লোকটি উদাস চোখে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে তার ফেলে আসা জীবনের কয়েকটি অধ্যায়ের কথা আমাকে শোনাতে লাগল।

আমি বর্ধমানের আতঙ্ক।

অবশ্য আজকের নয়, অতীতের।

আমার নাম ভোলা সাউ। ডাকাতি আমার জাতব্যবসা ছিল। তাই সেখানে আমি ভোলা ডাকাত নামেই বিখ্যাত ছিলাম।

ছোটবেলা থেকেই খুন-জখম দেখে দেখে আমার প্রাণ হয়ে উঠেছিল কসাইয়ের মতো। আমার বাপ-কাকারা ডাকাতি করত। মানুষ মারত। তাদের কাছ থেকে মানুষ মারার কৌশল আমি শিখে নিয়েছিলাম। মানুষকে আর মানুষ বলেই মনে হোত না আমার। মানুষেরা যেমন পাঁঠা-মুরগী কাটে, মানুষকেও আমার ঐ রকমই মনে হোত। তাই মানুষ মারতে আমার একটুও মায়া হোত না। মনে হোত মানুষের মতই আমিও যেন পাঁঠা-মুরগী ইত্যাদি কাটছি।

কত মায়ের বুক থেকে তার শিশুকে কেড়ে নিয়ে মাটিতে আছাড় দিয়ে

মেরেছি, কত মানুষকে যে বল্লমের খোঁচা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছি তার লেখাজোখা নেই। মানুষের অন্তিম হাহাকারে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠেছে। কিন্তু আমার বুক কাঁপেনি। কিছুমাত্র শিহরণও জাগেনি আমার প্রাণে।

কতবার ধরা পড়েছি। জেল খেটেছি। প্রমাণের অভাবে ফাঁসি হয়নি। জেল থেকে বেরিয়ে এসে আবার ডাকাতি করেছি।

ক্রমে আমি ঐ অঞ্চলের নামকরা ডাকাত হিসেবে পরিচিত হলাম। আমি হলাম দিনের আতঙ্ক ও রাতের বিভীষিকা।

আমার দলও ছিল বিরাট। বহু দলে ভাগ হয়ে আমরা দূর দূর গ্রামে যেতাম ডাকাতি করতে। দলের সর্দার ছিলাম আমিই। গভীর জঙ্গলের মধ্যে বড় ডাকাতির পর আমরা নরবলি দিতাম। আর ডাকাতির সমস্ত মালপত্তর জমা রাখতাম আমাদের গোপন ঘাঁটিতে। আমরা ডাকাতিতে এত পোক্ত ছিলাম যে আমাদের নাম শুনলে কেঁপে উঠত লোকে। আমরা এমনই দুঃসাহসী ছিলাম যে বড় বড় বাড়িতে আগে চিঠি দিয়ে তারপর ডাকাতি করতে যেতাম। মুখে বিকট শব্দ তুলে থালা ঘুরিয়ে ডাকাতি করতাম। সেই থালার মুখে কেউ পড়লে গলা কেটে দু'ফাঁক হয়ে যেত তার। তবে আমরা করতাম কি ডাকাতির পর গৃহস্থের বাড়িতে মশাল জ্বেলে পুঁতে রেখে আসতাম। কেননা, প্রবাদ ছিল এতে ঐ গৃহস্থের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং আমাদেরও ঐ বাড়িতে পুনরায় ডাকাতি করার সুযোগ আসে। তাই করতাম।

আমাদের জঙ্গলে ডাকাতকালীর থান এখনো আছে। সে সব কি দিন ছিল বাবু। মনে করুন রণপা'র সাহায্যে বর্ধমান থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত অনায়াসে গিয়ে এক রাতের মধ্যে ডাকাতি করে আমরা ফিরে আসতে পারতাম।

এইভাবেই দিন কাটছিল। দিনকালের সঙ্গে সঙ্গে মানুষও হুঁশিয়ার হয়ে পড়ছিল।

সবাই সাবধানে থাকত।

একা কেউ বনের মধ্যে বা মাঠেঘাটে চলাফেরা করত না।

এমন কি আমার ভয়ে আমার এলাকাগুলোকেও লোকে পরিত্যাগ করে চলতে লাগল।

একবার হ'ল কি, আমরা দলবলসমেত ধরা পড়ে গেলাম। আমি কোনরকমে পালাতে পারলেও, দলের লোকেরা পারল না। সেই থেকেই আমাদের অবনতি ঘটতে লাগল। তারপর লুকিয়ে ছাপিয়ে আবার নতুন

করে দল তৈরী করলেও, পুলিশের ভয়ে আমি লোকালয়ে যেতে পারতাম না। কাজেই অরণ্যই ছিল আমার ঘর, সংসার—আমার জীবন।

এদিকে মানুষ খুব বেশি সাবধান হয়ে পড়ায় আমার ব্যবসাতেও ভাঁটা পড়ল। কিন্তু বিধি বাম। আবার একবার ধরা পড়ে দলের বেশ বাছা বাছা কয়েকজন আন্দামানে চালান হয়ে গেল।

আমি একা অসহায় হয়ে পড়লাম।

আমার বউ-ছেলে পেট ভরে খেতে পেত না। সেজন্য বউয়ের কাছেও লাঞ্ছনা-গঞ্জনা শুনতে শুনতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম।

একদিন আমার বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে দুপুরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। দাওয়ানদীঘির পোড়ো মন্দিরের চাতালে বটগাছের ছায়ায় শুয়ে আছি। আমার মনের ভেতরে তখন গনগনে আগুনের তাত রয়েছে। এমন সময় দেখলাম অনেক দূরে কে যেন আসছে।

তখন চৈত্র মাস।

রোদ্দুরে লি লি করছে চারদিক।

পথ জনমানবশূন্য।

তার ওপর ডাকাতের ভয়ে এসব পথে কেউ একটা আসে না বললেই হয়। তাই যে আসছিল তাকে দেখে আমার বিস্ময়ের অন্ত রইল না। কার এত দুর্মতি যে, এই ভরদুপুরে একা এ অঞ্চলে দুঃসাহসে পথ চলে?

অনেকক্ষণ লক্ষ্য করার পর বুঝলাম মহান্তর ধ্বজা উড়িয়ে একজন লোক আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের তারায় খুন নেচে উঠল। আনন্দে হা-রে-রে-রে করে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল। কিন্তু আমি শিকার হাতছাড়া হবার ভয়ে চুপ করে রইলাম।

আমি জানতাম বর্ধমানের রাজবাড়ি থেকে মাঝে মাঝে জাহানাবাদে (আরামবাগ) মহান্তর গদীতে টাকা যায়।

সেই টাকা নিয়েই লোক আসছে।

মহান্তর লোক বা সাধু-সন্তদের আমরা ডাকাতরা হত্যা করতাম না। পিতৃপুরুষের নিষেধ ছিল। বরং মন-মেজাজ ভাল থাকলে উল্টে তাদেরকে আমরা আপ্যায়ন করতাম।

তাই নির্ভয়েই সে আসছিল।

তার হাতে একটি বাঁশের ধ্বজা আর কোমরের ফেন্তিতে ছিল টাকার গোছা। এই টাকা নিয়ে মহান্তর আখড়ায় সে যাচ্ছিল।

আমি তখন সামনে শিকার দেখে উন্মত্ত হয়ে উঠলাম।

ক্ষুধিত বাঘ চোখের সামনে শিকার দেখলে যেমন গোঁফ ফোলায়, আমিও ঠিক সেইভাবে তৃষিত চোখে সেই দিকে তাকিয়ে রইলাম।

একবার সামনে এলে হয়।

কতদিন ধরে প্রতীক্ষা করে আছি এই রকম একজনের।

মহান্তর ধ্বজা দেখেও আমার মনে এতটুকু বিকার হ'ল না। ভাবলাম আপনি বাঁচলে বাপের নাম। এ ব্যাটাকে মারতে পারলে এক থোকে অনেকগুলো টাকা হাতে এসে যাবে। তারপর কিছুদিন আর ডাকাতি না করলেও চলবে।

আমার হাতে একটা বল্লম ছিল। সেটা নিয়ে আমি মন্দিরের মাথায় উঠে বটগাছের ঘন ডালপাতার আড়ালে লুকিয়ে রইলাম।

লোকটি তখন পরম নিশ্চিন্তে সেইদিকে এগিয়ে আসছে।

তার পরনে গেরুয়া। কপালে তিলক। বুকে কৃষ্ণনাম লেখা। হাতে ধ্বজা। লাল রঙের ধ্বজা। সেই ধ্বজা উড়িয়ে সে ভাঙা মন্দিরের সামনে এসে থামল।

আমি জানতাম, এখানে এসে একটু অন্তত বিশ্রাম নেবেই সে। তাই হ'ল। সে এসে 'হরে কৃষ্ণ' বলে মন্দিরের চাতালে ধপ করে বসল।

যেই না বসা, অমনি আমি গাছের ওপর থেকে তাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলাম বল্লমটা।

দৈবক্রমে সেটা হাত ফসকে মাটিতে গিঁথল।

লোকটি তখন চমকে উঠে ধ্বজা হাতে সভয়ে ভাঙা মন্দিরের এক কোণে সরে দাঁড়িয়েছে।

আমিও মরিয়া হয়ে গাছের ডাল থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে বল্লমটা কুড়িয়ে নিয়েই রুখে দাঁড়ালাম। রাগে আমার সর্বাঙ্গ কাঁপছে তখন।

জীবনে এই প্রথম আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল। তাই এই রাগ।

লোকটি তখন ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে। আমাকে দেখে তার বুক শুকিয়ে গেল। বলল—কে তুমি!

—আমি ভোলা ডাকাত।

—কি চাও?

—টাকা।

—আমি কোথায় টাকা পাবো?

—তুমি মহান্তর লোক। মহান্তর গদীতে বর্ধমানের রাজকোষ থেকে টাকা যাচ্ছে। ঐ টাকা আমার চাই।

—বেশ। যদিও টাকা আমার নয়, তবুও আমার প্রাণরক্ষার জন্য এই টাকা আমি তোমাকে দিচ্ছি। তুমি আমাকে প্রাণে মেরো না।

আমি হাসলাম। বললাম—আমি টাকাও নেবো, প্রাণও নেবো।

লোকটি সভয়ে বলল—টাকা পেলেও তুমি আমার প্রাণ নেবে?

—হ্যাঁ। কেননা তুমি আমাকে চিনে ফেলেছ। যদি ধরিয়ে দাও।

সে বলল—বিশ্বাস করো, আমি কাউকে একথা বলব না। বলব টাকাটা অসাবধানে পড়ে গেছে।

—ঠিক বলছ?

—ঠিক বলছি। আমাকে প্রাণে মেরো না তুমি, দোহাই তোমার।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কি করব কিছু ঠিক করতে পারলাম না। তারপর হঠাৎই বললাম—না। মরতে তোমাকে হবেই।

লোকটি চিৎকার করতে লাগল—না-না-না-না। আমাকে মেরো না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

কিন্তু আমি তখন সেই ভোলা ডাকাত।

ওরকম অনেক কান্না আমার শোনা আছে। তাই তার কথায় কর্ণপাত না করে বল্লমটা উঁচিয়ে ধরে তার বুকের বাঁদিকে কলজেটা লক্ষ্য করে আমূল বসিয়ে দিলাম।

লাল রক্তে গেরুয়া ভিজে গেল।

রক্ত আমি অনেক দেখেছি। তাই আমার কিচ্ছু হ'ল না।

লোকটির কাতর কান্না থেমে গেলে আমি তার কোমরে রাখা টাকার গেঁজেটা নিয়ে তার পা দুটো ধরে টানতে টানতে দাওয়ানদীঘির জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম তাকে। তারপর মুখ হাত পা ধুয়ে ঘরে এলাম।

ঘরে এসে বউয়ের হাতে টাকার থলিটা তুলে দিতেই দেখলাম আনন্দে তার চোখ দুটি চকচকিয়ে উঠল।

তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে।

দুপুরের সমস্ত রাগারাগি ভুলে গিয়ে আমরা দুজনে টাকা গুনতে বসলাম। মোট পাঁচশো টাকা ছিল। এক থোকে অতগুলো টাকা পেয়ে আনন্দের আর অন্ত রইল না আমাদের।

বউ বলল—এত টাকা তুমি কোথায় পেলে গো?

আমি তাকে সব কথা খুলে বললাম। আমার কথা শুনে শিউরে উঠল সে। বলল—ছিঃ ছিঃ! এ কি করেছ! তোমাদের বংশে কেউ যা করেনি, তুমি আজ তাই করলে? এ পাপ তুমি রাখবে কোথায়? মহান্তর লোককে তুমি হত্যা করলে?

আমি বললাম—পাপ-পুণ্য জানি না। ডাকাতি আমার পেশা। মানুষ মারাই আমার কাজ। মানুষ মেরেছি। অতশত বিচার করলে চলবে না।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি পাপের ভারা যখন পূর্ণ হয়, তখন ভগবানের অভিশাপও বুঝি আপনিই নেমে আসে। তিন রাত্রি পার হ'ল না, আমার একমাত্র ছেলেকে সাপে কাটল। নিজের হাতে দামোদরের স্রোতে ভাসিয়ে দিলাম ছেলেকে। সেই শোকে বউটা পাগলের মতো হয়ে গেল। তারপর একদিন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল সে। এই পৃথিবীতে আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলাম। ক্রমে আমার এক অসুখ দেখা দিল। মনেরও পরিবর্তন হ'ল আমার। নিজের কৃতকর্মের কথা, বউ-ছেলের কথা, মনের মধ্যে চিতার মতো জ্বলতে লাগল। প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য রাগে একদিন নিজের হাতের আঙুলগুলোকেই কেটে ফেললাম। রত্নাকর বাল্মীকি হয়েছিল। আমি কিন্তু কিছুই হতে পারলাম না। শুধু ব্যর্থতার জ্বালা নিয়ে আজও আমি বেঁচে আছি।

আজকাল ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখি—কে যেন আমাকে বল্লমে করে খুঁচিয়ে মারছে। তখন যে কি যন্ত্রণা হয় আমার! মনে হয়, দু'হাতে নিজের গলা টিপে নিজেকে মেরে ফেলি। এই বলে লোকটি তার কাহিনী শেষ করে হাঁফাতে লাগল।

আমি সব শুনে চুপচাপ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। এক নরহত্যার দস্যুর নির্মম পরিণতি দেখে তাকে সমবেদনা জানাব না ঘৃণা করব তা ভেবে পেলাম না। শুধু পকেট হাতড়ে কিছু খুচরো পয়সা বার করে তাকে দিয়ে চলে এলাম।

আলতাবাবা

আলতাবাবার নামটা হঠাৎই এখানকার লোকের মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ল। এরকম সাধক নাকি কালেভদ্রে দেখা দেন। নাগাধিরাজ হিমালয়ের বরফ-ঢাকা গিরিশিখর থেকে নেমে এসেছেন তিনি। নেমেই সোজা এসে হাজির হয়েছেন এই কুসুমডির শ্মশানে। যেখানে দিনমানেও মানুষ একা যেতে ভয় পায়।

তাঁর আবির্ভাবের কথাটা প্রথম এসে জানাল পঞ্চা বেদে। সাপের ঝাঁপি নিয়ে সে ঘুরঘুর করছিল ওই শ্মশানের আনাচে-কানাচে। যদি কোনও বিষধর সাপের সন্ধান মেলে! এমন সময় হঠাৎই দেখল জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী ত্রিশূল হাতে রুদ্রমূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন শ্মশানকালীর ভাঙা মন্দিরের চাতালে।

তাই না দেখে পঞ্চার চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। ভয়ে, ভাবে, ভক্তিতে গদগদ হয়ে সে তখন সেই ভয়ঙ্করের সামনে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল। তারপর একেবারে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করে কাঁপা-কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে বাবা আপনি?'

সন্ন্যাসী অগ্নিদৃষ্টিতে পঞ্চার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, 'আমার পরিচয় পরে পাবি। তার আগে বল, সাপ ধরার অছিলায় গিয়ে আজ থেকে তিন বছর আগে ভুবনযুগীর বউয়ের গয়নাগুলো তুই চুরি করেছিলি কেন?'

পঞ্চা তো এক লাফে লম্বা। এ কী রে বাবা! এ সাধু, না অন্তর্যামী? একবার মুখের দিকে তাকিয়েই পেটের কথাটা ঘ্যাঁচ করে বলে দিল? সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, 'ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন বাবা। যা করেছি-করেছি, আর কখনও ও কাজ করব না। এই আপনার পা ছুঁয়ে কথা দিচ্ছি।'

সাধুবাবা বললেন, 'না। আমার পায়ে হাত দিবি না তুই। আমি বিশেষ কিছু ক্রিয়াকলাপের জন্য এখানে এসেছি। আগামী অমাবস্যায় মা-কালীর পুজো করে এখান থেকে বিদায় নেব। আমাকে অযথা কেউ বিরক্ত করবি না। আমার সাধনায় বিঘ্ন ঘটাবি না। তবে ওইদিন মায়ের পুজোর ব্যবস্থাটা গ্রামের লোকেদের করে দিতে বলবি। আর এও বলবি, আলতাবাবার আদেশ, কেউ যেন সন্ধ্যের পর ভুল করেও শ্মশানে না ঢোকে।'

পঞ্চা তো সঙ্গে সঙ্গে ছুটল এই নির্দেশ গ্রামবাসীদের শুনিয়ে দিতে।

গ্রামবাসীরাও পঞ্চার মুখে খবর শুনেই হতবাক। সবাই বিস্মিত হয়ে বলল, 'বলিস কী রে!'

অনেকে আশার আলো দেখে দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন, 'জয় আলতাবাবা।'

গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিরা বললেন, 'আসতেই হবে। যুগে-যুগে মানুষের ডাকে যুগাবতারকে এমনি করেই আসতে হয়। উনি সিদ্ধপুরুষ। চলো, আমরা সবাই মিলে এক্ষুণি গিয়ে তাঁকে দর্শন করে আসি।'

চলো তো চলো।

আলতাবাবা যতই না বারণ করুন কেউ তাঁকে বিরক্ত করবে না। তবুও মহাপুরুষের আবির্ভাবের খবর শুনলে কেউ কি আর চুপ করে ঘরের ভেতর

বসে থাকতে পারে? তাই যে যেখানে ছিল একে একে সবাই এসে হাজির হল শ্মশানে, আলতাবাবার আস্তানায় সেই ভাঙা মন্দিরের সামনে।

শিবের যেমন নন্দী-ভৃঙ্গি থাকে, আলতাবাবারও তেমনি রুপি আর সুপি নামে দুই অনুচর ছিল। তারা ত্রিশূল হাতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দূরের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসেছিল মন্দিরের চাতালে। যেমনি প্যাকাটির মতো চেহারা তাদের, তেমনই আলকাতরার মতো গায়ের রং। তার ওপর লাল চেলি আর রুদ্রাক্ষের মালা পরে থাকায় যাচ্ছেতাই দেখাচ্ছিল তাদের। গ্রামবাসীরা মন্দিরের কাছে এগিয়ে যেতেই রুপি-সুপি ত্রিশূল উঁচিয়ে বলল, 'খবরদার! এক পা'ও এগোবি না কেউ। আলতাবাবার নিষেধ অমান্য করলে খুন করে ফেলব একেবারে। কেউ এখানে ভিড় করবি না।'

সবাই বলল, 'বাবার নিষেধ অমান্য আমরা করব না। তবে একবার ওই মহাপুরুষকে দর্শন করে আমরা আমাদের মনুষ্যজন্ম সার্থক করব।'

সকলের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং সনির্বন্ধ অনুরোধে আলতাবাবা বিগলিত হলেন। কাজেই আর থাকতে না পেরে মন্দিরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দেখা দিলেন সকলকে।

আলতাবাবাকে দেখেই হইচই করে উঠল সকলে। এ যে সাধকের সাধক—মহাসাধক। সাক্ষাৎ-কালভৈরব যেন। কী ভয়ঙ্কর চেহারা। কী বিশাল শরীর। মাথায় দীর্ঘ জটা। সবাই সমস্বরে জয়ধ্বনি করল, 'জয় আলতাবাবার জয়।'

আলতাবাবা বললেন, 'আজকের মতো আমি তোমাদের দর্শন দিলাম। কাল থেকে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেউ আসবে না এখানে, বুঝলে? মায়ের সেবা-পুজোর জন্যে কারও কিছু দেবার ইচ্ছে থাকলে ওই গাছতলায় রেখে যাবে। আমার লোক গিয়ে নিয়ে আসবে।'

সবাই তখন আবেগে লুটিয়ে পড়তে এল আলতাবাবার পায়ে।

আলতাবাবা ধমক দিয়ে বললেন, 'দূর থেকে প্রণাম করো সব। আমাকে ছোঁবার চেষ্টা কোরো না কেউ।'

সবাই তাই করল।

শুধু এক নাদুসনুদুস দিব্যকান্তি বাবু সাহস করে জোড় হাতে এগিয়ে এলেন, 'বাবা, বাবা গো, একটু কৃপা করুন। দয়া করে একবার ওই শ্রীচরণের একটু ধুলো নিতে দেন আমাকে। আমি রাহুর কোপে পড়েছি বাবা।'

আলতাবাবা বললেন, 'আমার পা আমি কাউকে ছুঁতে দিই না করালী। তোরা এই গ্রামের দশ পুরুষের জমিদার। সেই রক্ত তোর গায়ে আছে। রক্তের তেজে কী না করেছিস তুই, ভেবে দ্যাখ। কথায় কথায় লোককে কান ধরিয়ে ওঠ-বোস করিয়েছিস। জুতোপেটা করেছিস। মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে লোককে গ্রাম থেকে বার করে দিয়েছিস। সেই পাপের ফল তো ভোগ করতেই হবে।'

'সেইজন্যেই তো হন্যে হয়ে আপনার কাছে ছুটে এসেছি বাবা। আপনি আমার জন্যে এমন কিছু করুন যাতে আমি পাপমুক্ত হই।'

আলতাবাবা কিছুক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বিড়বিড় করে কী যেন বলে... তারপর বললেন, 'প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

'করব। আর দু'মাস বাদে ভোট। আপনি এমন কিছু করুন, যাতে আমি হাজার হাজার ভোটে জিততে পারি।'

'পারবি। তার আগে প্রায়শ্চিত্তটা করে নে।'

'বলুন কী করতে হবে?'

'সকলের সামনে এই মুহূর্তে তুই কান ধরে ওঠ-বোস কর।'

করালীবাবু তাই করলেন।

বার দুই-তিন করতেই আলতাবাবা বললেন, 'থাক। আর করতে হবে না। এটা তো তোর শাস্তি নয়। প্রায়শ্চিত্ত।'

করালীবাবু গদগদ হয়ে বললেন, 'এবার কী করব বলুন?'

'এবার তোর পা থেকে জুতো খুলে তুই নিজের মুখেই মার।'

করালী একবার আড়চোখে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে লজ্জা-ঘেন্নার মাথা খেয়ে তাও করলেন।

আলতাবাবা বললেন, 'এতক্ষণে তুই অর্ধশুদ্ধ হলি। বাকি রইল নরসুন্দর ডেকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালাটা। ওটা এখন নয়। মায়ের মহাপুজোর দিন সকলের সামনে করবি। এখন যা, গ্রামের বড় রাস্তাটা পাকা করে দে। বেশি দেরি করিস না কিন্তু।'

'বাবা!'

'চমকে উঠলি যে?'

'না মানে...'

আলতাবাবা মুচকি হেসে বললেন, 'ওরে পাগল, তা হলে জেনে রাখ, এবারের ভোটে তুই শুধু জিতেই রেহাই পাচ্ছিস না। আমার মা-ব্রহ্মময়ীর ইচ্ছায় তুই মন্ত্রী হচ্ছিস। সামনে বর্ষা। মন্ত্রীর গাড়ি যাতে কাদায় না ফাঁসে, সেই ব্যবস্থাটা আগেই করে রাখ।'

করালীবাবু তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন, 'জয় আলতাবাবার জয়। আমি আপনার শ্রীচরণে শপথ নিয়ে বলছি, সাতদিনের মধ্যে এখানকার রাস্তাঘাট আমি নিজের টাকায় পাকা করে দেব। আমি মন্ত্রী হব এমন স্বপ্ন যে আমি ঘুমিয়েও দেখিনি।'

আলতাবাবা বললেন, 'পুবের সূর্য পশ্চিমে উঠবে, উত্তরের হিমালয় দক্ষিণ চলে যাবে, কিন্তু আমার কথা মিথ্যে হবে না।'

করালীবাবু আনন্দে লাফাতে লাফাতে চলে গেলেন।

এবার যিনি এগিয়ে এলেন তাঁকে দেখেই আলতাবাবা বললেন, 'আরে তারিণীখুড়ো যে! কী ব্যাপার?'

ভাবে গদগদ হয়ে তারিণীখুড়ো বললেন, 'আপনার কৃপা ভিক্ষা করতে এসেছি বাবা।'

আলতাবাবা বললেন, 'আমিই তো ভিখারী। আমি কী ভিক্ষা দেব বল?'

'যা হোক দিন।'

'তার আগে বল, তোর তো টাকা-পয়সার অভাব নেই। একমাত্র ছেলের বিয়ে দিচ্ছিস হুগলি জেলার দশঘরায়। মধ্যবিত্ত পরিবার। তুই তাদের কাছে বিশ হাজার টাকা নগদ আর বিশ ভরি সোনা চাইলি কী বলে? ওরা হয়তো শেষ পর্যন্ত ও টাকা জোগাড় করতে পারবে না। আর না পারলে বিয়েটাও ভেঙে যাবে। অথচ তুই কি জানিস, ওই মেয়ের সঙ্গে তোর ছেলের বিয়ে না হলে ঠিক এক বছরের মাথায় তুই তোর ছেলেকে অকালে হারাবি? মানুষ তার নিজেরই কর্মফলে নিজের বিপদ ডেকে আনে তারিণী।'

তারিণীখুড়ো ধড়াস করে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লেন। তারপর বললেন, 'যা চেয়েছি তা ঝকমারি করে চেয়েছি। আপনার আদেশ হলে আর তা চাইব না বাবা। আমি এক্ষুণি খবর পাঠাচ্ছি। পণ না নিয়েই ওই মেয়েকে আমি আমার ছেলের বউ করে ঘরে তুলব।'

আলতাবাবা হেসে বললেন, 'সুমতি হোক। তবে এও জেনে রাখ, আজ

থেকে তিন বছর তিন মাস তিন দিন তিন ঘণ্টা তিন মিনিট তিন সেকেন্ড পরে তোর যে নাতি হবে, সে সোনার খনির মালিক হবে।'

তারিণীখুড়ো চোখ দুটো আলুবখরার মতো করে বললেন, 'বলেন কী বাবা! আমার নাতি সোনার খনির মালিক হবে? আমি যে এবার হার্টফেল করব।'

'তোমার ওই হার্ট ফেল হবার নয় খুড়ো। যাও, এক্ষুণি গিয়ে ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করো।'

তারিণীখুড়ো আলতাবাবার জয় দিতে দিতে চলে গেলেন।

এবার যিনি এলেন তাঁকে দেখেই আলতাবাবা বললেন, 'আরে নটবর যে! তোমার বাতের ব্যথা এখনও কেউ সারাতে পারল না?'

নটবরভাবে গদগদ হয়ে বললেন, 'বাবা, আপনি যে দেখছি সত্যিই অন্তর্যামী। আপনি যখন সবই বোঝেন, তখন দয়া করে আমার এই বাত-ব্যথা আপনিই সারিয়ে দিন না বাবা।'

'দেব। কাল থেকে রোজ দুপুরে তুমি আমার এখানে চলে আসবে। আমার রুপি আর সুপি তোমাকে মন্ত্রপূত মাটি মাখিয়ে দেবে। দিনকতক এই মাটি মাখলেই সেরে যাবে তোমার বাতের ব্যথা।'

নটবর জোড় হাত করে বললেন, 'যদি সত্যিই সারে, তা হলে আমার সর্বস্ব আমি আপনাকে দিয়ে দেব।'

আলতাবাবা বোমার মতো ফেটে পড়লেন, 'আহাম্মক! দূর হয়ে যা চোখের সামনে থেকে। নিজেদের পাপে নিজেরা কষ্ট পাচ্ছিস। কোথায় ভাল করতে এলাম, না আমাকেই দিচ্ছিস ঘুষ?'

নটবর কেঁদে উঠে বললেন, 'দোহাই বাবা, আপনার দুটি পায়ে পড়ি। অবোধ শিশু। না জেনে আপনার মনে ব্যথা দিয়েছি। এবারের মতো এই অধমকে ক্ষমা করুন।'

'না। আমি সহজে কাউকে ক্ষমা করি না। তবে সত্যিই যদি ক্ষমা চাস তা হলে এক্ষুণি মিস্ত্রি লাগিয়ে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলঘরটা পাকা করে দিবি। আর এ-গাঁয়ের মানুষজনের খুব জলকষ্ট। তাই বারোয়ারিতলায় একটা কলও বসিয়ে দিবি ওই সঙ্গে। তোর বাতের ব্যথা আমি সারিয়ে দেবই।'

নটবর চলে যেতেই ভিড় ঠেলে এক টেকোমাথা ভদ্রলোক কোনওরকমে কাঁচাকোঁচা সামলে এগিয়ে এলেন।

আলতাবাবা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'যুধিষ্ঠির না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ বাবা। আমার একমাত্র ছেলে দীর্ঘদিন রোগশয্যায়। যদি আপনি...।'

'করব। তার জন্য নিশ্চয়ই কিছু করব। তা ছাড়া তোমার ছেলে মানিকচাঁদ খুবই ভাল। তোমার পাপের জন্য তাকে আমি অকালে মরতে কিছুতেই দেব না। তুমি যাও, এক্ষুণি যেখান থেকে পারো এক কিলো আমলকী আমাকে আনিয়ে দাও। আমি সেটা মন্ত্রপূত করে দিলে রোজ সকালে একটা করে ওই প্রসাদী ফল তুমি খাইয়ে যাও ছেলেকে। দেখবে দু'মাসে সেরে উঠবে।'

'যথা আজ্ঞা বাবা।'

'তবে আমলকী খাওয়াবার আগে তোমাকে কিন্তু আর একটি কাজ করতে হবে।'

'কী কাজ বলুন। নিশ্চয়ই করব।'

'তুমি এই গ্রামের গরিব-দুঃখীদের যেসব জমিজমা বা গয়নাগাঁটি বন্ধক রেখেছ, সেগুলো এই মুহূর্তে ফিরিয়ে দেবে আর খাতাপত্তরগুলো আমার কাছে দিয়ে যাও। ওগুলো আমি মায়ের মহাপুজোর দিন যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেব।'

যুধিষ্ঠির কাঁপ-কাঁপা গলায় বললেন, 'সে কী বাবা! আমার একুশ পুরুষের সুদের ব্যবসা। আমি যে পথের ভিখিরি হয়ে যাব।'

'কেন হবে? তোমরা স্বামী-স্ত্রী আর ওই তো একটিমাত্র ছেলে। বিঘে পঞ্চাশ ধানজমি আছে। পুকুর বাগান আছে। দু'দুটো মিনিবাস। তোমার অভাব কী? যা বলছি তাই করো। এতেই তোমার ভাল হবে।'

'আপনার যখন আদেশ তখন ফিরিয়েই দেব সকলের সবকিছু। তবে বাবা, ভবিষ্যতে আর কেউ কিছু বাঁধা দিতে এলে বা টাকা ধার চাইলে আমি কিন্তু দেব না। কেননা আমার তো দানছত্তর নেই।'

'পাপিষ্ঠ। এখন থেকেই ভবিষ্যৎ-চিন্তা? যা বলছি তাই করো আগে। মনে শান্তি পাবে। ছেলেটাও ভালো হয়ে যাবে। আগামী অমাবস্যার আগেই সবকিছু করে ফেলেছ আমি দেখতে চাই। ওই দিন মায়ের মহাপুজো করে, সকলের সমস্ত দুঃখ দূর করে আমি বিদায় নেব। শুধু তাই নয়, ওইদিন

মাটির প্রতিমাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করব আমি। জাগ্রত দেবীর কাছে ইচ্ছা করলে তোমরা বরও চাইতে পারবে।'

বাবাই অবাক হয়ে চেয়ে রইল আলতাবাবার দিকে। সাধু তো নন। ভগবান। কৈলাসের মহাদেব। না হলে এমন অসম্ভব কথা কেউ মুখেও উচ্চারণ করতে পারে?

আলতাবাবার কথা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। মহাশ্মশানে বসে মহাতান্ত্রিক আলতাবাবা মা-কালীর পুজো করে মৃন্ময়ী মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন, সেই প্রতিমা কথা বলবে, এ কী যা-তা ব্যাপার! কাজেই এ-কথা চাপা থাকবে কেন? গ্রাম-গ্রামান্তরে এই কথাটা ছড়িয়ে পড়ল তাই।

অবিশ্বাসীরা বলল, 'ওসব বুজরুকি। আসলে লোকটা ভণ্ড। কিছু ইন্দ্রজাল কোথাও থেকে শিখে এসেছে নিশ্চয়ই। তাই দিয়ে ভেলকি লাগাবে।'

বিশ্বাসীরা বলল, 'হোক না ইন্দ্রজাল। সেও তো লোকে টিকিট কেটে দেখে। আমরা না হয় বিনি পয়সায় একদিন তাই দেখব। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। বুঝেছ?'

দেখতে-দেখতে সেইদিন এগিয়ে এল। অর্থাৎ, মায়ের মহাপুজোর দিন। ইতিমধ্যে করালীবাবুর প্রচেষ্টায় গ্রামের কাঁচা রাস্তা পাকা হয়েছে। তারিণীখুড়ো পণ না নিয়েই দশঘরার সেই মেয়েটির সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। নটবর স্কুলবাড়ি পাকা করে দিয়েছেন বাত-ব্যথা আরোগ্যের আশায়। নটবর আলতাবাবার কথামতো রোজ দুপুরে শ্মশানে আসেন এবং রুপি ও সুপি তাঁকে ইঁদুরে-তোলা মাটি (বাতের অব্যর্থ ওষুধ) আলতাবাবার কাছে মন্ত্রপূত করিয়ে সর্বাঙ্গে ডলে-ডলে মাখিয়ে দেয়। সুদখোর যুধিষ্ঠিরও তাঁর বন্ধকি কারবার উঠিয়ে সকলের সবকিছু ফিরিয়ে দিয়েছেন।

যাই হোক, মায়ের মূর্তি গড়েছে গ্রামেরই মানুষ গণপতি পটুয়া। আলতাবাবার নির্দেশমতোই নির্মিত হয়েছে সেই মূর্তি।

শ্মশানের একপ্রান্তে বেদী স্থাপনা করে লাল শালু দিয়ে ঘিরে মাকে বসানো হয়েছে। পরদা সরানো না হলে মাকে দর্শন করা যাবে না। গভীর রাতে পুজো। সন্ধ্যে থেকেই দলে দলে লোক এসে ভরিয়ে ফেলল শ্মশানক্ষেত্র। চারদিক থেকে পুজো আসতে লাগল। সে এক হইহই ব্যাপার।

কত লোক কত যে মানত করেছিল, তার ঠিক নেই। করবে না-ই বা কেন? সাধকের সাধনার শক্তিতে দেবী জাগ্রতা হবেন। এ কি যা-তা কথা? কেউ সোনার জিভ দিল, কেউ দিল হার, কেউ রুপোর নথ, কেউ-বা কাতান। মোটমাট সামর্থ্য অনুযায়ী যে যা পারল তাই দিল। আলতাবাবা তো তাই দেখে রেগেই অস্থির। চিৎকার করে বললেন, 'আবার ঘুষ? মা-ব্রহ্মময়ীকে এইসব দিয়ে ভোলাবি তোরা? এইভাবে হাত করবি মাকে?'

ভক্তরা বলল, 'আমাদের মানসিক ছিল বাবা। তাই এনেছি। এ আপনাকে গ্রহণ করতেই হবে।'

আলতাবাবা এবার বিরক্তির সঙ্গে মুখ দিয়ে একটা 'ফুঃ' শব্দ করে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মতো সেগুলো দেবীর বেদীমূলে রেখে দিলেন।

রুপি আর সুপি প্রণামীর টাকা-পয়সাগুলো একটা থলির ভেতর পুরতে লাগল।

যথাসময়ে পুজোয় বসলেন আলতাবাবা।

করালীবাবু নরসুন্দর ডেকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে প্রায়শ্চিত্ত করলেন। আর তো দু'মাস বাদেই আলতাবাবার আশীর্বাদে মন্ত্রী হচ্ছেন তিনি। মনে বাসনা, মন্ত্রী হয়ে এই শ্মশানে মায়ের একটা মন্দিরও করে দেবেন।

ধূপ ও ধুনোর গন্ধে চারদিক ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল। গুগ্‌গুলের গন্ধে চারদিক ভরপুর।

আলতাবাবা ভয়ানক চিৎকার করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন। গভীর রাতে যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়ে চ্যালানো কাঠের ওপর ঘি ঢেলে শুরু করলেন মহাব্যাহৃতি হোম। যুধিষ্ঠিরের বন্ধকি কাগজপত্রগুলো যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হল।

আহুতির পর আলতাবাবা বললেন, 'এইবার হবে সেই আসল কর্মটি। অর্থাৎ কিনা মায়ের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। মা জীবিত হবেন। কেউ দেখবে না। সবাই চোখ বন্ধ করে থাকো। না হলে অল্পদিনের মধ্যেই অন্ধ হয়ে যাবে সব।'

তবুও রুপি আর সুপি মায়ের মূর্তির সামনের পরদাটা টেনে দিল। বলা যায় না, ভুল করে যদি কেউ দেখে ফেলে। তা হলে তো বরাবরের জন্য অন্ধ হয়ে যাবে বেচারি।

যাই হোক, পরদার আড়ালে আলতাবাবা অনেকক্ষণ ধরে মন্ত্রপাঠের পর বললেন, 'এইবার পরদা উন্মোচন করো।'

রুপি আর সুপি পরদা সরিয়ে দিল।

আলতাবাবা বললেন, 'ওরে পাপিষ্ঠের দল, দু'চোখ মেলে দ্যাখ এবার সেই মাটির প্রতিমা প্রাণ ফিরে পেয়েছে কি না।'

কিন্তু দ্যাখ বললেই কি দেখা সম্ভব? অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে শ্মশানের ঘন গাছপালার ছায়ায় সামান্য কটি প্রদীপের আলোয় ওই ধোঁয়াচ্ছন্ন মণ্ডপে সবই যে ছায়াময়।

আলতাবাবা আবার বললেন, 'দ্যাখ, দেখে নে। মা কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবেন না। একটু পরেই ঈশান কোণ দিয়ে চলে যাবেন তোদের সকলের সমস্ত পাপ-তাপ হরণ করে। তোদের মানবজন্ম সার্থক কর তোরা।'

একজন বলল, 'দেখেছি, দেখেছি। জয় মা। ওই তো, ওই তো মায়ের হাতের খাঁড়াটা কেমন দুলছে।'

আর একজন বলল, 'মা আর জিভ বার করে নেই। কেমন ফিক ফিক করে হাসছেন দ্যাখো?'

আলতাবাবা বললেন, 'তোদের দেওয়া বেনারসি মাকে কী সুন্দর করে পরিয়ে দিয়েছি দ্যাখ।'

সবাই 'জয় মা, জয় মা', করতে লাগল।

আলতাবাবা বললেন, 'যদি অবিশ্বাসী কেউ থাকিস তো মাকে পরীক্ষা করে দ্যাখ। মা সত্যিই জীবিত কি না। আয়, এদিকে আয়।'

কেউ এল না। কেই বা আসবে। কার এত সাহস যে পরীক্ষা করবে মাকে?

এমন সময় পাশের গ্রামের এক যুবক এগিয়ে এসে বলল, 'আমি পরীক্ষা করব।'

আলতাবাবা রক্তচক্ষুতে বললেন, 'কী বললি? মা'কে পরীক্ষা করবি? এতদূর স্পর্ধা!'

'হ্যাঁ, আমার যা হয় হোক। মরি সেও ভাল। একবার আমি পরীক্ষা করে দেখব। আমি বিশ্বাস করি না ওইসব বুজরুকি।'

আলতাবাবা রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। বললেন, 'নে, তা হলে পরীক্ষা কর।' বলে একটা বেল-কাঁটা যুবকের হাতে দিয়ে বললেন, 'দেবীর চরণে একটু বিঁধিয়ে দ্যাখ রক্ত পড়ে কি না। তবে এও জেনে রাখিস, দেবীর রক্তপাতে তোর বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না।'

যুবক বলল, 'না থাকুক, তবু আমি পরীক্ষা চাই।' বলে সেই বেল-কাঁটা হাতে নিয়ে দেবী-প্রতিমার সামনে গিয়ে দাঁড়াল যুবক। তারপর কিছুক্ষণ প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেবীর চরণে কাঁটাটা সজোরে প্যাঁক করে ফুটিয়ে দিতেই শিবের থেকে মা-কালী তড়াক করে লাফিয়ে উঠে খাঁড়া-টাঁড়া ফেলে দিয়েই চিৎকার করে উঠল, 'উঃ রে, বাপ রে। গেছি রে। হতচ্ছাড়া আমার পায়ে এই এতখানি কাঁটাটা বিঁধিয়ে দিয়েছে রে।'

মা-কালীকে লাফাতে দেখে আলতাবাবাও লাফাতে লাগলেন, 'সম্বরো সম্বরো। ক্রোধ সম্বরো দেবী। অবোধ বালক জানে না, তাই তোমাকে পরীক্ষা করতে গেছে। তুমি এবারের মতো ওকে ক্ষমা করে দাও মা-জননী।'

'ধ্যুত, তোর পরীক্ষার নিকুচি করেছে। সেই থেকে মশার কামড়ে আর ধোঁয়ায় পরাণ আমার বেইরে গেল। এখন সাধুগিরি ফলাতে লোক ডেকে এনে আমার পায়ে কাঁটা বেঁধানো হচ্ছে। শিগগির আমার টাকা-পয়সা মিটিয়ে দিবি। নইলে তোর একদিন কি আমার একদিন দেখে নেব। আমি এক্ষুণি চলে যাব এখান থেকে।'

গ্রামসুদ্ধু লোক তখন হাসবে না কাঁদবে না নাচবে কিছুই ঠিক করতে পারল না। তবে তারা বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ওঠার পরই যা দেখল, তা হল এই, তারা দেখল আলতাবাবা এবং তার দুই সঙ্গী রুপি আর সুপি গ্রামের গণপতি পটুয়াকে সঙ্গে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে নদীর দিকে দৌড়চ্ছে। সে কী দৌড়। ষাঁড়কে তাড়া করলে যেমন ল্যাজ তুলে ছোটে, অনেকটা সেইরকম।

কিন্তু দৌড়লেই তো হল না। পালাবে কোথায় বাছাধনরা? এখানকার দুঁদে দারোগা বদনবাবু আগে থেকেই ব্যাপারটার খারাপ দিক চিন্তা করে একটা জাল বিছিয়ে রেখেছিলেন। তাই টপাটপ ধরে ফেললেন সকলকে। আলতাবাবার নকল জটা-দাড়ি টেনে খুলতেই হরি কর্মকারের ছেটে ছেলে বিশুর আত্মপ্রকাশ ঘটল। বিশুটা আগে শখের দলে যাত্রা করত। সুযোগ পেলেই ছিঁচকে চোরের মতো চুরি-চামারিও করত মাঝে-মাঝে। পঞ্চা বেদে ছিল ওর আর-এক চ্যালা। ওরই কারসাজিতে ভুবন যুগীর বউয়ের গয়না চুরির ব্যাপারে ফেঁসে যায় দু'জনে। স্যাকরার দোকানে গয়না বিক্রি করতে গিয়ে ধরা পড়ে মার খায় বিশু। তারপর গ্রামের জমিদার করালীবাবু সকলের সামনে বিশুকে কান ধরে ওঠ-বোস করান। মুখে জুতো মেরে, ন্যাড়া করে,

ঘোল ঢেলে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেন। তারপর থেকে বিশুকে আর কখনও এ-গ্রামে দেখা যায়নি। দেখা গেল, অনেক দিন পরে এই ছদ্মবেশী আলতাবাবারূপে। তবে, শুধুমাত্র অতি চালাকি করতে গিয়েই হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল বেচারি।

রুপি আর সুপিকে চেনা গেল না অবশ্য। তবে জেরার উত্তরে ওরা স্বীকার করল ওদের বাড়ি নাকি দূরের একটা গ্রামে।

আর সেই জলজ্যান্ত মা-কালী? তার নাম আন্নাকালী মান্না। সেহারা বাজারের দিগম্বরী অপেরা থেকে ভাড়া করে আনা হয়েছিল তাকে।

কিন্তু গণপতি পটুয়া? সে তো এই গ্রামেরই লোক। দু-একটা চড়চাপড় খেতেই সে বেচারি অকপটে স্বীকার করল, এই গ্রামের সমস্ত খবরাখবর সেই দিত বিশুকে। এবং তারই নির্দেশে এমন এক কালীমূর্তি সে তৈরি করেছিল যাকে চট করে অন্যত্র সরিয়ে রেখে জ্যান্ত কালী নিমেষে দাঁড়িয়ে পড়তে পারে শিবের বুকে।

যাই হোক, এই ব্যাপারটা নিয়ে গ্রামসুদ্ধু লোক হইহই করতে লাগল।

করালীবাবু রাগে কাঁপতে লাগলেন। মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখে এত লোকের সামনে কান ধরে ওঠ-বোস করা। নিজের মুখে নিজে জুতো মারা এবং তার চেয়েও বড় ব্যাপার, মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

তারিণীখুড়োও বুক চাপড়াতে লাগলেন। একটা জোচ্চোরের কথা শুনে বিশ হাজার টাকা নগদ আর দশ ভরি সোনা ছেড়ে দিয়ে কী ভুলই না করেছেন তিনি।

নটবরেরও ওই একই অবস্থা। তিনিও বুক চাপড়াতে লাগলেন। তাঁর এত কষ্টের টাকা দিয়ে কিনা একটা স্কুলবাড়ি তৈরি হল? তাতেও রক্ষে নেই, এর ওপর আবার বারোয়ারীতলায় একটা টিউবওয়েল। উঃ, ভগবান।

যুধিষ্ঠিরের অবস্থাও তথৈবচ। তাঁর এতদিনের বন্ধকি কারবার, হায় হায় রে।

কিন্তু তবুও এত বিপর্যয়ের পরও নটবর আর যুধিষ্ঠির একটু সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন।

নটবর বললেন, 'তবে আর যাই হোক, বিশেটা একটু কিছু বোধ হয় শিখেছিল। তাই ওর মাটির গুণে আমার বাতের ব্যথাটা অর্ধেক সেরে গেছে।'

যুধিষ্ঠির বললেন, 'আমার ছেলেটাও কিন্তু ওর ওই আমলকী খেয়ে বেশ ভাল আছে ভাই।'

গ্রামের লোকেরা কিন্তু এই ব্যাপারে খুবই খুশি।

এদিকে দুঁদে দারোগা বদনবাবু যা কখনও করেননি এবারে তাই করলেন। অর্থাৎ ধৃতদের কাউকে কোনওরকম শাস্তি না দিয়ে বললেন, 'তোদের চ্যাংড়ামোর জন্য আর যাই হোক, এই গ্রামের অনেক উন্নতি এবং অনেকের অনেক উপকার হয়ে গেল। তাই তোদের কাউকেই কিছু না বলে বেকসুর খালাস করে দিলাম। তবে এখন আর কিছুদিন এই গ্রামের ত্রি-সীমানায় থাকিস না। রাতের অন্ধকারে মাঠে-মাঠে যেদিকে পারিস পালিয়ে যা।

একমাত্র গণপতি পটুয়া ছাড়া সবাই পালাল, গণপতির তো উপায় নেই। ওর বউ ছেলে মেয়ে সবাই আছে। কাজেই লজ্জা-ঘেন্নার মাথা খেয়ে আবার গ্রামেই ফিরে এল সে।

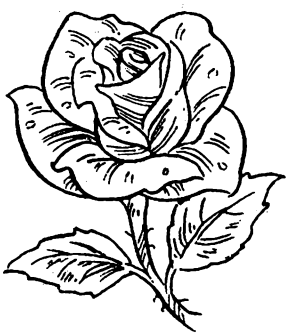

গুরুদেবের বিপত্তি

অনেকদিন আগে পুরন্দরপুরে বগলা ভট্‌চায নামে এক বামুন থাকতেন। সামান্য কিছু জমি-জমাও ছিল তাঁর। সেই সঙ্গে গোরু, ছাগল, হাঁসও পালন করতেন। আর লোকের বাড়ি বাড়ি পুজো-আর্চা করে সংসার চালাতেন। তা ছাড়া আরও একটি কাজ করতেন। সেটি হল গুরুগিরি। দীক্ষাদান করে গ্রামে গ্রামান্তরে বেশ কয়েকঘর শিষ্য-শিষ্যা জোগাড় করেছিলেন তিনি। এর ফলে অভাবের সংসার ছিল না তাঁর।

গ্রামের লোকেরা কেউ তাঁকে ঠাকুরমশাই কেউ-বা গুরুদেব বলত। তবে কিনা শ্রদ্ধাভক্তি বিশেষ একটা করত না কেউ। আড়ালে আবডালে বলত, হাঁড়িচাঁচা বামুন। কেউ বলত, বগা ভট্‌চায। বলবে নাই-বা কেন! বগা

ভট্‌চায ছিল যেমনই লোভি, তেমনই পেটুক। কারও মাচায় লাউ হয়েছে অমনই নজর, 'দাও'। কারও ক্ষেতে কুমড়ো হয়েছে কি অন্য কোনও ফসল, চোখে পড়ল তো দাও-দাও-দাও। অথচ নিজের ক্ষেতের ফসলগুলি যত্ন করে সামলে রাখতেন। হাটবারে হাটে গিয়ে বিক্রি করে আসতেন।

তা মাঝে মধ্যেই এ গ্রাম সে গ্রাম করে শিষ্যবাড়ি যেতেন কিছু না কিছু হাতিয়ে আনবার ধান্দায়। হাজার হলেও গুরুদেব তো, প্রণামী নিতে না গেলে চলবে কী করে? শিষ্যরা তো রোজ রোজ বাড়ি বয়ে এসে প্রণামী বা অন্য কিছু দিয়ে যাবে না। সঙ্গে যেত কেষ্টা নামে এক চ্যালা। গুরুদেবের তল্পি বয়েই নিয়ে যেত সে।

শিষ্যবাড়িতে গিয়ে লোভের চোখ ঘুরপাক খেত চারদিকে। এটা দাও, ওটা দাও বলে নাস্তানাবুদ করে মারতেন গৃহস্থকে। এর ওপরে ছিল ফরমায়েসি ভুরিভোজের আবদার। তখনকার দিনে মানুষজন খুবই সরল ছিল, তাই কেউ বিরক্ত হত না। বরং গুরুদেবকে প্রসন্ন করে তৃপ্ত হত সকলে। এবং বেশ ভক্তি সহকারে যত্ন-আত্তি করত গুরুদেবের। তা বগা ভট্‌চায তো এমনিতেই লোভি ও পেটুক। তাই যে বাড়িতে ধন-সম্পদ বেশি থাকত বা খাওয়া-দাওয়া ভাল হত, সেই বাড়িতে যখন তখনই গিয়ে হাজির হতেন।

সেদিনও ভরদুপুরে কেষ্টাকে সঙ্গে নিয়ে পাঁচ মাইল দূরের এক গ্রামে গিয়ে হাজির হলেন বগা ভট্‌চায।

এই গ্রামে হরিহর নামে এক সম্ভ্রান্ত চাষী ছিল। দারুণ গুরুভক্তি তার। গুরু এলে সে যে কী করবে তার ঠিক ছিল না। গুরুকে কোথায় বসাবে, কী খেতে দেবে এই চিন্তাতেই অধীর হয়ে উঠত সে। কিন্তু হলে কি হবে, চাষী-বউ গুরুদেবকে একদম সহ্য করতে পারত না। গুরুর হ্যাংলা বৃত্তি, খাই-খাই, দাও-দাও ভাব ভাল লাগত না তার। মনে মনে খুবই বিরক্ত হত তাই। তার ওপর সময় নেই অসময় নেই হুট করতেই গুরুদেব এসে হাজির হলে তার কাজেরও অসুবিধে হত, গতর যেত।

বগা ভট্‌চায যখন চাষীর বাড়িতে এলেন, চাষী তখন সে বেলার মতো কাজকর্ম সেরে স্নান করতে গেছে।

এমন অসময়ে গুরুকে আসতে দেখেই তো মেজাজ বিগড়ে গেল চাষী-বউয়ের। এখনই তাকে গুরুসেবার জন্য নানারকম রান্নাবান্না করতে হবে। তাছাড়াও আরও কত কি যে করতে হবে তার ঠিক কী? তাই মুখ গোমড়া

করে দাওয়ার ওপর একটা শীতলপাটি বিছিয়ে বসতে দিল গুরুকে।

বগা ভট্‌চায দেখেও দেখলেন না তা। কেষ্টাকে নিয়ে দাওয়ায় বসে একটা হাই তুলে বললেন, 'হরিহর কোথায় মা?'

চাষী-বউ মুখ গোমড়া করেই বলল, 'চান করতে গেছে।'

বগা ভট্‌চায বুঝলেন হাওয়া খারাপ। তাঁর এই অসময়ে আসাটা এবং এত ঘনঘন আসা-যাওয়া মোটেই ভালভাবে নিচ্ছে না এরা। তবুও চাষী-বউয়ের মন রাখবার জন্য বললেন, 'সেবার তুমি কাৎলা মাছের মুড়োটা যা রেঁধেছিলে মা এখনও মুখে লেগে আছে। তার ওপর সেই ক্ষীরের মালপো। তার স্বাদ যেন আজও ভুলতে পারিনি। সেই লোভেই আবার এলুম। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার হাত তোমার।'

কেষ্টা বলল, 'আর সেই কচি পাঁঠার মাংস?'

বগা ভট্‌চায ধমক দিয়ে বললেন, 'আঃ। থাম দেখি, তোর শুধু খাই খাই। এক বেলায় এত কখনও মানুষ পেরে ওঠে? কচি পাঁঠার মাংস রাত্রে হবেখন। ক্ষীরের মালপো, ক্ষীরের পায়েস ওসব করতে তো সময় লাগবে।'

গুরুদেবের কথা যত শুনতে লাগল, চাষী-বউ ততই জ্বলে যেতে লাগল। চাষী গেছে স্নান করতে, চাষী-বউ সবে রান্না শেষ করেছে। এবার চাষী ফিরলে খেয়ে-দেয়ে দুজনে একটু বিশ্রাম নেবে কোথায়, তার জায়গায় কী আপদ। চাষীর গুরুভক্তির ঠ্যালা সামলাতে এখনই আবার হেঁসেলে ঢুকতে হবে ভেবে চোখে জল এল বেচারির। গা-পিত্তি জ্বলে গেল। রাগের চোটে তাই কী যে করবে তা ভেবে না পেয়ে গুম হয়ে নিজের মনেই গায়ের ঝাল ঝাড়তে নোড়াটা নিয়ে শিলের গায়ে অযথা ঘষাঘষি করতে লাগল।

বগা ভট্‌চায হাওয়া ভাল বুঝলেন না।

কেষ্টাও হাওয়া খারাপ বুঝে বগা ভট্‌চাযের মুখের দিকে তাকাল।

অন্যসময় গুরুদেব বাড়িতে এলে চাষী-বউ পা ধোওয়ার জল দেয়, দুধ মুড়ি কলা দিয়ে জলখাবার দেয়, প্রণাম করে। এবারে কিছুই করল না। তার জায়গায় মুখ গোমড়া করে শিল-নোড়ায় অযথা ঘষাঘষি। কী কাণ্ড!

বগা ভট্‌চায পিট পিট করে সেই দৃশ্য দেখে বললেন, 'তুমি নোড়াটাকে নিয়ে অমন করে ঘষছ কেন মা?'

চাষী-বউ বলল, 'ভরদুপুরে যেমন এসেছ, এখন আর তোমাকে কি গেলাবো? এবার এটাই তোমার মুখে গুঁজব, তাই।'

শুনেই তো চোখ কপালে উঠে গেল বগা ভট্‌চাযের। একী বিপত্তি। চাষী-বউয়ের এমন মূর্তি তো এর আগে কখনও দেখেননি। আপনি থেকে একেবারে তুমি!

কেষ্টা চাপা গলায় গলল, 'এখনও সময় আছে ভট্‌চায। ভাল চাও তো কেটে পড়ো।'

বগা ভট্‌চায বললেন, 'বরাত মন্দ আজ, তাই চিচিংফাঁক।'

'তবে। এরপর একদণ্ডও এখানে থাকলে ফল কিন্তু ভাল হবে না।'

'অর্থাৎ প্রহারেণ ধনঞ্জয়।' বলেই ইশারায় উঠে পড়তে বললেন কেষ্টাকে।

কেষ্টা ততক্ষণে তল্পিতল্পা নিয়ে আদেশ হবার আগেই উঠে দাঁড়িয়েছে।

বগা ভট্‌চায চরম বিপত্তি হবার আগেই কেষ্টাকে নিয়ে বিদায় নিলেন।

একটু পরেই 'জয়গুরু শ্রীগুরু' বলতে বলতে পুকুরঘাট থেকে স্নান সেরে ফিরে এল হরিহর। এসেই বলল, 'একি! গুরুদেব কই? কোথায় গেলেন গুরুদেব? আমি যে পুকুরঘাট থেকেই দেখলুম তিনি আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে আসছেন।'

চাষী-বউ বলল, 'এসেছিলেন তো।'

'তা হলে কোথায় গেলেন তিনি?'

'আমার ওপর রাগ করে তিনি চলে গেছেন।'

'সেকী! রাগ করে চলে গেছেন? কেন?'

'কেন আবার! গুরুদেব এসেছেন। তাই আমি ধন্য হয়ে আরও কিছু রান্নার জন্য বাটনা বাটবো বলে যেই না শিল-নোড়াটা বের করেছি, অমনই উনি নোড়াটা চেয়ে বসলেন। আমি দেইনি তাই।'

হরিহর তো কপাল চাপড়ে হায় হায় করতে লাগল। বলল, 'এই ভরদুপুরে গুরুদেব অভুক্ত চলে গেলেন এটা কি ঠিক হল? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! সামান্য একটা নোড়া তুমি গুরুদেবকে দিতে পারলে না?'

চাষী-বউ বলল, 'বাঃ রে। নোড়া দিলে আমি বাটনা বাটব কী করে? তাছাড়া নোড়া দিলেই তো উনি শিলটা চাইবেন, তখন?'

'তখন দ্যাখা যেত। শিল-নোড়া দুটোই দিলে ক্ষতি কি ছিল? দুটো নতুন শিল-নোড়া না হয় কিনেই আনতাম হাট থেকে।' বলে বলল, 'দাও দাও, নোড়াটা দাও। দিয়ে আসি গুরুদেবকে। মনে হয় এখনও বেশিদূর যেতে পারেননি।' বলেই বউয়ের হাত থেকে নোড়াটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়েই

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল গুরুদেবকে দেবে বলে।

এদিকে দূর থেকে হরিহরকে ওইভাবে ছুটে আসতে দেখেই তো বগা ভট্‌চাযের চোখ কপালে উঠে গেল।

আঁৎকে উঠল কেষ্টাও। বলল, 'সেরেছে রে। ওই-ওই দ্যাখো ভট্‌চায, হরিহর কেমন রেসের ঘোড়ার মতো ছুটে আসছে। এল বলে। এসেই নোড়াটা নির্ঘাৎ গুঁজে দেবে আমাদের মুখে।'

বগা ভট্‌চায বললে, 'ছোট-ছোট আরও জোরে ছোট। শাস্ত্রে আছে যঃ পলায়তি স জীবতি।'

হরিহরেরও দ্বিগুণ জোরে ছুটতে লাগলেন বগা ভট্‌চায ও কেষ্টা।

হরিহর ছুটতে ছুটতে হাঁফাতে হাঁফাতে নোড়াটা উঁচিয়ে ধরে দূর থেকেই চেঁচাতে লাগল, 'গুরুদেব! নোড়া। গুরুদেব! নোড়া। গুরুদেব—!'

আর গুরুদেব। বগা ভট্‌চায ভাবলেন, হরিহর রেগেমেগে নোড়াটা ওঁদের মুখে গুঁজবে বলেই তেড়ে আসছে। তাই ছোটার মাত্রা আরও বাড়িয়ে কাছা-কোছা খুলে ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে পগার পার হয়ে কেষ্টাকে নিয়ে কোথা দিয়ে যে কোথায় পালালেন হরিহর তা টেরও পেল না।

শ্রীযুক্ত ব্যাকরণবিদ

ব্যাকরণবিদ হারিয়ে গেলেন। দুপুরবেলা চেঁচোদের বাগানে ঘাস খেতে খেতে কোথায় যে লম্বা দিলেন তা কেউ টেরও পেল না। নেহাত ছোটখাটো চেহারা নয়, একেবারে খাস পাটনাই পাঁঠা। কেউ বিরক্ত করলে 'ব্যা ব্যা' ছাড়া বেশি বাক্যব্যয় করেন না। সে হেন ব্যাকরণবিদ উধাও হয়ে গেলেন।

খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল চারদিকে।

সকালবেলা গ্যাঁড়া হারু আঙুল দেখিয়ে কাকে যেন বলেছিল, ওই দ্যাখ রাম পাঁঠা, তাই কি এত রাগ? কিন্তু তা যদি হয় তবে আমিও তো গোলাদাকে বলেছিলাম, বুঝলে গোলাদা, আমাদের ওই ব্যাকরণবিদকে অনেকটা সেই হেড আপিসের বড়বাবুর মতন দেখতে। তাতেই বোধ হয় সেন্টিমেন্টে লেগে গেছে। অবশ্য সেন্টিমেন্ট থাকলে লাগবেই। বেল পাকলে কাকও ঠোকরাবে। সেটা কোনও বড় কথা নয়। কিন্তু গেলেন কোথায় উনি? কাছে-পিঠে যে নেই তা বেশ বোঝাই যাচ্ছে। কেননা কাছে-পিঠে থাকলে ওনার

গায়ের বোটকা গন্ধের খুসবুই জানিয়ে দিত উনি কোথায় আছেন। তবে কি ব্যাকরণবিদকে কেউ ধরে নিয়ে গেল পিকনিক ভোজনের জন্য? কিন্তু কার এমন সাহস হবে যে পাটনাই পাঁঠা ব্যাকরণবিদের সিং-এর কাছে এগোয়?

রাত্রিবেলা লেকের ধার দিয়ে আসছি, হঠাৎ দেখি ব্যাকরণবিদ একটা বেঞ্চির ওপর বেশ আয়েস করে বসে আছেন। শুধু উনি নয়, পাশে আরও একজন কে যেন বসে আছে। চেহারা দেখে মনে হয় পাগল। ময়লা ছেঁড়া জামাকাপড়। কাঁধে একটা ঝোলা। উসকোখুসকো চুল। কবিও হতে পারে, শিল্পীও হতে পারে। কেরানী কিংবা কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা হওয়াও বিচিত্র নয়। তবে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে পা হতে মাথা পর্যন্ত জরিপ করলে বোঝা যায়, এটা পাগলই।

তা যাক। ছাগলের পাশে পাগল থাকবে এ আর এমন কথা কী? এরকম তো হয়েই থাকে।

যাই হোক, ব্যাকরণবিদ আমাকে দেখেই মুখখানি ঘুরিয়ে নিলেন।

ছাগমুখে পাটনাই দাড়িটা একবার ফুরফুর করে উঠল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আরে ব্যাকরণবিদবাবু, আপনি এখানে? এদিকে আমরা থানা-পুলিশ, জেল-হাজত, মিসিং-স্কোয়াড, খোঁয়াড়, কী না করে বেড়াচ্ছি আপনার জন্য।'

পাগলটা এবার রক্তচক্ষুতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেন, এখানে থাকবে না তো কোন্ যমের বাড়িতে যাবে শুনি?'

আমি বললাম, 'না না। ষাট-বালাই, একষট্টি, বাষট্টি, তেষট্টি, চৌষট্টি, যমের বাড়িতে কেন যাবে? সেই কথাই কি আমি বললাম?'

ব্যাকরণবিদ বললেন, 'যমের বাড়ি কেন, যমের শ্বশুরবাড়িতেও যাবো না আমি।'

পাগল বলল, 'হক কথা, কেন যাবে?'

ব্যাকরণবিদ বললেন, 'যাবো না-ই তো। আসলে যতদিন না আমাদের প্রকৃত মূল্যায়ন হচ্ছে ততদিন আমরা কোথাও যাবো না। এইখানেই বসে আড্ডা দেবো। লেকবাজি করব।' বলেই আকাশের দিকে মুখ তুলে ডাকতে লাগলেন—ব্যা-ব্যা-ব্যা—।

কী জ্বালা।

আমি হাত দুটি জোড় করে বললাম, 'না, মানে আপনার ওই মূল্যায়নের

ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝলাম না। কিসের মূল্যায়ন? কী চান আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন তো?'

ব্যাকরণবিদ বললেন, 'দাঁড়াও।'

'আজ্ঞে আমি তো দাঁড়িয়েই আছি।'

'আরে ও দাঁড়ানো নয়। একটু অপেক্ষা করতে বলছি। আমরা কী চাই, আসলে আমরা সেটাই জানি না। আগে ভেবেচিন্তে দেখি, তবেই না মূল্যায়ন?'

'সেকী! আপনি অভিমানে গৃহত্যাগ করলেন অথচ এখনও পর্যন্ত ভেবে দেখলেন না কী আপনি চান?'

পাগলটা এবার রেগেমেগে কটমটিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি সেই থেকে আপনি আপনি করছো কেন হে ছোকরা? একবচন দ্বিবচন পড়োনি? আপনি কী? আপনারা। অভিযোগ তো আমারও আছে। আমাদের দুজনেরই। অত ব্যস্ত হলে চলে? এসব হচ্ছে গিয়ে দার্শনিক চিন্তা। সুকুমার রায়ের 'হযবরল' পড়োনি? তাহলেই বুঝতে। চট করে অমনি মতামতটা দিয়ে ফেললেই হল? আগে মাথা খাটিয়ে অভিযোগটা তৈরি করতে হবে তো?'

ব্যাকরণবিদ বললেন, 'না না, তা কেন? অভিযোগ তৈরি করতে খরচা অনেক। ঘুঁটে আনো, কেরোসিন ঢালো, দেশলাই জ্বালো, কয়লা দাও। বাবাঃ! যা কয়লার দাম। গুলেরও সেই অবস্থা। গুল মারা যায় কিন্তু ঘেঁস অভাবে গুল দেওয়া যায় না। তবে হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে বকবক করতে করতেই মনে পড়েছে। অভিযোগ হচ্ছে সেই যে সেই, আবার ভুলে গেলুম, সেই ব্যাপারটা নিয়ে।'

'কোন্ ব্যাপারটা নিয়ে?'

'বলছি না ভুলে গেলুম।'

'তাহলে মনে করুন।'

পাগলটা কী যেন একটু ভেবে মাথায় টুসকি মেরে বলল, 'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। সেই ছাগল আর পাগলের ব্যাপার। নিরীহ ওই প্রাণী দুটির নামে মিথ্যে অপবাদের ব্যাপারটা নিয়েই আমাদের অভিযোগ।'

'তাই নাকি? তাই নাকি? তাহলে বলেই ফেলুন।'

'বলবো? হ্যাঁ, বলবো বলেই তো বসে আছি। তোমরা আমাদের দুজনের নামেই মিথ্যে অপবাদ দিয়েছ।'

'মিথ্যে অপবাদ দিয়েছি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। দিয়েছই তো। প্রমাণ না রেখে আমরা কোনও কথা বলি না হে। সব টেপ করা আছে আমাদের। সময় হলেই বাজাবো।'

'কী অপবাদটা দিয়েছি আমরা শুনি?'

'শুনবে? তোমরা প্রায়ই কথায় কথায় বলো না, ছাগলে কী না খায়, পাগলে কী না বলে?'

'বলিই তো।'

'এতেই আমাদের প্রেস্টিজে লেগেছে।'

আমি হেসে বললাম, 'আরে ও তো আমাদের কথার কথা। ওই নিয়ে কেউ রাগ করে নাকি?'

ব্যাকরণবিদ বললেন, 'কেন করব না শুনি? পাগল ছাগল পেয়ে যা-তা একটা বলে দিলেই হল? আমরা যদি এতই খারাপ হতাম, তাহলে কেউ নিজের বউ বা মেয়েকে আদর করে পাগলি বলত না। আর তোমাদের আচ্ছা আচ্ছা ঘরের লোকেরা বা বামুন পণ্ডিতরা দোকান থেকে ছাগলের মাংস কিনে এনে খেত না। ছাগলের মাংস যারা পেটে পুরল, তারাও তো তাহলে ছাগল হয়ে গেল। ঠিক কিনা?'

আমি আমতা আমতা করে বললাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক।'

'তব্বে? ছাগলরা এত ফ্যালনা নয়, বুঝেছো? নেহাত জুতো পরি না তাই, না হলে ধরে জুতিয়ে দিতাম।'

পাগলটা বলল, 'আমি অবশ্য জুতো পরি। এই তো, কিছুদিন আগে একটা সাহিত্যসভা থেকে একপাটি লেডিজ জুতো চুরি করে এনে আমি পরেছিলাম।'

ব্যাকরণবিদ বললেন, 'আমাদের কথা কিন্তু শেষ হয়নি এখনও। আগে আমার কথা শেষ করতে দাও, তারপর বলবে। হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম?'

'সেই পাগল আর ছাগলের কথা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। তোমরা যে বলো ছাগলে কী না খায় পাগলে কী না বলে। তা ছাগলে কবে ঘুষ খেয়েছে গো তোমাদের মতো? তার ওপর তুমি আবার

সাতসকালে উঠে তোমাদের ওই হাড়কিপটে ঘুষখোর বড়বাবুটার সঙ্গে আমার তুলনা করলে? এতে কার না রাগ হয় বলো?'

পাগলটা অমনি বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আমারও ওই একই অভিযোগ। পাগলে কী না বলে, এইরকম অপবাদ তোমরা আমাদের নামে দাও। থুঃ থুঃ। আমরা নিজের খেয়ালে ভুল-ভাল একটু বকি বটে, বাজে কথাও অনেক বলি, কিন্তু তাই বলে তোমাদের ওই ভোটবাজ নেতাদের মতো ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথাগুলো বলি কখনও? সত্যি করে বলো?'

আমি বললাম, 'না।' বলে হাঁ করে ওদের দিকে চেয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

এদের দুজনের এই নির্ভেজাল সত্যিকথাগুলোর কী উত্তর যে দেবো তা ভেবে পেলাম না। হঠাৎ ডাকে ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখি না কোথায় কী! আমাদের পাটনাই পাঁঠা ব্যাকরণবিদ দিব্যি উঠোনে দাঁড়িয়ে মুচ মুচ করে কাঁঠালপাতা চিবোচ্ছে। কিন্তু পাগলটা? সে কেমন স্বপ্নের মধ্যেই মিলিয়ে গেল।

কুন্তীঘাটের পাঁচালি

হুগলি জেলায় কুন্তীঘাটে বেহুলা যেখানে কুন্তীর সঙ্গে এবং বেহুলা কুন্তী এক হয়ে যেখানে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, ঠিক সেখানেই বিরাট একটি বটগাছ উঁচু বাঁধের ওপর থেকে গঙ্গার দিকে ডালপালা মেলে হেলে রয়েছে। সেই গাছের ডালে ডালে কত পাখির বাসা। তাদের কলতানে সব সময় জায়গাটি মুখর হয়ে থাকে। শান্ত নদী ও পুণ্যতোয়া ভাগিরথীও যেন উন্মনা হয়ে ওঠে।

একটা নৌকো স্রোতের দোলায় দুলে দুলে উঠছে। বটগাছের হেলে পড়া একটি ডালের সঙ্গে পেঁচিয়ে বাঁধা আছে নৌকোর দড়ি। মৃদুমন্দ বাতাসে স্থানটি সুশীতল। গঙ্গার ওপারে ধূ-ধূ করছে আদিগন্ত হলুদ বালুরাশি। সাদা সাদা বকগুলো সেখান থেকে নীল আকাশের কোলে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। আসন্ন সন্ধ্যায় দিনান্তের শেষ আলো বটের পাতায় ঝিলিক দিচ্ছে। দূর দিগন্তের সবুজ বনরেখায় অস্তরাগের ছটা। এই সময় পশ্চিম দিগন্তের রঙটাই কেমন যেন বদলে যায়। সেদিকে তাকিয়ে নিজের অজান্তেই নিজেকে

আমি নিজের মধ্যে হারিয়ে ফেলি। কত কথা যে মনে হয় এ সময়, তার হিসেব আমি নিজেই রাখতে পারি না।

এই জায়গাটা বড় নির্জন। আমার কাছ থেকে বেশ কিছুটা ব্যবধানে এক বৃদ্ধ বসে আছেন। আমি একবার তাকিয়ে দেখলাম। কেমন যেন আনমনা ও গভীর চিন্তামগ্ন মনে হল তাঁকে। চোখের দৃষ্টি উদাস। কী অত ভাবছেন উনি? নাকি প্রকৃতির রূপরস উপভোগ করছেন? তা বলে মনে হল না। আমি কিন্তু অন্যরকম ভাবি। কল্পনাকে আশ্রয় করে কত কী-ই তো ভাবি আমি। কখনও ভাবি, ত্রেতাযুগে যখন শ্রীরামচন্দ্র সরযূ নদীর তীরে দাঁড়িয়ে বিদায়ী সূর্যকে অভিনন্দন জানাতেন, তখনও কি এখানে এই সূর্যকিরণ ঠিক এইভাবেই এসে পড়ত? কখনও ভাবি...।

একটা কোকিল কেমন কুহু কুহু করে ডেকে উঠল। ওর ওই কুহুরবে শুধুই কি বসন্তের মধুর সম্ভাষণ? না কি বিরহে কাতর হয়ে অমন করে ডাকল ও? কুহু কুহু মানে কোথায় কোথায়? কোথায় কাকে খুঁজে বেড়ায় ও? কে বলতে পারে তা?

আর এক পাখি ডাকে, 'বউ কথা কও।' অন্য এক পাখি, 'পিউ কাঁহা।' ডেকে ডেকে ফিরে যায় সে আর এক পাখি, 'চোখ গেল—চোখ গেল—চোখ গেল।'

কত—কত পাখি। কী সুন্দর পরিবেশ এখানকার।

আবার বাস্তবে ফিরে এলাম। তাকিয়ে দেখলাম বৃদ্ধকে। এই সুন্দরের জগতে উনিও অসুন্দর নন। তবু কোথাও যেন একটু ঘাটতি আছে। মনে হয় বড় নিঃসঙ্গ উনি এবং বেদনাময়।

একসময় আমি ওঁর দিকে একটু কাছ ঘেঁষে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'কী এত ভাবছেন?'

বৃদ্ধ তাকিয়ে দেখলেন আমাকে।

আমি আবারও বললাম, 'আপনি সব সময়ই বড় উদাসীন থাকেন। আপনার মনে আনন্দের লেশমাত্রও আছে বলে মনে হয় না। জীবনের হিসেব নিকেশ করতে গিয়ে আপনি কি সত্যিই খুব ক্লান্ত?'

গঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে তখন বয়ে চলেছে কুন্তী থেকে আসা খড় বোঝাই বড় বড় কয়েকটা নৌকো। ওপারের দৃশ্যটা তাই একটু চোখের আড়াল হয়ে গেল।

আমার কথা শুনে ম্লান হাসলেন বৃদ্ধ। বললেন, 'আমি নিরানন্দময়। বেঁচে থেকেও মৃতপ্রায় আমি। অর্থাৎ জীবন্মৃত। দুঃখে দুঃখে কেটে গেল সারাটা জীবন। বাকি আছে শুধু শেষ কটা দিন। আমি এখন শেষের সেদিনের প্রতীক্ষাতেই আছি।'

আমি বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। জীবন যে কীরকম তা বুঝে ওঠার বয়স এখনও হয়নি আমার। শুধু ভাবি, দুঃখই কি জীবনের সব? মুখের মধুরিমা এ জীবনে কোথাও কি নেই? জীবনের অন্তিমলগ্নে এসেও কি বলবে না কেউ—'এ জীবন বিষময় নয়, অনেক গরলেও এখানে অমৃত আছে।'

তাই একসময় বৃদ্ধকে বললাম, 'কীসের এত দুঃখ আপনার? এই সুন্দর ভুবনে সুখের পরশ কি কখনও পাননি? স্মৃতিচারণ করে দেখুনই না মনের মণিকোঠায় সুখের পাখিরা কখনও এসে বাসা বেঁধেছিল কি না?'

বৃদ্ধ বললেন, 'সুখ? দুঃখের পাহাড় এসে আমার সুখের স্বর্গকে কবেই তো চাপা দিয়েছে। শুনবে তুমি আমার কথা?'

'বলুন না শুনি।'

'কী আর বলব ভাই। দুঃখের কথা, দৈন্যের কথা, কাউকে শোনাতে নেই যদিও, তবু বলি। বললে হয়তো খানিকটা হালকা হতে পারব সাময়িকভাবে। তবে একটা কথা, জীবনের দিন আমার শেষ হয়ে আসছে। আমায় কোনও সান্ত্বনার বাণী শুনিও না বা সমবেদনাও জানিও না।'

'কথা দিলাম।'

বৃদ্ধ বললেন, 'বর্ধমান জেলার এক অখ্যাত গ্রামে আমার জন্ম। জন্মের বছর দুই পরেই মাকে হারাই। তারও বছরখানেক পরে বাবাকে। অর্থাৎ পৃথিবীতে এসেও নিজের মা-বাবাকে চিনলাম না। অকূলেই ভেসে গেলাম। আমাদের গ্রামের পাঠশালার হেডমাস্টার ছিলেন বিপিনবাবু। তিনি ছিলেন অপুত্রক। আমাকে গ্রহণ করলেন এবং পুত্রের মতো পালন করতে লাগলেন। তাঁরই দয়ায় বড় হলাম। মানুষ হলাম। সংসারী হলাম। আমার একজন বংশধর এল, তার নাম রাখলাম নরেন। ছেলেটা বড় হল কিন্তু এত দুরন্ত হল যে তাকে বাগে রাখতে পারলাম না কিছুতেই। লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলবার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম, শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হতে হল। আমার সব আশায় জল ঢালল সে।'

এই পর্যন্ত বলে বৃদ্ধ চুপ করলেন।

কতকগুলো ছোট ছোট জেলে ডিঙি তখন বেহুলা হয়ে কুন্তীতে আসছে।

বৃদ্ধ আবার শুরু করলেন, 'একদিন সকালে আমার বাড়ি পুলিশে ছেয়ে গেল। কী ব্যাপার! না, তারা খুঁজতে এসেছে আমার নরেনকে। সে নাকি গাঁয়ের পোস্টঅফিস জ্বালিয়ে দিয়েছে আর লুটপাট করেছে দামি দামি পার্সেল সহ অনেক টাকা। পুলিশ এল। নরেনকে পেল না। সে যে কোথায় উধাও হল কেউ জানতে পারল না তা। সেই সঙ্গে পাওয়া গেল না ওর তিন সঙ্গীকেও। সবাই উধাও হয়েছে। পুত্রশোক বড় শোক। ভেঙে পড়লাম তাই। ভেঙে গেল আমাদের অনেক স্বপ্ন ও সুখের সংসার। এর কিছুকাল পরে আমার স্ত্রী মারা গেলেন। দেশের জমিজমা ফেলে এখানে চলে এলাম আমি। কী করতেই বা থাকব সেখানে? একে একে সবাই যখন চলে গেল, তখন আমি আর মিছিমিছি দুঃখের বোঝাটা মাথায় নিয়ে বসে থাকি কেন? তাই বাকি জীবনটা এদেশ সেদেশ করে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু কই, মনের জ্বালা তো মিটল না? স্ত্রী গত হয়েছেন। ছেলেটা থেকেও নেই। কোথায় আছে, কীভাবে আছে, আদৌ বেঁচে আছে কি না কিছুই জানি না তা। ওর জন্য মাঝে মধ্যে বড় মন কেমন করে। তাই দুঃখ ও হতাশার জাল বুনেই কেটে গেল জীবনের দিনগুলো। বসে থাকি নদীর ধারে। ওই যে দেখছ নাওয়ের মাঝি। বসে বসে ওকেই দেখি। কেননা ওর মুখটা আমার সেই নরেনের মতো। এক এক সময় ভাবি ও-ই আমার সেই পলাতক নরেন নয় তো? মনে হয় একবার ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করি—আচ্ছা তুমি কি ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়েছিলে? আবার ভাবি, নাঃ থাক। যদি ও বলে, না। তা হলে আমি কাকে দেখে সান্ত্বনা পাবো? তাই জিজ্ঞাসাও করি না। চেয়ে চেয়ে শুধু দেখেই যাই। রোজই দেখি, তবুও আশ মেটে না। সন্ধ্যে পর্যন্ত দেখি। যদি ও ততক্ষণ থাকে। তারপর অন্ধকার ঘনিয়ে এলে ঘরে ফিরে যাই।'

বৃদ্ধ চুপ করেন।

আমিও চুপচাপ বসে থাকি। একসময় নীরবতা ভেঙে বলি, 'এখানে আপনি কোথায় থাকেন?'

'কুন্তীর ওপারে রামনগরে।'

সেই মাঝি একসময় নেমে আসে নৌকো থেকে। ঝুঁকে পড়া বটের ডাল থেকে বন্ধনমুক্ত করে নৌকোটাকে। তারপর স্রোতের অনুকূলে তরতরিয়ে বেয়ে যায় কুন্তীর দিকে। দাঁড়ের ছপাৎ ছপাৎ শব্দ একসময় মিলিয়ে যায় দূরে বহুদূরে। মাঝি গান গায়। বাতাস ধরে রাখে তার গানের রেশটুকু। সুরের মাধুর্য তরঙ্গে তরঙ্গে দোল খেয়ে বার বার ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

সূর্য অস্ত গেছে কিছুক্ষণ আগেই। সন্ধ্যার ধূসর যবনিকা ধীরে ধীরে গ্রাস করছে প্রকৃতিকে। খেয়াঘাটের নির্জনতায় আর এখন থাকা নয়। এবার গৃহপানে ফেরা।

বৃদ্ধ বসেই আছেন।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। আর তো বসে থাকার মতো সময় আমার নেই। সংসারের সাত সহস্র কাজ যে তাদের নির্মম বাহু প্রসারিত করে রেখেছে আমার জন্য। কিন্তু এই বৃদ্ধ? উনি তো তিষ্য স্থবির। কোনও কাজেরই তাড়া নেই ওঁর। সবই অসমাপ্ত, অথবা শেষ হয়ে গেছে। এবার নতুন কোনও তীর্থে যাবার কথাই ভাবতে হচ্ছে বুঝি এই নির্জন খেয়াঘাটে বসে। কে জানে এই রমণীয় খেয়াঘাটেই হয়তো একদিন ভেসে আসবে তাঁর পরপারের খেয়া। তারই প্রতীক্ষায় বসে আছেন তিনি। আমার বসে থাকলে চলবে না। কেন না আমার যে এখনও অনেক কাজ বাকি।

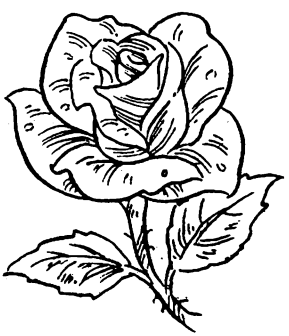

চন্দনবিলের জন্মকথা

বীরভূম জেলার বৃক্ষবিরল অনুর্বর প্রান্তরে এখনও একটি মজা বিল চোখে পড়ে। এই বিলটির নাম চন্দনবিল। ভবানন্দপুরের অদূরে একসময় এই বিলের জলে চাষবাস খুব ভালই হত। অবশ্য যেখানে যেখানে আবাদ করা যেত শুধু সেখানেই। বাদবাকি অনাবাদি জমিতে ঘাসও গজাত কিনা সন্দেহ।

একবার হল কি এই অঞ্চলে প্রচণ্ড খরা দেখা দিল। চৈত্র বৈশাখ পার হল, বৃষ্টি দূরের কথা, মেঘেরও দেখা নেই। জলের জন্য হাহাকার করতে লাগল মানুষ। নদীও এখান থেকে বহুদূরে। মানুষের তখন প্রাণ যায় যায় অবস্থা।

প্রজারা সবাই এসে ধরল ভবানন্দপুরের জমিদারকে। ভবানন্দপুরের জমিদার নরনারায়ণ চৌধুরী ছিলেন অত্যন্ত প্রজাবৎসল জমিদার। খাজনা যা আদায় করতেন তা নামমাত্র। তাও অনেক গরিব-দুঃখী লোকের খাজনা তিনি মকুবও করে দিতেন। প্রজারা বলল দারুণ খরায় দেশ গ্রাম সবই তো জ্বলে গেল কর্তা, এখন আমাদের বাঁচার উপায় কী? আপনি আমাদের ভগবান। আমাদের দেবতা। রক্ষা করুন আমাদের। একটা উপায় বলুন।

জমিদার বললেন—দ্যাখো, আমি নামেই নরনারায়ণ। আসলে আমি মানুষই। কথায় আছে ভগবানের মার দুনিয়ার বার। আমার সাধ্য কি তোমাদের রক্ষা করি। তোমরা জগদীশ্বরকে ডাকো। তিনিই তোমাদের রক্ষা করবেন।

প্রজাদের ভেতর থেকে একজন বলল—আমরা অনেক ভেবে একটা উপায় স্থির করেছি। আমাদের এই গ্রামকে সুজলা সুফলা করে তুলতে গেলে জলের একান্ত প্রয়োজন। তাই কোনওরকমে যদি ব্রাহ্মণী নদী পর্যন্ত একটি বিল খনন করিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আগামী মরশুমে আমাদের জলের অভাব থাকবে না। বর্ষায় নদীতে জলের বৃদ্ধি হলে সেই জল খানায় খন্দয় ওই বিলের সাহায্যে ঢুকিয়ে আমরা চাষের কাজে লাগাতে পারব। তাছাড়া নদীর চেয়েও একটু বেশি নাব্যতাযুক্ত বিল হলে বছরের কোনও সময়েই জলাভাব হবে না।

জমিদার নরনারায়ণ চৌধুরী বললেন—এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। তোমরা বিলের গতিপথ ঠিক করো।

অপর একজন প্রজা বলল—আমরা সব দেখে-শুনেই এসেছি কত্তা। এই বিল কাটতে গেলে আপনারই কিছু সুফলা জমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

নরনারায়ণবাবু হেসে বললেন—তাতে কী? আমার কিছু জমি নষ্ট হলে যদি তোমাদের অনেক জমি বাঁচে তাতে তো আমারই লাভ। আমার সব-কিছুই তোমাদের খাজনা নির্ভর।

জমিদারের অনুমোদন পেয়ে গ্রামের মানুষজন বিল খননের কাজ শুরু করল। দিনমানের অসহ্য তাপকে এড়াবার জন্য রাতের অন্ধকারকেই বেছে নিল তারা। সে কী অক্লান্ত পরিশ্রম। কোদাল গাঁইতি শাবল বেঁকে যেতে লাগল নীরস কঠিন পাথরের বুকে ঠোক্কর খেয়ে। গণশক্তি তবুও হার মানল না।

দেখতে দেখতে আষাঢ়ের জলভরা মেঘ অবিরাম বারিধারায় সকলের সকল ক্লেশ হরণ করে নিল। কাজ চলতে লাগল এবার দিনে-রাতেও। নরনারায়ণ চৌধুরীর একমাত্র সন্তান চন্দনকান্তি সকলের পুরোভাগে থেকে কাজের তদারকি করতে লাগল।

কাজ যখন শেষ পর্যায়ে পৌঁছল তখন এক শুভদিনে বিলের মুখ নদীর সঙ্গে যুক্ত করার নির্ঘণ্ট স্থির হল।

মাত্র কয়েক হাত খুঁড়লেই নদীর জল ঢুকে পড়বে বিলের ভেতর। কেননা নদী এখন বর্ষার জল পেয়ে কানায় কানায় ভরা। তা সেই পবিত্র দিনটি ঠিক হল দশহরার দিনই। স্থির হল পূজাপাঠ সাঙ্গ হলে একদল লোক মাটি কাটবে আর ভগীরথের মতো শঙ্খধ্বনি করে সেই জলকে নিয়ে যাবে গ্রামের ভেতর দিয়ে নরনারায়ণ চৌধুরীর পুত্র চন্দনকান্তিই।

পরিকল্পনামতো সবই হল। শুধু ভবানন্দপুর নয়, আশপাশের অনেক গ্রাম থেকেই লোক এল সেই শুভ অনুষ্ঠান দেখতে। শত শত শঙ্খ নিয়ে মেয়েরা বিলের দু'পাশে উঁচু মাটির বাঁধে দাঁড়িয়ে রইল।

গ্রামের প্রবীণ তিনকড়ি পাঠক মহাশয়ই পুজো-আর্চা করলেন। হোম-যাগ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন সবই হল। এমন সময় হঠাৎই দেখা দিল আকাশ জুড়ে কালো মেঘ। ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক ও গুরু গুরু বজ্রনাদের সঙ্গে নেমে এল প্রবল বর্ষণ। ওদিকে নদীতে জলেরও বৃদ্ধি হচ্ছে। সেই জলের চাপেই দেখা দিল সংযোগস্থলে বিরাট ফাটল। মাটি কাটার কোনও প্রয়োজনই হল না আর। একটু একটু করে ফাটল বেয়ে জলের ধারা নেমে আসতে লাগল।

মহা উল্লাসে শঙ্খধ্বনি করে উঠল চন্দনকান্তি। সঙ্গে সঙ্গে শত শঙ্খরবে মুখর হয়ে উঠল দশদিক। পরিকল্পনা ছিল শঙ্খধ্বনি করে ভরা নদীর জলকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বিলের ভেতর দিয়ে গ্রামের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত। কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল বিপর্যয়। ভরা নদীর প্রচণ্ড জলের চাপ ধরে রাখতে না পেরে সেই মাটি ধ্বসে পড়ল সহসাই। আর বন্যার আকারে হুড় হুড় করে ব্রাহ্মণীর জলস্রোত ঢুকে পড়ল বিলের ভেতর। সেই প্রবল প্রবাহে কোথায় ভেসে গেল চন্দনকান্তি, তাকে আর খুঁজেই পাওয়া গেল না। এত আনন্দের মাঝেও ভবানন্দপুরে শোকের ছায়া নেমে এল।

জমিদার নরনারায়ণ চৌধুরী বিধির বিধানকে মেনে নিলেও পুত্রহারা জননীর কান্নায় আকাশ বাতাস ভরে উঠল। চন্দনকান্তির স্মৃতিরক্ষায় ভবানন্দপুরের এই বিলের নাম হল চন্দনবিল। নদীর চেয়েও নাব্যতা থাকায় এই বিল জলপূর্ণ থাকত সব সময়ই। এখন সে জমিদারও নেই, জমিদারিও নেই, রক্ষণাবেক্ষণও নেই। তাই চন্দনবিলেরও অস্তিত্ব নেই। বিল মজে একটি ডাঙালে পরিণত হয়েছে এখন। তালপুকুরে যেমন ঘটি ডোবে না, চন্দনবিলেও তেমনই স্নান করা যায় না। যা কিছু সবই এখন ব্রাহ্মণীতেই।

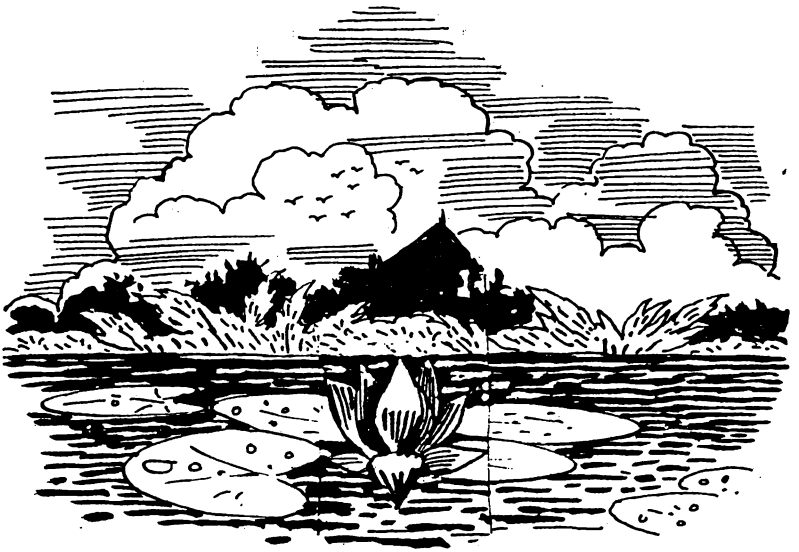

দেবীদহর কাহিনী

অনেকদিন আগে শক্তিগড়ের কাছে আমড়া গ্রামে হিরুদের বাড়ি একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম। হিরু খুব ভাল ছেলে। আমাদের নাড়ুগ্রামে ওর মামার বাড়ি। হিরুর বাবা একজন নামকরা গায়ক ছিলেন। তা একরাতে ওর বাবা দূরের কোনও এক গ্রাম থেকে গান গেয়ে ফিরছিলেন, এমন সময় জি.টি. রোডে এক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান তিনি। হিরু তখন খুব ছোট। তাই বাবার কথা মনেও নেই ওর। হিরুর এক পিসি আছেন। বিয়ের রাতেই তাঁর স্বামী সাধু হবেন বলে হিমালয়ের দিকে চলে যান। সেই যে যান আর ফেরেননি। তাই মা আর পিসিমাকে নিয়েই হিরুদের ছোট্ট সংসার।

সে যাই হোক, হিরুকে নিয়ে তো গল্প নয়। গল্প দেবীদহকে নিয়ে। হিরুদের গ্রামেই আছে দেবীদহ। মস্ত এক দীঘি। গ্রামের শেষে বনময় প্রান্তরে। ওখানকার লোকেরা মনে করেন এই দেবীদহ থেকেই নাকি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নীলপদ্ম তুলে অকালবোধন করেন। যদিও এই ভ্রান্ত ধারণার পিছনে কোনও যুক্তি নেই, তবুও অনেকের বিশ্বাস।

সময়টা তখন শরৎকাল। এক বিকেলে হিরুর সঙ্গে গেলাম বিখ্যাত সেই

দেবীদহ দেখতে। কী দারুণ সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ সেখানকার। দীঘির কাজল কালো জলে বড় বড় থালার মতো পদ্মপাতা। আর কত যে পদ্ম ফুটে আছে বা উঁকি দিচ্ছে দীঘির বুক থেকে তার যেন শেষ নেই। শরতের সোনাঝরা রোদও লুটিয়ে পড়েছে দীঘির বুকে।

হিরু বলল—এই দীঘিতে আজও নীলপদ্ম ফোটে।

আমি অবাক হয়ে বললাম—নীলপদ্ম কি সত্যিই হয়?

ও বলল—হয় বৈকি। নীল অপরাজিতা হয় আর নীলপদ্ম হয় না? নিশ্চয়ই হয়।

—তুই দেখেছিস কখনও নীলপদ্ম?

—না। তবে শুনেছি। আজ দীঘি তোলপাড় করে খুঁজে দেখব কোথাও সেই পদ্ম ফুটে আছে কিনা।

কিশোর মনের জেদ। ওর আমার দুজনেরই উৎসাহ। ও একটা তালগাছের ডিঙি জোগাড় করে এনে বলল—চাপ।

চাপ তো চাপ। আনন্দে উঠে বসলাম তাতে। একবার শুধু ভয়ে ভয়ে বললাম—দীঘিতে জল কত? উল্টে গেলে ডুবে যাব না তো? আমি কিন্তু সাঁতার জানি না।

হিরু বলল—না না, ভয় নেই। এ মজা দীঘি।

—তা কেমন করে হয়? এত জল টলটল করছে।

—বর্ষার জমা জল এসব। তলায় শুধু পাঁক আর কাদা। জানিস তো পাঁক থেকেই পঙ্কজের উৎপত্তি।

—জানি।

আমি নির্ভয়ে হিরুর সঙ্গে ডিঙিতে চাপলাম।

দীঘির কাজল কালো জলের ওপর দিয়ে তিরতির করে বয়ে চলল ডিঙিটা। ও যতই বলুক জল নেই, আমার ততই মনে হল অথৈ জল। তা ছাড়া তলায় যদি কাদা আর পাঁক থাকে, তা হলে ডিঙি ওল্টালে তাতেই গিঁথে যাব। এছাড়া পদ্মদীঘি মানেই তো বিষাক্ত সাপের আড়ত। শুনেছি পদ্মের মৃণালের সঙ্গেও সাপ জড়িয়ে থাকে।

তা সে যাই হোক, দেবীদহর বুকে ডিঙি বেয়ে একটু একটু করে এগিয়ে যেতে কী ভালই না লাগল। মাথার ওপর শরতের নীল আকাশ। দহের বুকে থরে থরে প্রস্ফুটিত পদ্ম। সাদা সাদা মেঘের দল আকাশময় ভেসে বেড়াচ্ছে।

আর দীঘির বুকে পদ্মের পাপড়ি খসে ভাসছে ছোট ছোট নৌকোর মতো। কিন্তু সবই তো আছে, নীলপদ্ম কই? অনেক চেষ্টা করেও আমরা নীলপদ্ম দেখতে পেলাম না।

দহের ওপারে ঘন কাশবন। বাতাসে দুলে যেন বারে বারে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল আমাদের। আমরা সেদিকেই এগিয়ে চললাম ডিঙি বেয়ে। হঠাৎ কোথা থেকে যেন এক ঝাঁক বুনো টিয়া ট্যাঁ ট্যাঁ করে উড়ে গেল আমাদের মাথার ওপর দিয়ে। আর সেইসময় কাকের তাড়া খেয়ে একটি টিয়ার ছানা আমার কোলে এসে পড়ল। যেই না পড়া হিরু অমনই পাখিটা নেবে বলে ঝুঁকে পড়ল আমার দিকে। ফলে যা হবার তাই হল। ডিঙি উল্টে দুজনেই দেবীদহে।

নেহাত পাড়ের কাছে এসে পড়েছিলাম তাই রক্ষে। কোনওরকমে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে কাদায় পাঁকে মাখামাখি হয়ে ডাঙায় উঠলাম। জামা-প্যান্ট ভিজে একশা। তাতে কী? পাখি ধরার আনন্দে মন তখন মেতে উঠেছে।

আমরা কাশবন পার হয়ে ওপারে সাধুর ডাঙায় উঠলাম। এক সাধুবাবা অনেকদিন আছেন সেখানে। আমাদের অবস্থা দেখে বললেন—একী! এত পাঁক কাদা। শিগগির আমার কুয়ো থেকে জল তুলে ধুয়ে ফ্যাল সব।

আমরা তাই করলাম।

সাধুবাবা আমাদের হাতে পাখি দেখে বললেন—বনের পাখিকে কখনও বন্দি করে রাখতে নেই রে। উড়িয়ে দে ওটাকে। ও তো উড়তে শিখেছে। ওই দ্যাখ ওর জন্য অন্য পাখিগুলো কেমন চক্রাকারে ঘুরছে আর ট্যাঁ ট্যাঁ করছে। দে উড়িয়ে দে।

পাখিটা পোষবার খুব সখ হয়েছিল। কিন্তু সাধুবাবার কথায় যুক্তি আছে। তাই না করলাম না। হিরুর হাতে পাখিটা ছিল। ও আমার সম্মতি নিয়ে উড়িয়ে দিল আকাশে। ঝাঁকের পাখি আবার ঝাঁকেই মিশে গেল।

এরপর সাধুবাবা ওঁর আশ্রমে বসিয়ে আমাদের চা করে খাওয়ালেন। আমাদের নীলপদ্মের খোঁজে দেবীদহর বুকে ডিঙাবিহারের কথা শুনে হাসলেন। বললেন—পাগল ছেলে কোথাকার। রামচন্দ্র যে নীলপদ্ম দিয়ে দেবীপূজা করেছিলেন, সে পদ্ম ছিল মানস সরোবরে। কেউ কেউ বলে স্বর্গের নন্দনকাননে। যেখানে ব্রহ্মকমল ফোটে সেখানকার দেবীদহে। তবে

এই দেবীদহেরও একটা কাহিনী আছে। দেবীপুরের এক জমিদার ছিলেন রামচন্দ্র রায়। সে কোন যুগের কথা তা জানি না। তিনি একবার স্বপ্নে দেবী দুর্গার নির্দেশ পান একশো আট নীলপদ্ম দিয়ে দুর্গাপূজা করার। স্বপ্নভঙ্গে তিনি দেশে দেশে ঘুরতে থাকেন। ঘুরতে ঘুরতে যখন এখানে আসেন তখনই আবার নির্দেশ পান, এই হল মর্তের দেবীদহ। এই মজা পুষ্করিণীতেই নীলপদ্ম পাওয়া যাবে।

জমিদার রামচন্দ্র রায় নীলপদ্মের আশায় ঠায় বসে থাকেন পুষ্করিণীর ধারে। তাঁকে ঘিরে থাকে অনেক লোকজন। মহালয়ার ভোরে তিনি স্বপ্ন পান, কোনও নয় বছরের বালিকাকে এই পুষ্করিণীর তীরে কুমারী পূজো করে এর জলে ফেলে দিলে তবেই পাওয়া যাবে নীলপদ্ম।

রামচন্দ্র রায় শিউরে উঠলেন। বললেন—এমন নৃশংস কাজ আমার দ্বারা কখনও সম্ভব নয়। একটু সংস্কারের বশে কার কন্যা প্রতিমাকে বিসর্জন দেবো এই জলে? তা ছাড়া এ কাজের জন্য কে-ই বা দেবে তার মেয়েকে? চুরি করে আনলেও পরে তা জানাজানি হবেই। অতএব মাকে আমি নীলপদ্ম নয়, এই দীঘির পদ্ম নিয়েই পূজা করব। তা সে যে পদ্মই হোক।

রামচন্দ্র রায় সস্ত্রীক এসেছিলেন। এসেছিল তাঁর একমাত্র কন্যা উমাও। সব শুনে উমা বলল—স্বপ্নাদেশ অমান্য কোরো না বাবা। আমাকেই তুমি কুমারী করে দেবীদহে বিসর্জন দাও। দেবীর পূজার নীলপদ্ম আমিই ফুটিয়ে দেবো।

রামচন্দ্র বললেন—না। আর আমার দুর্গাপুজোয় কাজ নেই। আমি এখনই আমার জমিদারিতে ফিরতে চাই।

উমা বলল—বেশ। তা হলে তুমি মা'কে নিয়ে সবাইকে নিয়ে ফিরেই যাও। আমি এই দেবীদহেই থেকে যাই। বলে কাউকে কিছু বুঝে ওঠবার অবকাশ না দিয়েই নয় বছরের উমা পাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল দেবীদহর জলে।

হইহই করে উঠল সকলে। দলে দলে লোক এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল উমাকে উদ্ধার করতে। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না তাকে। শত শত জনতার তোলপাড়ে সেই ছোট্ট পুষ্করিণী একটি বিরাট দহে পরিণত হল। যার নাম দেবীদহ। কালক্রমে সেটি এক বিরাট দীঘির চেহারা নিল। সে সব কবেকার কথা। এখন আর সে সব কাহিনী মনেও নেই কারও।

শোনা যায়, সে বছর রামচন্দ্র রায় যে দুর্গাপূজা করেছিলেন তাতে নাকি একটিই নীলপদ্ম পাওয়া গিয়েছিল। সেই নীলপদ্ম নিয়ে পুরোহিত সন্ধিপূজার সময় উমার নামেই সংকল্প করে দেবীর চরণে নিবেদন করেছিলেন। এরপর মাঝে মাঝে ঠিক দুর্গাপূজার মরশুমে ওই দেবীদহের বুকে একটি করে নীলপদ্ম ফুটে উঠতে দেখা যেত। তবে সেই পদ্ম কেউ তুলতে পারত না। কাছে গেলেই হয় ঝরে যেত, নয় ডুবে যেত। আজ এত বছর বাদে এ শুধুই বিস্মৃতপ্রায় যুগের একটি কাহিনী ছাড়া কিছুই নয়।

সাধুবাবার মুখে আমরা দেবীদহর কাহিনী শুনে সন্ধ্যের আগেই কাশবন পার হয়ে ঘরে ফিরলাম।

বাজডাঙার মাঠ

বর্ধমান জেলায় কারেলাঘাটের কাছে দামোদর নদের তীরে বাজডাঙার মাঠ নামে একটি মাঠ আছে। মাঠের অনেকটাই এখন নদীর গর্ভে তলিয়ে গেছে। আগে এই স্থানটির নাম ছিল ব্রাহ্মণডাঙা। পরে এর নাম হয় বাজডাঙা। ব্রাহ্মণডাঙা কি করে বাজডাঙা হল সেই গল্পই বলছি এবার।

ব্রাহ্মণডাঙার কাছাকাছি কোনও একটি গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে গোপাল নামে একটি ছেলে ছিল। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। কিন্তু জন্মের পর থেকেই সে ছিল অপ্রকৃতিস্থ। বদ্ধ উন্মাদও নয় আবার স্বাভাবিকও নয়। এই নিয়ে বাবা-মায়ের মনে দুঃখের আর অন্ত ছিল না।

চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলে। পরনে কখনও পোশাক রাখত, কখনও রাখত না। লোকের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত। কথা বলত কম। যা বলত তাও অসংলগ্ন। খিদে পেলে খাবার সময় আর রাত্রে ঘুমানোর সময় বাড়ি আসত। তাছাড়া সারাটা দিন ঘুরে বেড়াত বনে-বাদাড়ে, মাঠে-ঘাটে, নদীর চরে। কখনও নিজের মনে হাসত, কখনও কাঁদত। তবে

কেউ খ্যাপালে বা কোনও কারণে রেগে গেলে বিপর্যয় বাধিয়ে বসত। তখন আর সামলানো যেত না ওকে। হাতের কাছে যা পেত তাই ছুঁড়ে মারত সকলকে। ভাঙচুর করত।

এক একদিন কি খেয়াল হত। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে গেরস্থের গোয়ালে গোয়ালে ঢুকে বাছুরের দড়িগুলো খুলে সব দুধ খাইয়ে দিত। কখনও কারও বাড়ির পোষা পাখির খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিত পাখিগুলো। ময়রার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে খাবার চাইত। দিলে ভাল, না দিলে ভাল ভাল খাবারে ধুলো-ময়লা ছুঁড়ে খাবার নষ্ট করে দিয়ে আসত। প্রতিবেশীরা এইসব উপদ্রব কত আর সহ্য করবে? ফলে এমন মার মারত যে সে মার চোখে দেখা যেত না। গোপালের বাবা-মা ছেলের দুর্দশা দেখে নীরবে চোখের জল মুছত।

এইভাবেই দিন যায়। অবহেলায় অনাদরে গ্রামের অবুঝ মানুষের অকথ্য নির্যাতনে গোপালের অস্থিচর্মসার হল। হিতৈষী কেউ কেউ বলল—ছেলেটার কষ্ট দেখা যায় না। আর পাগলামিও তো দিন দিন বেড়েই চলেছে। তুমি এক কাজ করো না, ওকে তেরোলের বালা পরিয়ে নিয়ে এসো। শুনেছি ওই বালা পরলে বদ্ধ পাগলও ভাল হয়। এ তো সে রকম পাগল নয়, টনটনে জ্ঞান আছে। সেইসঙ্গে পাগলামিও আছে। যদি ভাল হয়, দেখোই না চেষ্টা করে। গোপালের বাবা-মায়ের মনে ধরল কথাটা। একদিন গ্রামের কয়েকজনকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল তেরোলের বালা পরাতে। কিন্তু যাওয়া আসাই সার হল। তেরোলের বালাতেও কিছুই হল না ওর। দু'একদিন পরে থাকার পর সে বালা নিজেই খুলে ফেলে দিল গোপাল। তারপর আবার যা-কে তাই। বরং উল্টো এক উপসর্গ দেখা দিল ওর মধ্যে। দিনরাত শুধু 'অ্যাঁ-অ্যাঁ করে কেঁদে বেড়াতে লাগল গ্রামময়।

সহ্যেরও একটা সীমা আছে। অতিষ্ঠ হয়ে উঠল গ্রামবাসীরা। দিনরাত ওই মড়াকান্না কে কতক্ষণ সহ্য করবে? সবাই ওকে দেখামাত্র দূর দূর করতে লাগল। ওর এখন এমন অবস্থা যে মারধোর করলে বা গায়ে জল ঢাললেও যেতে চায় না। বরং কান্না আরও বাড়ায়।

কেউ কেউ বলল—এই পাপের জ্বালায় অতিষ্ঠ হওয়ার থেকে হয় বিষ খাইয়ে মেরে ফেলো, নয়তো ছেড়ে দিয়ে এসো দূরে কোথাও।

কিন্তু মুখে বললেও মেরে ফেলার ঝুঁকি তো নেওয়া যায় না। আবার দূরে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসার ব্যাপারেও আপত্তি অনেকেরই। কাজেই গোপাল যেমন কেঁদে বেড়ায় তেমনই কেঁদে বেড়াতে লাগল। প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের সাত তারিখে ব্রাহ্মণডাঙায় ঘটা করে কালীপুজো হত। অনেক পাঁঠা পড়ত। যাগযজ্ঞ হত। ছোটখাটো মেলাও বসে যেত একটা। দূর দূর গ্রাম থেকে লোক-আসত মেলা দেখতে, পুজো দিতে। তা সে বছরটা ছিল ভয়ঙ্কর খরার বছর। পুকুরে জল নেই, কুয়োয় জল নেই। নদীও জলহীন। নদীর বালি খুঁড়ে সেই জল বার করে খেতে লাগল লোকে। এরই মধ্যে কালীপুজোর দিন এসে গেল।

চারদিকে জলের হাহাকার। রোদের উত্তাপে মানুষ ঘর থেকে বেরোতে পারছে না। তবু বছরে একটিমাত্র দিন। মেলা জমাতে দোকানপত্তর বসেনি। তাতে কী? মায়ের পুজো হবেই। যদি মা করুণাধারায় ভরিয়ে দেন, সেই আশায় উৎসবমুখর হয়ে উঠল ব্রাহ্মণডাঙা।

সকাল থেকেই চালা বাঁধা, বেদী স্থাপন ইত্যাদি কাজে মেতে উঠল সকলে। চড়া রোদ্দুর ও খরার দহন উপেক্ষা করেও চলতে লাগল কালীপুজোর প্রস্তুতি। আর সেই সঙ্গে শুরু হল গোপালের পাগলামি ও দৌরাত্ম্যের উপদ্রব। মাঝে মাঝে মড়াকান্না। কখনও সে বাঁশের খুঁটি নাড়িয়ে দেয়, কখনও ঢিল ছোঁড়ে। শেষমেশ সে যখন দেবীর জন্য নির্মিত মাটির বেদিকার ওপর উঠে নাচতে শুরু করল, তখন আর রাগ সামলানো গেল না। ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা তাকে প্রচণ্ড মারধোর করে মাঠের প্রান্তেই একটি খেজুরগাছের সঙ্গে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে রাখল দড়ি দিয়ে।

সারাটা দিন দুপুর কাটল এইভাবে। গোপালের মা-বাবাও আর ছেলের খোঁজে এল না। সেই কোন সকালে দুটো পান্তা খেয়ে গেছে ছেলেটা, তারপর সারাদিনে আর পান্তা নেই। এ ছেলে ঘরে আটকে রাখারও নয়। অথচ ছাড়লেই বিপত্তি। তা পাঁচজনে যা ভাল বোঝে তাই করুক।

দুপুরের পর হঠাৎই আকাশ জুড়ে দেখা দিল ঘন কালো মেঘ। সে কী ভয়ঙ্কর মেঘের মূর্তি। দিনের আলো নিমেষে ম্লান হয়ে গেল। দাবদাহর সেই জ্বালা দূর হয়ে শীতল বাতাস বইতে লাগল। আনন্দে ভরে উঠল সকলের মনপ্রাণ। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎই ভয়ঙ্করনাদে এক

বজ্রপতন হল ব্রাহ্মণডাঙার মাঠে। চারদিক ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল। গেল গেল রব উঠল চারদিক থেকে। আর্তনাদ কোলাহল ও কান্নার শব্দে মুখর হয়ে উঠল চারদিক। সেইসঙ্গে শুরু হল প্রবল বর্ষণ। গ্রামের লোক দুর্যোগ উপেক্ষা করেও ব্রাহ্মণডাঙার মাঠে গেল অবস্থাটা কী দেখতে। গিয়ে দেখল মৃত অর্ধমৃত বেশ কয়েকজন লুটিয়ে আছে মাঠের বুকে। মৃত পাঁচজনের দেহ ঝলসে গেছে বজ্রাঘাতে। সাতজন ধুঁকছে! আর জনা দশ-বারো অচৈতন্য হয়ে কাদায় মাখামাখি।

গোপালের বাবা-মা ছুটে গেল গোপালকে মুক্ত করতে। যে খেজুরগাছের সঙ্গে গোপাল বাঁধা ছিল, সেই খেজুরগাছের মাথাটা উড়ে গেছে। আর গোপাল? সে কোনওরকমে প্রাণে বাঁচলেও সংজ্ঞাহীন। ওর মা-বাবা কয়েকজনের সঙ্গে ওকে পাঁজাকোলা করে ঘরে নিয়ে এল। সে রাতে কোনওরকমে মায়ের পুজো হলেও শেষ রাতে পাঁচটি চিতা জ্বলতে লাগল নদীর ধারে।

কালরাত্রির প্রভাব হল। অচৈতন্য গোপাল সকাল হতেই চোখ মেলে তাকাল। অনেকদিন পরে সে হাসল শান্ত মধুর হাসি। বলল—আমার বড্ড খিদে পেয়েছে মা।

গোপালের মা-বাবা অবাক হয়ে গেল। এ তো সেই উন্মাদের কথা নয়। এ যে সুস্থ স্বাভাবিকের কণ্ঠস্বর। ওদের মনে আনন্দ আর ধরে না। কতদিন পরে গোপাল মা বলে ডেকেছে।

ব্রাহ্মণডাঙার মাঠে বজ্রপাতের কারণে পাঁচজনের জীবনান্ত হলেও বাজের প্রভাবে গোপালের উন্মাদনা দূর হয়ে সে স্বাভাবিক হয়ে গেল। এই আশ্চর্য ঘটনায় চমকিত হল সকলেই। সেই থেকেই ব্রাহ্মণডাঙার নাম হয়ে গেল বাজডাঙা। ওদিককার লোকেরা এখনও ওটাকে বাজডাঙার মাঠই বলে।

—০—

জবানবন্দি

আমাদের মধ্যে এখনও এক একজন সৎ সজ্জন এমনও মানুষ আছেন, যাঁকে দেখলেই শ্রদ্ধায় মাথাটা আপনিই নত হয়ে আসে। গিরিজাশংকরবাবুও ঠিক এমনই একজন মানুষ। আদর্শবাদী, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। এই মানুষটিকে শ্রদ্ধা করেন সবাই। এলাকারই একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন তিনি। বছর পাঁচেক হল অবসর নিয়েছেন। এ হেন মানুষ একদিন সকালে দীপ্ত ভঙ্গিতে থানায় এসে বললেন—আমাকে অ্যারেস্ট করুন।

থানার ও.সি. তথাগত বটব্যাল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম জানিয়ে বললেন—বসুন মাস্টারমশাই। দাঁড়িয়ে কেন?

গিরিজাশংকর বললেন—আমি বসবার জন্য তো আসিনি। আমাকে অ্যারেস্ট করুন।

ও.সি. বললেন—কী যে বলেন। আপনাকে অ্যারেস্ট করার আগে আমি

যেন চাকরি থেকে বরখাস্ত হই। বলেই একজন লোককে ডেকে বললেন, হাঁ করে দেখছিস কী? মাস্টারমশাইয়ের জন্য চা-বিস্কুট নিয়ে আয়। আমারও নিয়ে আসিস।

গিরিজাশংকর বললেন—ওসবের কোনও প্রয়োজন নেই। একজন খুনি আসামীর সঙ্গে আপনারা যেমন ব্যবহার করেন, আমার সঙ্গেও ঠিক সেইরকম ব্যবহার করুন। এইমাত্র আমি আমার একমাত্র সন্তানকে হত্যা করে আসছি। লকাপে ঢোকান আমাকে।

ও.সি. চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। আবার ধপাস করে বসে পড়লেন। সবিস্ময়ে বললেন—এ আপনি কী বলছেন?

গিরিজাশংকরের কথা শুনে থানার অন্য অফিসার এবং কনস্টেবলরাও ছুটে এসেছে সেখানে। তাঁরা সবাই ধরাধরি করে গিরিজাশংকরকে একটি চেয়ারে বসালেন।

একজন ইন্‌সপেক্টর বললেন—এও কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে?

—বলছি তো, আমার একমাত্র সন্তানকে আমি নিজের হাতে খুন করেছি।

ততক্ষণে চা এসে গেছে।

সকলের অনেক অনুরোধে চায়ে চুমুক দিলেন গিরিজাশংকর।

ও. সি. বললেন—ব্যাপারটা ঠিক কী হয়েছে আমাকে একটু খুলে বলুন তো?

—কী আর বলব বলুন? আদর্শহীন, মনুষ্যত্বহীন, সমাজের সন্ত্রাস ওই ছেলেকে তো আপনারা সকলেই চেনেন। আমার জীবনের দুষ্টগ্রহ ও। হেন কোনও কুকর্ম নেই যে ও করে বেড়ায় না। কাল ও এমনই কিছু একটা খারাপ কাজ করে এসেছে যে, তারপরই মনে হল একে আর বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখা ঠিক নয়। তাই নিজের পাপ নিজেই শেষ করে দিলাম, ওর ডেডবডি এখনও আমার ঘরে পড়ে আছে। যান, গিয়ে যা ব্যবস্থা করবার করুন।

ও. সি.-র নির্দেশে থানার অন্যান্য অফিসাররা গিয়ে সবকিছু দেখেশুনে মৃতদেহ পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠিয়ে আবার থানায় ফিরে এলেন।

ও. সি. গিরিজাশংকরকে বললেন—এখন আপনি বাড়ি যান মাস্টারমশাই। আইনের চোখে তা অপরাধ হলেও উপযুক্ত কাজই করেছেন আপনি। শুধু একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে। নিজের একমাত্র সন্তানকে হত্যা করেও আপনি এমন নির্বিকার আছেন কী করে? আর আপনার মতো মহাত্মার ঘরে এমন ছেলে কী করে জন্মায়?

গিরিজাশংকর বললেন—আমি নির্বিকার আছি এই কারণে যে এতদিনে আমার পাপের বোঝাটা হাল্কা হল। কেউ কখনও আমার ছেলের কৃতকার্যের নিন্দা আমাকে বা আমার স্ত্রীকে শোনাতে আসবে না। আর শেষ কথাটির উত্তর? ও আমার ছেলেই নয়। আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে ধুলোগোড়ের এক গ্রাম থেকে বাপ-মা মরা ওই ছেলেটিকে নিয়ে এসে আমরা মানুষ করেছিলাম। কাজেই ও আমার ছেলেরই মতো কিন্তু ছেলে নয়। আমরা নিঃসন্তান। ওর মৃত্যুতে আমার স্ত্রী অবশ্য ভেঙে পড়েছে খুব। আমি নির্বিকার।

ও. সি. বললেন—ঠিক আছে। আমরা আপনার জবানবন্দি লিখে রাখছি। পরে বাড়ি গিয়ে সই করিয়ে আনব। যেহেতু আপনি নিজেই এসেছেন, তাই আপনাকে অ্যারেস্ট করার কোনও প্রয়োজন হবে না। আদালতের ডাক পেলে আপনি আমাদের সঙ্গে যাবেন।

গিরিজাশংকর বললেন—বেশ যাবো। তবে একটা কথা, আমাকে কোনওভাবে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন না কিন্তু।

গিরিজাশংকর বিদায় নিলে ও. সি. তথাগত বটব্যাল অনেকক্ষণ একভাবে তাঁর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এই হত্যাকাণ্ডের মামলার বিচার যেদিন শুরু হল, আদালতে সেদিন সে কী ভিড়।

পুলিশ রিপোর্ট দেখে এবং গিরিজাশংকরের জবানবন্দি পড়ে বিচারক গিরিজাশংকরকে বললেন—মাস্টারমশাই। আপনি কি সত্যই আপনার ছেলেকে খুন করেছেন?

—হ্যাঁ। এমন কি আমি লিখিত স্টেটমেন্টও দিয়েছি।

—কিন্তু পুলিশ রিপোর্ট তো অন্যরকম বলছে। তাঁরা বলছেন আপনি খুনের দায় নিজের ঘাড়ে নিলেও এই খুন আপনার দ্বারা হয়নি। নিশ্চয়ই আপনি কাউকে আড়াল করবার জন্য এই বিবৃতি দিয়েছেন।

গিরিজাশংকর বললেন—না ধর্মাবতার, এখানকার পুলিশ প্রশাসন আমার প্রতি এতই শ্রদ্ধাশীল যে তাঁরা চান না আমি জেলে যাই বা আমার ফাঁসি হোক। খুন আমিই করেছি।

এমন সময় অল্পবয়সী এক যুবক এগিয়ে এসে বলল—উনি মিথ্যে কথা বলছেন হুজুর। ওঁর ছেলেকে খুন আমি করেছি। খুন করে পালাবার সময় উনি আমাকে দেখতে পান। আমার হাত থেকে রক্তমাখা ছোরাটা নিয়ে

ছেলের বুকের ওপর রেখে বলেন, 'পালা, পালা। শীগগির পালা। পালিয়ে বাঁচ। এদিকটা আমি সামলে নেবো।' ওঁর কথামতো আমি পালিয়ে গিয়ে আমাদের দেশের বাড়িতে থাকি। এখন বিবেকের চাবুক খেয়ে এখানে এসে আমার অপরাধ স্বীকার করছি। উনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। ওঁকে মুক্তি দিন।

বিচারক জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম?

—কৌশিক মিত্র। আমি ওঁরই স্কুলের ছাত্র ছিলাম।

গিরিজাশংকর বললেন—হুজুর, ওর কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না। আমাকে বাঁচানোর জন্য অন্ধ আবেগে এই মিথ্যা বলছে ও। এই ছেলেটির সঙ্গে আমার ছেলের কোনও সম্পর্কই ছিল না। তা হলে শুধু শুধু ও তাকে খুন করতে যাবে কেন? অত্যন্ত ভাল ছেলে ও। ওকে সবাই জানে। ও একাজ করতে পারে না।

এমন সময় আর এক যুবক এগিয়ে এসে বলল—হুজুর বিশ্বাস করুন, এঁদের দুজনের একজনও খুনি নয়। সেদিন জুয়ার আসরে আমরা অনেক টাকা কামাই করি। মাস্টারমশাইয়ের ছেলের সঙ্গে তারই হিস্যা নিয়ে গোলমাল বাধিয়ে নেশার ঘোরে আমিই ওকে খুন করি। কাজেই শাস্তি আমার প্রাপ্য।

যুবকের কথা শেষ হতেই গলায় রুমাল বাঁধা অবস্থায় পান চিবোতে চিবোতে উঠে দাঁড়াল এলাকার আর এক যুবক কুখ্যাত রাজু গুণ্ডা। বলল—ভাল রে ভাল। খুন করলাম আমি আর দায় ঘাড়ে নিতে এগিয়ে এল তিন তিনজন। হুজুর ধর্মাবতার। আপনি তো আমাকে চেনেন। এই আদালত আমার ঘর-বাড়ি আর শ্বশুরবাড়ি হচ্ছে জেলখানা। মাস্টারমশাইয়ের ছেলেকে খুন আমি করেছি। কেননা, ও আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। আমিও তাই ওকে খুন করে চরম বদলা নিয়েছি। শাস্তি যা দেবার তা আপনি আমাকেই দিন। আমার অপরাধের জন্য কোনও নির্দোষ ব্যক্তি যেন শাস্তি না পায়। তা হলে কিন্তু ন্যায়বিচারের মান ক্ষুণ্ণ হবে।

বিচারক কলমটি হাতে নিয়ে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে রইলেন। তিনি নিজেই ভেবে পেলেন না, কাকে তিনি শাস্তি দেবেন। চারজনের মধ্যে আসল খুনি কে?

ওদিকে দর্শকের আসনে বসে ও. সি. তথাগত বটব্যাল আপন মনেই মুচকি মুচকি হাসছেন।

ঝড়ের রাতে

বিকেলের পর থেকেই আকাশ কালো করে মেঘ জমেছিল। সন্ধ্যের পরে তা ভয়ংকর রূপ ধারণ করল। প্রথমে দু-একবার গুরুগম্ভীর মেঘধ্বনির পর হঠাৎই শুরু হল ঝড়ের তাণ্ডব। এক লহমায় সব যেন শেষ করে দিয়ে গেল। তার ওপরে শুরু হল প্রবল বর্ষণ।

ঝড়ের দাপটে গাছপালা উল্টে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে নিষ্প্রদীপ হয়ে গেল চারদিক। রতন বাগেদের এটাই হল কাজ-কারবারের উপযুক্ত সময়। দুর্যোগেই ওদের সুযোগ। তাই রাতের অন্ধকারে ঝড়-বাদল উপেক্ষা করেই এদিক সেদিক করে এগিয়ে চলল। প্লাস্টিক বর্ষাতি একটা সঙ্গে নিয়েছে। বৃষ্টির হাত থেকে যতক্ষণ নিজেকে বাঁচানো যায়, ততক্ষণই লাভ।

পথ একেবারেই জনহীন। ঝড়ের প্রকোপ কমেছে। কিন্তু বৃষ্টি সমানে চলেছে। পথের ধারে কাক শালিখ ও চড়ুইও মরে পড়ে আছে দু-একটা। অলিতে গলিতে জল। এরই মধ্যে মাধব ঘোষ লেনের কাছে একটি বাড়ির

সামনে এসে দাঁড়াল রতন। বাড়িটা গলির একেবারে শেষপ্রান্তে। একজন বয়স্ক মহিলা এ বাড়ির দোতলার একটি ঘরে থাকেন। ওঁর এক দূরসম্পর্কের আত্মীয়র ছেলে মহিলার দেখাশোনা করে। ছেলেটি অত্যন্ত বদ। রতন তাকেও চেনে। কেন-না ও হল সন্ধান চোর। কাজেই অনেককেই চিনে রাখতে হয়! কোন্ বাড়িতে গেরস্থ কম, কোন্ বাড়ির গেরস্থ বিত্তবান, কোন্ বাড়িতে কুকুর আছে, সবই ওর জানা। ছেলেটি অত্যন্ত বদমেজাজি এবং পাকা জুয়াড়ি। জুয়ার আড্ডা থেকে রেসের মাঠ, সর্বত্রই ওর অবাধ গতিবিধি। অনেক অনুসন্ধানের পর রতন জেনেছে, মহিলার ঘরে সিন্দুক ভরতি টাকা, গয়না অনেক কিছুই নাকি আছে। অতএব এই দাঁওটা মারতে গেলে আজকের রাতটাই উপযুক্ত রাত। যদিও কাজটা খুব কঠিন, তবুও কাজটা উদ্ধার হলে আখেরে লাভ বই লোকসান নেই।

বাড়ির সামনে এসে একবার একটু থমকে দাঁড়িয়ে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল রতন। চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করার মতো খেঁকিগুলোও নিরাপদ আশ্রয়ে গা ঢাকা দিয়েছে। নাইলনের ফিতে বাঁধা আংটাটা ছুঁড়ে বারান্দায় রেলিং-এ আটকে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ওপরে উঠে গেল সে। এই ঝড়ের রাতে দরজা জানালা দুটোই বন্ধ থাকবার কথা। সেক্ষেত্রে দরজায় নক ওকে করতেই হবে। মহিলা যে একেবারেই চলচ্ছক্তিহীন তা নয়। মাঝে মাঝে রিকশায় চেপে গঙ্গায় স্নান করতেও যান। তাই উঠে এসে দরজা খুলে দেবার মতো শক্তি ওঁর আছে। দরজা খুললেই মুখটাকে চেপে ধরবে ওঁর। পরে পেটের কাছে ছুরি ধরে সর্বস্ব অপহরণ করে বিদায় নেবে।

কিন্তু এ কী! ভাগ্য প্রসন্ন হলে যা হয় তাই হল। বারান্দায় উঠেই দেখল জানালা খোলা। ঘরের মধ্যে একটা চিমনি লণ্ঠন জ্বলছে। তারই আলোয় দেখা যাচ্ছে সেই মহিলাকে এবং তার দেখাশোনা করত যে ছেলেটি, তাকে। ছেলেটির বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে।

ছেলেটি কঠিন গলায় বলছে—দ্যাখো পিসি, দু-দিন ছাড়াই তোমার শরীর যেভাবে ভেঙে পড়ছে, তাতে আমি আর তোমার ওপর ভরসা রাখতে পারছি না। এখনও যদি তুমি এই বাড়ি আমার নামে লিখে না দাও, তাহলে কিন্তু তোমার কপালে অপঘাত মরণ আছে। কাল আমার পঁচিশ হাজার টাকা দরকার। ওই টাকা আজ রাতেই আমার চাই। সিন্দুকের চাবি তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বলো?

মহিলা বললেন—তুমি যখন প্রথম এখানে এসেছিলে, তখন আমি বুকে অনেক বল পেয়েছিলাম। যেহেতু আমার কোনো ছেলেমেয়ে নেই, তাই ঠিক করেছিলাম এমন একটা উইল করে দিয়ে যাব, যাতে আমার মৃত্যুর পর আমার বিষয়-সম্পত্তির যা কিছু সব তুমিই পাবে। কিন্তু তোমার যা ভাবগতিক আমি দেখছি, তাতে আমার মতের পরিবর্তন আমি করেছি। কেন-না এসব তুমি দুদিনে জুয়া খেলে উড়িয়ে দেবে। তাই আমি ঠিক করেছি, আমার সবকিছু যে সবচেয়ে বেশি দেখাশোনা করে সেই হারুর মাকেই দিয়ে যাব। আমি তোমাকে ছ-মাস আগেই বলেছি এখান থেকে বিদেয় হতে। কিন্তু তুমি যাওনি। কেন তুমি আমার বাড়িতে থেকে অন্নধ্বংস করছ? বেরোও, বেরিয়ে যাও। তুমি কী করে আশা করলে যে এই বাড়ি আমি তোমার নামে লিখে দেব? সকালে লিখে দিলে বিকেলে তুমি আমাকে বাড়ি থেকে তাড়াবে। তারপর আমার চোখের সামনে এ বাড়ি তুমি বেচে দেবে অন্য লোককে। জেনে রাখো, এখনও আমি অথর্ব হইনি। তাই তোমার সাহায্যের কোনো প্রয়োজনই আমার হবে না। তুমি আমার আশ্রিত ছিলে। এখন নেই। শুধু জোর করে এ বাড়িতে আছো। কাল সকালের মধ্যে যদি বিদেয় না হও, তা হলে কালই আমি তোমার নামে থানায় গিয়ে নালিশ করব।

—তাহলে এ বাড়ি তুমি আমাকে লিখে দেবে না?

—না। কালই আমি উকিল ডাকিয়ে আমার সবকিছু হারুর মায়ের নামে উইল করে দেব। তুমি এখন বিদেয় হও।

ছেলেটি বলল—হারুর মাকে তুমি কোথায় পাবে পিসি? আজই সন্ধ্যেবেলায় ঝড়জলের সময় আমি তাকে কুয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছি। এমনভাবে ফেলেছি যাতে মনে হবে কুয়োয় জল তুলতে গিয়ে নিজেই পড়ে গিয়েছে ও। এবার তোমার পালা। তোমার মুখে বালিশ চাপা দিয়ে তোমাকে আমি দম বন্ধ করে মারব। তারপর এমনভাবে লেপ চাপা দেব যে সবাই ভাববে বৃষ্টি বাদলায় ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে লেপ চাপা দিয়ে নিজেই ঘুমের ঘোরে দম আটকে মরেছ তুমি। তাই বলি, উইল দলিল সবকিছু আমার সঙ্গে আছে তাতে শুধু কতগুলো জায়গায় একটা করে সই দাও, আর সিন্দুকের চাবিটা আমাকে দাও। আমি জানি এখনও লাখখানেক টাকা ওর ভিতরে আছে। তোমার সাবেককালের সেই পঞ্চাশ ভরি সোনার গয়নাগুলো

আছে। ভালোয় ভালোয় চাবিটা বার করে দাও। ওগুলো নিয়ে আমি কেটে পড়ি। নাহলে কিন্তু অপঘাতেই মরতে হবে তোমাকে।

মহিলা বললেন—মরি সেও ভালো। তবু তোমার হাতে আমি চাবির গোছা তুলে দেব না। তুমি খুনি। একটা খুন করেছ, না হয় আর একটা খুন করবে। আমাকে খুন করে তুমি পালাবেই আর সেটাই হবে তোমার সবচেয়ে বড়ো ভুল। পুলিশ তোমাকেই সন্দেহ করবে। এবং যেভাবেই হোক খুঁজে পেতে ঠিক ধরে আনবে তোমাকে। পার তুমিও পাবে না।

—তাহলে তুমি দেবে না?

—না।

ছেলেটি তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল মহিলার ওপর। একটা বালিশ নিয়ে তার মুখে এমনভাবে চেপে ধরল যে কিছুক্ষণ ছটফটানির পরই সব শেষ।

এই দৃশ্য দেখে রতন আর থাকতে পারল না। এক লাথিতে দরজা খুলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই ছেলেটির ওপর। ছেলে তো ঠিক নয়, যুবক। রীতিমতো শক্তিমান যুবক। তাকে ঘায়েল করতে একটু সময়ও লাগল। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর ছুরিটা বার করে তার পেটের মধ্যে গুঁজে দিতেই লুটিয়ে পড়ল সে।

এরপর রুমালে রক্ত মুছে রতন যখনই ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে যাবে, তখনই শুনতে পেল—দাঁড়াও।

ঘুরে তাকাল রতন।

মহিলা তখন বিছানার ওপর উঠে বসেছেন।

রতন সবিস্ময়ে বলল—আপনি বেঁচে আছেন?

—হ্যাঁ। ও তো নেশার ঘোরে ছিল তাই বুঝতে পারেনি। আমি মৃত্যু অবধারিত জেনে একটু ছটফট করে মরার ভান করে পড়েছিলাম। কিন্তু তুমি কে বাবা?

—আমি চোর। আমার নাম রতন বাগ।

—এখানে তুমি কীজন্য এসেছিলে?

—চুরি করতে এসেছিলাম মা।

—তাহলে কোনো কিছু না নিয়েই চলে যাচ্ছ যে?

—আমি আর কখনও চুরি করব না। এ কাজে আমার মন আর সায়

দিচ্ছে না। অসৎ পথের পথিক যে কতটা নীচে নামতে পারে, আজ তা স্বচক্ষেই দেখলাম। এখন থেকে আমি সৎভাবেই জীবনযাপন করব।

মহিলা উঠে এসে রতনের হাত ধরে বললেন—তুমি আমাকে মা বলে ডেকেছ। তাই তুমি যাতে সৎভাবে জীবন যাপন করতে পারো, সে ব্যাপারে আমিই তোমাকে সাহায্য করব। তুমি আমায় শত্রুমুক্ত করেছ। আমার জীবন রক্ষা করেছ।

রতন বলল—না মা। আপনার বুদ্ধির জোরে আপনি বেঁচেছেন। ও যখন আপনার মুখে বালিশ চেপে ধরেছিল তখন তো আমি রুখে দাঁড়াইনি। আমি নির্বাক দর্শক হয়ে দেখছিলাম। ওই সময়কালে আপনি তো সত্য সত্যই মারা যেতে পারতেন। আপনি মৃতের মতো স্থির হয়ে যাওয়ার পরই আমার চৈতন্যোদয় হল। যাক, এখন আমি থানায় গিয়ে আমার অপরাধের কথা স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করি।

মহিলা বললেন—তোমার ছুরিটা আমাকে দাও।

রতন ছুরিটা মহিলার হাতে দিলে উনি বললেন—শোনো, তুমি কিন্তু খুন করোনি। খুন আমি ওই শয়তান হারুর মাকে কুয়োয় ফেলে মেরেছে। তারপর আমাকেও হত্যা করে আমার সবকিছু নিয়ে পালাতে চেয়েছিল। তাই আত্মরক্ষার খাতিরে আমি ওকে খুন করেছি। তুমি শুধু ঝড়জলে কোথাও আটকা পড়ে এমন অসময়ে এই পথ দিয়ে বাড়ি ফিরতে গিয়ে গোলমাল শুনে বারান্দা টপকে এ ঘরে ঢুকেছ। পুলিশকে তুমি এই কথাই শুধু বলবে। তারপর আমার যা বক্তব্য তা আমি পুলিশকেই বলব। আর-একটা কথা, তুমি যেন একেবারেই ভুলে যেয়ো না আমাকে। মনে রেখো, আমায় তুমি মা বলে ডেকেছ।

রতন মহিলার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে সেই ফিতে ধরেই বারান্দা থেকে নেমে গেল। দুর্যোগ তখন অনেকটা কমে এসেছে।

—০—

দেবশিশু

ছেলে তো নয় যেন দেবশিশু। কেষ্ট মুদির দোকানের সামনে যে ফালি জায়গাটুকু আছে সেখানেই শুয়েছিল সে। নয়-দশ বছরের ছেলে। পরনে একটি ময়লা জামা ও হাফ প্যান্ট। কতকগুলো কুকুর ওর গা ঘেঁষে শুয়েছিল সারারাত। সকালে দোকান খুলতে এসেই চোখ কপালে উঠল কেষ্টদার। বলল, 'কে রে তুই? কাদের ছেলে? বাড়ি কোথায়? এখানে এভাবে শুয়ে আছিস কেন?'

ছেলেটি মিষ্টি হেসে বলল, 'এমনি শুয়েছিলাম।'

'বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিস বুঝি?'

ছেলেটি আবার হাসল। বলল, 'আমার বাড়িই নেই।'

'বাবা-মা নেই?'

ছেলেটি ঘাড় নাড়ল, 'কেউ নেই।'

'এখানে কী করে এলি?'

'ট্রেনে চেপে।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু আসছিস কোথা থেকে?'

আর কোনও উত্তর নেই। ছেলেটি ফিক ফিক করে হাসতে লাগল। ইতিমধ্যে ছেলেটিকে ঘিরে উৎসাহী অনেক লোকজন জড়ো হয়ে গেছে। ওকে দেখবার জন্য আমিও এলাম।

ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে আমার চোখের পাতা পড়ল না। যেমনি গায়ের রং তেমনি মুখশ্রী। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। আমি ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী নাম রে তোর?'

ছেলেটি বলল, 'আমার নাম সোনাই।'

'বাঃ। ভারী সুন্দর নাম। তোর এই সোনার মতো গায়ের রঙ দেখেই তোর বাবা-মা এমন না রেখেছেন তাই না?'

'বাবা-মাকে দেখিইনি আমি।'

'সে কী! তাহলে কে তোকে এত বড়টা করল?'

ছেলেটি সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'আমার খুব খিদে পেয়েছে। আমাকে কিছু খেতে দাও না গো।'

কেষ্টদা ততক্ষণে খান চারেক বিস্কুট ওকে দিয়েছে। ও বিস্কুটে কামড় দিয়ে বলল, 'শুধু বিস্কুটে কি পেট ভরে? আমাকে কেউ ডাল-রুটি খাওয়াও।'

আমি বললাম, 'তা হলে আমাদের বাড়িতে আয়। ডাল-রুটি খাওয়াবো।'

ছেলেটি একগাল হেসে আমাকে অনুসরণ করল। আমি ওকে বাড়িতে এনে মাকে বললাম, একটু রুটি হালুয়া যা হোক কিছু করে দিতে। মা-ও ছেলেটিকে দেখে দারুণ খুশি হলেন। আমি ছেলেটিকে মুখ-হাত ধুইয়ে ঘরে এনে বসালাম।

এদিকে আমার বাড়িতেও তখন পাড়ার বউ মেয়েদের ভিড়। ও বাড়ির সেজো বউদি খবর পেয়ে দেখতে এলেন ছেলেটিকে। অত্যন্ত স্নেহশীলা জননীর মতো ছেলেটিকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'কাদের বাছা রে তুই? কী নাম তোর?'

ছেলেটি তেমনি মিষ্টি হেলে বলল, 'একবার তো বলেছি আমার নাম সোনাই। আর কতবার বলব?'

'তোর কে আছে? বাড়ি কোথায়?'

'বলব না।'

আর একজন প্রতিবেশী মহিলা উমাদি ছেলেটির জন্য একটি ব্যবহৃত জামা ও প্যান্ট নিয়ে এসে পরিয়ে দিলেন। বললেন, 'তোর ওগুলো বড় বেশি ময়লা হয়ে গেছে। কেচে দিলে পরে পরবি। এখন এগুলো পর, কেমন?'

ছেলেটির মুখ প্রস্ফুটিত ফুলের মতো বিকশিত হয়ে উঠল। ততক্ষণে আমার মা হালুয়া ও পরোটা তৈরি করে খেতে দিয়েছেন ছেলেটিকে। এক কাপ চা-ও দিলেন।

ছেলেটি বলল, 'আমি চা খাই না। চা খেলে লিভার খারাপ হয়।'

ওর কথায় হাসলাম আমরা।

অন্যান্য বউ মেয়ে যারা ছিল সবাই বলল, 'তোর যা খেতে ভাল লাগে তাই খা তুই।'

ছেলেটি কোনওদিকে নজর না দিয়ে গোগ্রাসে হালুয়া পরোটা খেতে লাগল।

পাশের বাড়ির সীমা বলল, 'কী রে, আর দুটো পরোটা খাবি? মাসিমাকে বলব দিতে?'

ছেলেটি খেতে খেতেই বলল, 'তোমরা কি আমাকে রাক্ষস পেয়েছ? আর কত খাবো?'

ইতিমধ্যে ও বাড়ির সেজো বউ একবার বাড়ি থেকে ঘুরে এসে আমার হাত ধরে একটু আড়ালে ডেকে বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলব ঠাকুরপো?'

আমি বললাম, 'আপনি কী বলবেন আমি জানি।'

সেজো বউদির দু'চোখ জলে ভরে উঠল। কান্না ধরা গলায় বললেন, 'তুমি তো জানো, মা হওয়ার সাধ আমার কতদিনের। এ জীবনে আমি কখনও মা হতে পারব না। তা বলছিলাম কি তোমার এই দেবশিশুটি তুমি আমাকে ভিক্ষা দাও। আমি ওকে মানুষ করব। তোমার দাদারও এতে আপত্তি নেই।'

আমি বললাম, 'বেশ তো, এ অতি উত্তর প্রস্তাব। যেভাবেই হোক ছেলেটি এসে যখন পড়েছে আমাদের কাছে, তখন কাউকে না কাউকে তো এগিয়ে আসতেই হবে ওর জন্য। ওকে প্রতিপালন করার জন্য আপনার চেয়ে উপযুক্ত আর কে আছে বলুন? এখনই নিয়ে যান ওকে।'

আবেগের আতিশয্যে সেজো বউদি কী যে করবেন তা ঠিক করতে পারলেন না। এমন করতে লাগলেন যেন আমারই সন্তানকে আমি বরাবরের জন্য তুলে দিচ্ছি ওঁর হাতে।

সেজো বউদি সোনাইকে নিয়ে চলে গেলেন ওদের বাড়ি। আমিও নিশ্চিন্ত হলাম। অজ্ঞাতকুলশীল ছেলেটি এখানে এসে মায়ের মতো একজন মা'কে তো পেল।

সোনাইয়ের ব্যাপারে বিজ্ঞ লোকেরা সবাই বলল থানায় একটু জানিয়ে রাখতে। কিন্তু আমরা অনেকেই একমত হয়ে বললাম, 'দরকার নেই ওসবে। ছেলেটিকে তো কেউ আমরা চুরি করে নিয়ে আসিনি। তাছাড়া কথাতেই আছে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিশে ছুঁলে গলিত কুষ্ঠ।'

অতএব সোনাইকে নিয়ে কোনওরকম জলঘোলা হল না। সোনাই আমাদের সকলেরই নয়নের মণি হল। আর অনেক আদরে মানুষ হতে লাগল সেজো বউদির কাছে। সেজো বউদির স্বামী অরূপবাবুও ছেলেটিকে সন্তানজ্ঞানে মেনে নিলেন।

এইভাবে দিন যায়। ভাল সেবা যত্ন ও পরিচর্যার গুণে সোনাইয়ের চেহারারও দারুণ পরিবর্তন হতে লাগল। তার অঙ্গভরা রূপ ফেটে পড়ল যেন। ওকে লেখাপড়া শেখানোর জন্য স্কুলে ভর্তি করা হল। ভাল মাস্টার রাখা হল ওর জন্য। সোনাইও মন দিয়ে পড়াশোনা করে বছর বছর ক্লাসে উঠতে লাগল।

দেখতে দেখতে পাঁচ-পাঁচটি বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল। দেবশিশু সোনাই আর শিশু বা বালক রইল না। সে হল চৌদ্দ পনেরো বছরের কিশোর।

এমন সময় হঠাৎই এক বিজয়া দশমীর রাতে আমাদের সকলের জীবন থেকে বরাবরের জন্য হারিয়ে গেল সোনাই। পাড়ার একটি বারোয়ারি দুর্গা-প্রতিমা নিরঞ্জন করতে গিয়ে আর ফিরল না সে। কী হল কোথায় গেল কেউ তা বলতে পারল না। অথচ সবাই দেখেছে জলে ও নামেনি। তাহলে?

সোনাইকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ হয়ে গেলাম আমরা সবাই। সেজো বউদি ও অরূপবাবুর কথা না বলাই ভাল। বিশেষ করে সন্তানহারা সেজো বউদি তো পাগলিনীপ্রায়।

এতদিনে থানা পুলিশ করা হল। কাগজে ওর ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া

হল। না, সব চেষ্টাই বৃথা হল, আমাদের সোনাইকে আর ফিরে পাওয়া গেল না। চিরদিনের জন্য হারিয়েই গেল সে।

এই ঘটনার পর আরও দশ বছর কেটে গেছে। শীতের শেষে কাশী বেড়াতে গেছি। বিকেলে দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে কেদার ঘাটের দিতে যাচ্ছি, হঠাৎই রাণামহলের ঘাটের সিঁড়িতে এক কন্দর্পকান্তি আশ্রমিক যুবক এসে আমাকে প্রণাম করল।

আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম, 'সোনাই না?'

ওর মুখে সেই মিষ্টি হাসি। বলল, 'দেবশিশু।'

বললাম, 'সে তো আগে ছিলিস, এখনও কি তাই? তুই এখন দারুণ রূপবান এক যুবক।'

'ব্রহ্মচারি দেবানন্দ। আমার মা কেমন আছেন দাদা?'

'সন্তানহারা জননীরা যেভাবে থাকেন সেইভাবেই আছেন। কিন্তু তুই ওইভাবে হঠাৎ করে চলে এলি কেন?'

'বড় বেশি ভালবাসার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ছিলাম তাই।'

'কিন্তু ওই বয়সে তোর মধ্যে অমন প্রবল বৈরাগ্য কী করে এল?'

'জানি না। তারও আগে একদিন আমি কোথা থেকে যেন ঠিক ওইভাবেই তো এসেছিলাম আপনাদের কাছে।'

'কোথা থেকে এসেছিলি? তোর মা-বাবা কে?'

'জানি না নেই। ভুলে গেছি সব।'

'এখানে তুই কতদিন আছিস? বিজয়াদশমীর রাতে কার সঙ্গে কীভাবে উধাও হলি তুই?'

'কী হবে সে কথা জেনে? আমার খুব কাশীতে আসার ইচ্ছে হয়েছিল, তাই চলে এলাম।'

'এখান থেকে উধাও হবি কবে?'

'জানি না। ভাবছি এবার হিমালায় যাবো।'

আমি ওর শিশুসুলভ মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। এই যৌবনেও ওর মুখের মাধুর্যে দেবশিশুর মতো স্বর্গীয় সুষমায় ভরা হাসি। ওকে দেখে আমার মনে হল কাশীর গঙ্গার ঘাটে আমি যেন ঈশ্বরদর্শন করলাম। আমার তন্ময়তার ঘোর কেটে যাওয়ার আগেই ও হাসিমুখে বিদায় নিল আমার কাছ থেকে। যতক্ষণ না ও জনারণ্যে মিলিয়ে গেল ততক্ষণ চেয়ে রইলাম ওর দিকে।

বনদেবী

যাজপুর কেওনঝর রোড থেকে একটি পথ চলে গেছে বাদামবাড়ি হয়ে চেনকানালের দিকে। আমরা সে পথে না গিয়ে সোজা এগিয়ে চললাম ময়ূরভঞ্জের দিকে। প্রচণ্ড শীতের রাত। খুব বেশি রাত নয় যদিও, তবুও চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। কেননা এ পথে নদী পাহাড় ও বনভূমি সবই আতঙ্কময়। ওড়িশা রাজ্যের এই দুর্ভেদ্য অরণ্যে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের অবাধ বিচরণ।

আমরা চার বন্ধুতে রওনা হয়েছিলাম গোনাসিকায় বৈতরণীর উৎস দেখব বলে। ট্রেন দু'ঘণ্টা লেট করায় সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এরপর স্টেশন থেকে একটি প্রাইভেট কার ভাড়া নিয়ে এগিয়ে চলেছি গন্তব্যের

দিকে। আমার ইচ্ছে ছিল রাত্রিটা যাজপুরে থেকে ভোরের দিকে রওনা হবার। কিন্তু বন্ধুরা শুনল না। বলল, 'পথে কোথাও রাত কাটানো নয়, কেওনঝরেই হোটেলে থাকব। ওখানে রাতে থেকে সকালে যাব গোনাসিকায়।'

অতএব না করলাম না। এখন অন্ধকার পক্ষ। এই কুটিল অন্ধকারে বনের রূপ দেখার অভিজ্ঞতাও বড় কম নয়। বন্ধুদের মধ্যে শান্ত, সুধীর ও সুদেব তিনজনেই সব ব্যাপারে এককাট্টা। আমার সঙ্গে মতের মিল না হলেও আমি কিন্তু মনোমালিন্যের ভয়ে ওদেরই মতে সায় দিই। তবে ভ্রমণ ইত্যাদির ব্যাপারে আমার সিদ্ধান্তই মেনে নেয় ওরা। কিন্তু পথে বেরোলেই অন্যরকম। তখন আর কনট্রোল করা যায় না কাউকে।

যাজপুর থেকে রওনা হবার সময় আমরা লাল মোটা মুড়ি, গরম আলুর চপ ও মোবিলের মতো চ্যাটচেটে রসের এক হাঁড়ি রাসগোল্লা কিনে ওয়াটার বটলে জল ভরে রওনা হলাম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক যাওয়ার পর হঠাৎই একটা গর্তে পড়ে ঝাঁকানি খেয়ে লাফিয়ে উঠল গাড়িটা। তারপরই নট নড়ন চড়ন।

মেজাজ গেল বিগড়ে। আমাদের ডানদিকে পাহাড় ও নদী। বাঁদিকে ঘন জঙ্গল। চারদিক থেকে বুনো জন্তু-জানোয়ারের বীভৎস ডাক ভেসে আসছে। ঝিল্লি থেকে নানারকমের কীট-পতঙ্গের কিরকিরে ডাকেও কান যেন ঝালাপালা।

ড্রাইভার অনেক চেষ্টা করেও সারাতে পারল না গাড়িটাকে। শেষকালে নিরুপায় হয়েই বলল, 'আজ রাত্রিটা এখানেই কাটাতে হবে আপনাদের। কাল সকাল না হলে কিছুই করা যাবে না।'

শান্ত অশান্ত হয়ে বলল, 'তার মানে?'

'তার মানে দেখছেনই তো গাড়ির কী অবস্থা।'

সুদেব আরও রেগে বলল, 'এইরকম অকেজো গাড়ি নিয়ে আপনারা বেরোন কেন বলুন তো?'

ড্রাইভার একটুও না রেগে বলল, 'এতক্ষণ যে আপনারা ঝড়ের বেগে এলেন তাতে কি মনে হল গাড়িটা অকেজো? এখানে রাস্তা খারাপের জন্যই এই হাল। এতে গাড়ির কী দোষ বলুন? আমারই বা দোষ কোথায়?'

আমি বললাম, 'অ্যাক্সিডেন্ট ইজ অ্যাক্সিডেন্ট। এখন বলুন রাতটা আমরা কাটাবো কী করে?'

'এখানেই গাড়ির ভেতরে বসে রাত কাটাতে হবে আপনাদের। কেননা এদিকে কোনও লোকালয় নেই। নেই কোনও হোটেল লজ। এখন আসুন সবাই মিলে গাড়িটাকে ঠেলেঠুলে আমরা একটু সাইডে রাখি। না হলে আপ-ডাউনে অন্য গাড়ির যাতায়াতে অসুবিধে হবে।'

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। তাই আমরা রাগ অভিমান ত্যাগ করে গাড়িটাকে জঙ্গলের খাদের দিকে সরিয়ে আনলাম।

এমন সময় হঠাৎই বিপরীত দিক থেকে একটি ট্রাকের জোরালো আলো দেখতে পেয়ে উল্লসিত হল ড্রাইভার। বলল, 'ভাইসব। আপনাদের আর সারারাত এখানে পড়ে থাকতে হবে না। আমি এখনই এই ট্রাকে করে যাজপুরে চলে যাচ্ছি। সেখান থেকে যেভাবেই হোক অন্য একটা গাড়ি নিয়ে চলে আসব এখানে। ঘণ্টা দুই আপনারা একটু কষ্ট করুন এই জঙ্গলে।'

আশার আলো দেখে আমরাও উৎসাহিত হলাম।

ড্রাইভার ট্রাক থামিয়ে লিফটের ব্যবস্থা করল। যাবার সময় বলল, 'তবে একটা কথা, এই হায়নামারির জঙ্গল কিন্তু খুবই বিপজ্জনক। জানালার কাঁচ বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকবেন। বাইরে বেরোলেই বিপদ। যে কোনও মুহূর্তে তুলে নিয়ে যাবে।'

ড্রাইভারের কথামতো সর্তক হয়ে আমরা বসে রইলাম গাড়ির ভেতর। ড্রাইভারও বিদায় নিল।

এবার আমরা গাড়িতে বসে সঙ্গে নিয়ে আসা মুড়ি, আলুর চপ ও রসগোল্লার সদ্গতি করতে লাগলাম।

অনেক পরে হঠাৎই নজরে পড়ল জঙ্গলের ভেতর থেকে কেউ যেন একটা আলোর সংকেত দিচ্ছে। দেখেই বুক শুকিয়ে গেল। নিশ্চয়ই আমরা ডাকাতের খপ্পরে পড়তে চলেছি এবার। এই অবস্থায় কী যে করব কিছুই ভেবে পেলাম না।

একটু পরেই দেখলাম সেই আলোটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। আমরা তখন বন্যজন্তুর ভয়ে না পারি গাড়ি ছেড়ে পালাতে, না কোনও কিছু করতে। তাই ভয়ে কাঠ হয়েই বসে রইলাম।

দেখতে দেখতে মশাল হাতে এমন একজন এসে দাঁড়াল যে তার আবির্ভাব মাত্রই আঁতকে উঠলাম আমরা। এক ভয়ঙ্করী নারী। যেন সাক্ষাৎ পিশাচিনী। খুবই নিম্ন সম্প্রদায়ের। গালের অর্ধেক অংশ পোড়া। অতি বীভৎস। আমাদের গাড়ির সামনে এসে বলল, 'তোমরা?'

ততক্ষণে শান্ত, সুধীর দুজনেই উধাও। রয়েছি শুধু আমি ও সুদেব। আমরা দুজনেই তখন আমাদের বিপদের কথা খুলে বললাম।

পিশাচিনী বলল, 'এসো আমার সঙ্গে।'

আমি বললাম, 'না। গাড়ি ছেড়ে কোথাও যাব না আমরা।'

ভয়ঙ্করী কঠিন গলায় বলল, 'না এলে কিন্তু বিপদ হবে। এই হায়নামারির জঙ্গলে আমার কথা অমান্য করার ফল ভয়ঙ্কর। তোমাদের সঙ্গে আরও দুজন ছিল। তারা কিন্তু বিপদবরণ করতেই গেছে।'

আমার হয়ে সুদেব বলল এবার, 'কোথায় যেতে হবে?'

'আমি যেখানে নিয়ে যাব।'

আমাদের ইতস্তত দেখে পিশাচিনী বলল, 'ভয় নেই। বিপদে ফেলব না।'

অতএব আমরা অনুসরণ করলাম ওকে।

খানিক যাওয়ার পরই একটি আশ্রমিক পরিবেশে এসে হাজির হলাম আমরা। পাহাড়ের কোলে ঝোপড়ির আশ্রম। একপাশে এক ভয়ঙ্করী দেবীমূর্তি। পাথরের গায়ে খোদাই করা মুখ। মেটে সিঁদুরে লেপা।

পিশাচিনী বলল, 'এই দেবীর কাছে বলির নর আপনি আসে। ঠিক যেভাবে তোমরা এসেছ। বলির প্রসাদ হবার সৌভাগ্য অবশ্য সকলের হয় না। শুধুমাত্র যে সমস্ত মানুষের মধ্যে জঙ্গলের পশু বাসা বেঁধে থাকে, একমাত্র তারাই হয় বলির প্রসাদ। এই হায়নামারির জঙ্গলে তোমাদের দুজনকে অসহায়ভাবে ফেলে রেখে যে ভীরু পশু দুটো পালিয়ে গেল, আজ তারাই হবে আমার বলির নর।'

ভয়ে বুক কেঁপে উঠল আমাদের। বললাম, 'তাদের আপনি পাবেন কোথায়?'

পিশাচিনী নারী ভয়ঙ্করী মূর্তিতে অট্টহাস্য করে উঠল। বলল, 'আমার দলের ডাকিনী মেয়েরা তাদের ওই গুহায় আটকে রেখেছে। আজই মধ্যরাতে ওদের দুজনকে বলি দেবো আমরা।'

আমি বললাম 'আমরা বিদেশী। আপনার এইরকম চেহারা দেখেই ওরা ভয় পেয়ে পালিয়েছে। আপনি ওদের ক্ষমা করুন।'

ভয়ঙ্করী বলল, 'ভীরু কাপুরুষের ক্ষমা নেই।'

আমি আবারও বললাম, 'আপনি কে? কেন এই গভীর জঙ্গলে বাস করে এমন হত্যালীলায় মেতে উঠেছেন?'

পিশাচিনীর দু'চোখে এবার আগুন জ্বলে উঠল। বলল, 'জানতে চাও আমি কে? কেন আমি এ কাজ করছি? তোমাদের হিংস্র সমাজ এই কাজ করবার জন্য হায়নামারির জঙ্গলে নির্বাসন দিয়েছে আমাকে। আমার স্বামী-পুত্র ঘর-সংসার সব জ্বালিয়ে তছনছ করেছে ডাইনি সন্দেহে। আমার মুখের চেহারা দেখছ? এ তোমাদেরই সমাজের দান। আমাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল ওরা। আমি কোনওরকমে পালিয়ে এসে এই জঙ্গলে বাসা বেঁধে দেবীর চরণে আশ্রয় নিয়েছি। সুযোগ পেলেই আমি প্রতিশোধ নিই। যারা আমাকে এখানে আসতে বাধ্য করেছে, তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করি।'

'আপনার আর সব মেয়েরা কোথায়?'

পিশাচিনীর মুখে এবার হাসি ফুটল। বলল, 'এখানে আমি একাই।'

'তাহলে আমাদের বন্ধুরা?'

'বিপদে যারা ফেলে পালায়, তারা তোমাদের বন্ধু? জানি না তারা কোথায়। হয় এতক্ষণে বাঘের পেটে গেছে, নয়তো আবার কাপুরুষের মতো গাড়িতে এসে বসেছে।'

সুদেব বলল, 'আপনি তাহলে আমাদের এখানে নিয়ে এলেন কেন?'

পিশাচিনী বলল, 'আজ মায়ের ভোগ প্রসাদ একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল। যে লোকটা দিনের বেলা এখানে থেকে আমাকে একটু সাহায্য করে, সে অনেকগুলো বনমোরগ শিকার করেছিল আজ। সেইসব মাংস রয়ে গেছে। হঠাৎই দূর থেকে তোমাদের অবস্থা দেখলাম। রাতদুপুরে খুবই বিপদে পড়েছ তোমরা। তাই ভাবলাম ডেকে তোমাদের খাইয়ে দিই। নাও চটপট একটু ভাত আর প্রসাদী মাংস খেয়ে নাও।'

আমি বললাম, 'আপনি দেবতাকে মুরগি দেন?'

'সব কিছুই দিয়ে থাকি। অনার্যদের দেবী তো। অত বাচ-বিচার নেই।'

আমরা আর বাক্যব্যয় না করে তৃপ্তি সহকারে সেই প্রসাদী মাংস ভাত

খেয়ে নিলাম। তারপর শান্ত ও সুধীরের জন্য কিছু প্রসাদ একটি মাটির মালসায় করে নিয়ে এলাম গাড়িতে। পিশাচিনী এখন ভয়ঙ্করী নয়, ভয়ঙ্করীও পিশাচিনী নয়। শান্তসৌম্য মূর্তি দেখে মনে হল এই নির্যাতীতা নারীই প্রকৃত বনদেবী। অন্ধকারে আলো হাতে আমাদের পথ দেখিয়ে গাড়ির কাছে পৌঁছে দিয়েই বিদায় নিল।

শান্ত ও সুধীর তখন আবার এসে বসেছিল গাড়িতে। আমাদের ফিরে আসতে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, 'তোরা যে ফিরে আসবি তা ভাবিইনি। কে ওই ভয়ঙ্করী? তোদের হাতে কী?'

বললাম, 'এত কথা বলার এখন সময় নেই। মায়ের প্রসাদ, খেয়ে নে।'

একটু পরেই একটি ট্রেকারে কয়েকজন মেকানিককে নিয়ে ড্রাইভার ফিরে এলে আমরা তাতে করেই রওনা হলাম কেওনঝরের দিকে। হায়নামারির জঙ্গলের এই রহস্যকাহিনী অবশ্য শোনালাম না ড্রাইভারকে।

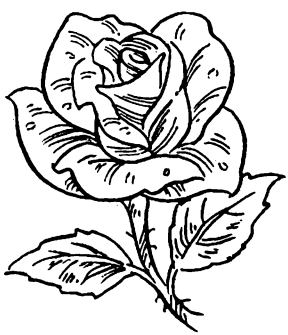

অদ্ভুত রোগ

আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে এই জগতে সবচেয়ে কঠিন সমস্যা কোনটি, তা আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে উত্তর দেব নিজেকে সুস্থ রাখাটা। অক্ষত শরীরে রোগ-ব্যাধির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখে জীবনের দিনগুলো কাটিয়ে দেওয়ার চেয়ে কঠিন কাজ আর নেই। কেননা মানুষ যতই সংযত জীবনযাপন করুক না কেন, যতই প্রতিষেধক নিক, তবুও এক এক সময় এমন এক এক রকমের রোগ-ব্যাধির উপক্রম হয় যে ডাক্তারিশাস্ত্রে তার চিকিৎসাপদ্ধতির কোনও উল্লেখ থাকে না। এই তো কিছুদিন আগেই জানা গেল বীরভূমের আহমদপুরের বাসিন্দা দুর্গারানি সিংহ নামের এক চৌষট্টি বছরের বৃদ্ধার মাথায় হঠাৎ করে সিং গজাতে শুরু করল। একটি দুটি নয়, একাধিক। ডাক্তারবাবুরা পড়লেন মহাচিন্তায়। কেননা চিকিৎসা জগতে এমন রোগের দৃষ্টান্ত বিরল। পরে অবশ্য ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ডাক্তারবাবুদের চেষ্টায় সফল অস্ত্রোপচারে সেই শিংকে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে।

ঠিক এইরকমই একটি বিদঘুটে রোগের শিকার একবার আমি নিজেই হয়েছিলাম। আমার বয়স তখন চব্বিশ-পঁচিশ বছর। হঠাৎ আমার ডান-হাতের মাঝের আঙুলে একটি অদ্ভুত রোগ দেখা দিল। আঙুলের মাঝখানে উল্টোদিকে, যেদিকে গাঁটের রেখা থাকে, সেই দিকে ছোট-ছোট কতকগুলি স্ফটিকের মতো বিন্দু দেখা দিল। তারপর একটু একটু করে বাড়তে লাগল সেগুলো। এদিকে আঙুলও ক্রমশ ফুলে ফুলে মোটা হতে লাগল। যাকে দেখাই সেই বলে, তোর এবার কপাল ফিরল। কেননা আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়াটা যা-তা ব্যাপার নয়। তার ওপর আঙুলের ভেতরে যখন মুক্তোবিন্দু দেখা দিয়েছে, তখন তোর হাত দিয়ে মুক্তো এবার ঝরবেই।

তা সে যে যাই বলুক, আমার অবস্থা তখন কাহিল। সেই সময় আমি কলকাতার একজন নামকরা ওস্তাদের কাছে তালিম নিয়ে তবলা শিখতাম। তবলা বাজালে হাতের আঙুলে কড়া পড়ে। কিন্তু গোদের ওপর বিষফোঁড়া হলে কিছুই করার নেই। হাতের আঙুল এমনই মোটা হল যে রীতিমতো একটা মর্তমান কলার আকার ধারণ করল। আর আঙুলের ভেতরে সেই বিন্দুগুলো ছোট ছোট পুঁতির আকারে বেড়ে উঠে আমাকে কষ্ট দিতে লাগল। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হত আমার আঙুলটা যেন পেপারওয়েট আর ভেতরের বিন্দুগুলো পেপারওয়েটের ভেতরকার সেই দানাগুলোর মতো। শুধু তাই নয়, পরিষ্কার কাচের মতো দেখা যেত, সেগুলোর আবার শিকড় গজাচ্ছে। এক একটি দানা যেন এক একটি শালগম। হাত মুঠো করতে পারতাম না, খেতে পারতাম না, ট্রামে-বাসে হাতল ধরতে পারতাম না। ওইসব কিছু করতে গেলেই কটাং করে উঠত আর যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যেতাম। তবলা বাজানো মাথায় উঠল। সেই সঙ্গে ঘুচে গেল মনের শান্তি। ক্রমে আরও দু'-একটা আঙুলে ওইরকম হল। শেষকালে ওইগুলোর টাড়সে হাতের চেটোটাও ফুলতে লাগল একটু একটু করে।

কী যে করি কিছু ভেবে পেলাম না। এ রোগের ওষুধ কার কাছে পাই? একদিন আমাদের গৃহ-চিকিৎসকের কাছে গেলাম। আঙুলের অবস্থা দেখেই চোখ কপালে উঠল তাঁর। বললেন, 'এমন রোগ তো বাবা আমার জীবনে আমি আর কারও হতে দেখিনি, তাই কী ওষুধ দেবো বলো? এ তো দেখছি সার্জিক্যাল কেস। আঙুলকে ফালা ফালা করে প্রতিটি দানাকে বের করা চাট্টিখানি কথা? অর্থাৎ অপারেশনেও কিছু সুবিধে হবে না এই রোগের। এক

যদি পুরো আঙুলটাকে কেটে বাদ দেওয়া যায়, তাহলে হয়তো উপায় একটা হতে পারে। কিন্তু সে কাজই বা করতে বলি কী করে? অতএব...।'

অতএব ম্লানমুখে ফিরে এসে নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগলাম। ডানহাতটাই অকেজো হয়ে গেল আমার। আঙুলের টনটনানিতে মনমেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

ওই অবস্থায় এক হেমন্তকালে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমি চলে গেলাম কাশীতে আমার দিদিমার কাছে। দিদিমা কাশীতে একা থাকতেন। আমি সারা বছরই যখন তখন দিদিমার কাছে যেতাম। বিশেষ করে অগ্রহায়ণ মাসটা আমার বাঁধা ছিল। প্রথমদিকে গিয়ে সারা মাস থেকে সংক্রান্তির দিন পরমান্ন খেয়ে বাড়ি আসতাম। কাশীর তখন জলহাওয়া ভাল ছিল, সস্তাগণ্ডার বাজার ছিল। এক সপ্তাহ থাকলে চেহারার ভোল পাল্টে যেত। একেবারে লাল হয়ে কলকাতায় ফিরে চমকে দিতাম সবাইকে। তা যাক, কাশীতে গোধূলিয়ার মোড়ে হরসুন্দরী ধর্মশালায় মহেশ ভট্টাচার্যের দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয় ছিল। ছিল কেন, আজও আছে। গরিব-দুঃখী লোকেরা, কাশীর যত বিধবা বুড়ি, সবাই ওইখানে রোগের চিকিৎসা করিয়ে বিনা পয়সায় ওষুধ পেতেন। দিদিমাও চিকিৎসা করাতেন সেখানে। ওঁর তখন কী একটা অসুখের জন্য চিকিৎসা চলছিল। তাই দিদিমা নিজে না গিয়ে ওঁর কাগজপত্তর দিয়ে আমাকেই পাঠালেন পরবর্তী পর্যায়ের ওষুধ নিয়ে আসবার জন্য।

বারাণসীর অলিগলি সবই আমার পরিচিত। ডাক্তারবাবুও আমার অপরিচিত নন। আমি যেতেই ডাক্তারবাবু বললেন, 'কী! দিদিমার শরীর কেমন?'

আমি যা যা বলবার বলে ওষুধ নিলাম। তারপর হঠাৎ কী মনে হতে আমার হাতের আঙুলটা দেখালাম ডাক্তারবাবুকে। ডাক্তারবাবু প্রবীণ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। তবে কিনা পূর্ববঙ্গের লোক। প্রতিটি কথায় এখনও পূর্ববঙ্গের টান। আমার আঙুলটা নেড়েচেড়ে দেখেই বললেন, 'হেইডা আবার কী রোগ জুটাইলে তুমি, এ যে দেখসি আঙুল ফুইল্যা কলাগাস ওইয়া গেসে।'

আমি তখন আগাগোড়া সব বললাম ডাক্তারবাবুকে। বললাম, 'আপনি কি পারবেন ডাক্তারবাবু, আপনার হোমিওপ্যাথি দিয়ে আমার এই রোগটাকে সারাতে?'

ডাক্তারবাবু প্রথমেই বললেন, 'না'। তারপর আঙুলটাকে বারবার ঘুরিয়ে

ফিরিয়ে দেখে বললেন, 'আমি কেন? আমার মরা বাপের সাইধ্য নাই যে হেই রোগের হাত ওইতে মুক্ত দিয়া তোমারে সুস্থ করে। তার কারণ কি জানস?'

'বলুন কী কারণ?'

'হেইরকম রোগের ঔষধ আমাগোর কোনও ডাক্তারি শাইস্ত্রে লিখ্যা নাই।'

আমি আর কী করি? দিদিমার ওষুধ নিয়ে উঠতে যাচ্ছি, ডাক্তারবাবু বললেন, 'আরে যাও কই? আমি ওইলাম গিয়া ডাক্তার। অ্যাত্তো সহজে হাল ছাড়ুম না। আমার মনে ওইত্যাসে তোমার হেই রোগডা ওইলো গিয়া করণ জাতীয় রোগ। এর একটাই ঔষধ আমার জানা আছে, তাইতে কাম ওইলো তো ওইলো, নইলে আমার কিছু করণের নাই। তবে কিনা হেই ঔষধটা আমি তোমারে দাতব্য করুম না। কেননা চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি শুধুমাত্র গরিব লোকেদেরই জইন্য, হকলের জইন্য নয়। ঔষধটার নাম ওইলো গো অ্যান্টিম ক্রুড, টু হান্ড্রেড। আজই এক ডোজ খাইবা। তিনদিন পর আরও এক ডোজ। তারপরে সাতদিন বাদ সর্বশেষ আর এক ডোজ। কাম ওইলো তো ভাল, নইলে আর ওষুধ খাইবা না, আমার কাছেও আর আসবা না!'

আমি সঙ্গে সঙ্গে মহেশ ভট্টাচার্যর দোকান থেকে ওষুধটা কিনে নিলাম। তখন চার আনায় এক শিশি ওষুধ পাওয়া যেত। সময়টা ১৯৬৬ সাল।

যাই হোক, ডাক্তারবাবুর নির্দেশমতো কিনেই এক ডোজ ওষুধ খেয়ে নিলাম। এরপর তিনদিনের মাথায় আর এক ডোজ ওষুধ খেতেই জোঁকের মুখে নুন। হ্যাভক রিগিং সত্ত্বেও ভোটে হারার পর নেতাদের মুখগুলো যেমন চুপসে এতটুকু হয়ে যায়, আমার আঙুলেরও সেই অবস্থা হল। মর্তমান কলার মতো ফোলা আঙুল শুকিয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেল। ভেতরের বীজগুলো শেকড়বাকড় সমেত শুকিয়ে গেল। পেট এমন কষে গেল যে আর এক বিপদ। আমি তখন বেদনাহীন। ছুটে গেলাম ডাক্তারবাবুর কাছে। ডাক্তারবাবু বললেন, 'ওম্ শান্তি'।

এরপর একদিন বেলা এগারোটা-বারোটা নাগাদ দশাশ্বমেধ ঘাটে চপচপে করে তেল মেখে দিদিমা আমি স্নান করে উঠে গা মুছছি, হঠাৎই আঙুলের ভেতর থেকে পাথরের মতো শক্ত শক্ত বীজগুলো জলে ভেজার ফলে আঙুল ফেটে টপটপ করে সিঁড়ির চাতালে পড়ল। আমি সেগুলো সযত্নে কুড়িয়ে নিলাম। হাতের আঙুলে কোনও জার্মই রইল না আর। ফাটা জায়গাগুলো বোরোলিন ঘষে স্বাভাবিক করে নিলাম।

এরপরে হল আর এক বিপর্যয়। অর্থাৎ কিনা শরীরের যেখানে যেখানে যত কড়া ছিল, সবই ফেটে বেরিয়ে আসতে লাগল। গোড়ালির পাশে যে গাঁট, তাও চোকলা উঠে পড়ে গেল একদিন। সবচেয়ে বিপদের ব্যাপার যেটা হল, সেটা হচ্ছে পায়ের গোড়ালিটাই ফেটে বেরিয়ে আসতে লাগল পা থেকে। তার ফলে অসতর্কতায় কাঁকড় পাথরকুচি ইত্যাদি ফাটার মধ্যে ঢুকে গেলে জব্দ হয়ে যেতাম।

যাই হোক, সেই যে আমার রোগমুক্তি হল, তারপর থেকে আমার আর কখনও ওই রোগ হয়নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, বাজারে এখন হোমিওপ্যাথি আছে কিন্তু ওষুধ নেই। কারও হাতে-পায়ে কড়া হলে ওই একই ওষুধ প্রয়োগ করে কোনও ফলই পাইনি। তাই বলি, এ জগতে নিজেকে সুস্থ রাখাটাই সবচেয়ে কঠিন। তার কারণ রোগ যেমন আছে, রোগের ওষুধও তেমনই আছে, কিন্তু ওষুধের মধ্যে ওষুধটাই নেই।

গ্রহের ফের

অনেক আশা নিয়ে গঙ্গার ধারে মনোরম পরিবেশে এই বাড়িটা তৈরি করিয়েছিলেন তারকবাবু। নাম দিয়েছিলেন স্বপ্ননীড়। আজ পঁচিশ বছর পরে অনেক দুঃখে এই বাড়ি তিনি বিক্রি করে দেবেন স্থির করেছেন। না দেওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। কেননা এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরে এই বাড়িতে এসে একটি দিনের জন্যও সুখের মুখ দেখতে পাননি তিনি।

পাশের বাড়ির মোহনবাবু, তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের দাপটে জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে গেছে তাঁর। এমন দজ্জাল প্রতিবেশীর সঙ্গে বাস ও সাপের সঙ্গে বাস একই রকম বলতে গেলে। কথায় কথায় ঝগড়া, গালাগালি, ছেলেদের চোখরাঙানি সবকিছু নীরবে সহ্য করেছেন তিনি। এছাড়াও আছে চিরস্থায়ী অন্য উপদ্রব। যত ময়লা আবর্জনার স্তূপ, ময়লা জল নিষ্কাসন, সব তাঁর ঘরের পাশে। প্রতিবাদ করলেই তুলকালাম।

এদিকে তাঁর নিজেরও বয়স হয়েছে। চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন

সম্প্রতি। ছেলেমেয়েদের মধ্যে মেয়েই বড়ো। বছর পাঁচেক আগে তার বিয়ে হয়েছে। সে এখন আছে দুর্গাপুরে। সেখানে তার নিজস্ব বাড়ি। বছর দুই আগে ছেলেটি হঠাৎই বিষজ্বরে আক্রান্ত হয়ে তিনদিন জ্বরভোগের পর মারা গেল। স্ত্রীও কয়েকমাস আগেই হঠাৎ করে ঘুমের মধ্যেই চলে গেলেন। তারকবাবু এখন একা। স্বপ্ননীড় তাঁর মনের মধ্যে স্বপ্নই রয়ে গেল। তার ওপর যেদিন থেকে তিনি এখানে বাড়ি তৈরি করব বলে ইঁট গেঁথেছেন, সেদিন থেকেই মোহনবাবুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা। এমন অবস্থায় তাঁর একার পক্ষে আর এখানে থাকা ঠিক নয়। তাছাড়া অজস্র স্মৃতিভারে জর্জরিত হয়ে এখানে তিনি থাকবেনই বা কী করে? তাই চরম সিদ্ধান্ত নিলেন বাড়িটা বেচে দিয়ে কোনও সুন্দর পরিবেশে থাকবার।

জায়গাও পেয়ে গেলেন। দুর্গাপুরে মেয়ের বাড়ির কাছেই নবনির্মিত একটি ফ্ল্যাটবাড়ির দোতলায় টু-রুম ফ্ল্যাট। জামাই সন্ধান নিয়ে ফ্ল্যাটটি কেনার বন্দোবস্ত করে দিয়েছে। অবসরকালীন টাকা এবং নিজস্ব সঞ্চয় থেকে ফ্ল্যাটটা সাড়ে পাঁচ লাখ টাকায় কিনেও নিলেন। যে কদিন বাঁচবেন তিনি থাকবেন। তারপর মেয়ে-জামাই ভোগ করবে। ওখানে থাকলে সব সময়ের জন্য মেয়ে-জামাইকেও কাছে পাবেন। নাতি-নাতনিদের মুখ দেখবেন। একা মানুষ তিনি। সামান্য দুটি ভাত-ডাল রেঁধে দেওয়ার জন্য একজন কাউকে রেখে দিলেই হল। এইসব চিন্তা করেই কাগজে ছোট্ট করে একটি বিজ্ঞাপনও দিলেন তিনি।

গঙ্গার ধারে ছোট্ট সুন্দর দোতলা বাড়ি। মনোরম পরিবেশ। তাই খদ্দেরের আনাগোনাও চলতে লাগল। শেষমেষ একজনের সঙ্গে রফা হল সাত লাখ টাকাতেই।

দুপুরে রাজী হল, সন্ধ্যায় হঠাৎ আবির্ভাব সস্ত্রীক মোহনবাবুর। তারকবাবু তো ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন। তবু মনের রাগ চেপে দুজনকেই বসতে বললেন।

মোহনবাবু বললেন, 'কাগজে বিজ্ঞাপন দেখলাম আপনি নাকি বাড়িটা বিক্রি করে দিচ্ছেন?'

তারকবাবু বললেন, 'হ্যাঁ।'

মোহনবাবুর স্ত্রী বললেন, 'বাড়ি বেচে দিয়ে আপনি তাহলে যাবেন কোথায়?'

'দুর্গাপুরে মেয়ের বাড়ির কাছাকাছি। আমার মেয়েকে মনে আছে তো? যার বিয়ে আপনারা দু-দুবার ভেঙে দিয়েছিলেন? সে কিন্তু এখন খুব সুখেই আছে।'

মোহনবাবু বিনীতভাবে বললেন, 'আর ওসব পুরোনো কাসুন্দি টেনে লাভ কী বলুন? আসলে যা কিছু হয় সবই অদৃষ্টের ফেরে। গ্রহচক্রতেই সব কিছু করায়।'

তারকবাবু হেসে বললেন, 'তা ঠিক। যা কিছু ভাল তা সব আমরা করি আর খারাপ যা কিছু তার জন্য দায়ী গ্রহচক্র। এবার হয়তো সত্যসত্যই দুষ্ট গ্রহের প্রকোপ থেকে মুক্তি পেতে চলেছি আমি। এখান থেকে বিদেয় হলে প্রথমেই মুক্তি পাবো আপনাদের মতো সজ্জন প্রতিবেশীর নানাবিধ অত্যাচারের হাত থেকে। তারপর...।'

মোহনবাবু বললেন, 'আঃ তারকবাবু! থাক না ওসব কথা। আগাগোড়াই আমরা যে আপনার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিনি এটা তো ঠিক। তা যে কারণে আপনার কাছে আমরা এসেছিলাম সে কথাই বলি। আপনি তো জানেন আমার ছেলেরা এখন বড় হয়েছে। বিয়ে-থা হয়েছে দু-একজনের। তা আমার ওই ঘরে আর কুলোচ্ছে না। বিশেষ করে আপনার এই জমি বাড়ি তো আমারই বাড়ির লাগোয়া। এক দাগ, এক খতিয়ান। আপনি দাদা ওইসব রাগরোষ মনের মধ্যে পুষে না রেখে বাড়িটা আমাকেই দিন।'

তারকবাবু বললেন, 'তা কী করে হয়? আজই দুপুরে একজনকে কথা দিলাম। তিনি আশা করে আছেন।'

'তাতে কী? জমি-বাড়ি কেনাবেচা, ছেলেমেয়ের বিয়ে এসব দশ কথা না হলে হয় না। বাড়িটা আপনি আর কাউকে না দিয়ে আমাকেই দিন দাদা। প্লিজ, আমার পূর্বকৃত সমস্ত অপরাধের জন্য আমি ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে।'

তারকবাবু বললেন, 'না না, তার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি যখন বরাবরের জন্য চলেই যাচ্ছি এখান থেকে, তখন আপনি ক্ষমা চাইলেই কি, আর না চাইলেই কি।'

মোহনবাবুর স্ত্রী বললেন, 'কত দাম চাইছেন দাদা আপনি বাড়িটার জন্য?'

তারকবাবু বললেন, 'দশ লাখ চেয়েছিলাম, কিন্তু উনি সাত লাখের বেশি দিতে পারবেন না বললেন।'

মোহনবাবু আঁৎকে উঠলেন, 'কী বললেন, সাত লাখ? নাঃ, স্ত্রী মারা যাওয়ার পর আপনার দেখছি মাথাটা সত্যিসত্যিই খারাপ হয়ে গেছে। এই বাড়িটার কম করেও দাম হচ্ছে পনেরো লাখ।'

'সে তো জানি, তবু...। তা ছাড়া অত টাকা এই বয়সে আমার কোন কাজেই বা লাগবে?'

'নাতি-নাতনিদের নামে পোস্টঅফিসে জমা করে দেবেন। শুনুন আমি ওই বাড়ির জন্যে দশ লাখ টাকাই দেবো। আমাকে ছাড়া বাড়ি আপনি কাউকেই বেচবেন না।'

তারকবাবু বললেন, 'তা হলে এক কাজ করুন, আমি যাতে বদনামের ভাগী না হই, সেজন্য আপনি ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে ওঁকে রাজি করান। উনি রাজি হলেই আমি বাড়িটা আপনাকে বিক্রি করব।'

মোহনবাবু বললেন, 'রাজি হবেন না মানে? কে সে? কোথায় থাকে? কাছাকাছি নিশ্চয়ই? আমার মেজো ছেলেকে চেনেন তো? রাজি না হলে বাড়ি থেকে গলায় গামছা দিয়ে টেনে এনে রাস্তায় ফেলে পেটে লাথি মারবে।'

তারকবাবু বললেন, 'ওসব করার দরকার নেই। ভালোভাবে একটু বুঝিয়ে বলবেন। তা হলে রাজি হয়ে যাবেন উনি।'

'রাজি না হয়ে উপায় নেই। আমার ছেলের মূর্তি দেখলেই বুকের রক্ত জল হয়ে যাবে। এখন বলুন কে সে?'

তারকবাবু বললেন, 'যদিও তিনি এ পাড়ার লোক নন, তবুও আপনার পরিচিত। কাছাকাছি চৈতলপাড়ায় থাকেন। মানবমোহন বসুমল্লিক।'

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মড়ার মুখের মতো ফ্যাকাসে হয়ে গেল মোহনবাবুর মুখ। বললেন, 'মানববাবু মানে তো মেনো গুণ্ডা? ওকে তো সবাই কানকাটা মেনো বলে। জীবনকেষ্টর সঙ্গে মারামারি করতে গেলে ওর একটা কান কেটে নেয় জীবন। ও নামে মানব হলে কী হবে আসলে একটা দানব। প্লিজ তারকবাবু, আপনি আমাকে বাড়ি বেচুন, ওই পাপটাকে জোটাবেন না এখানে। তা হলে আপনার মতো আমাকেও এখান থেকে বাড়ি বেচে দিয়ে পালাতে হবে। ও এখানে থাকলে আগে আমার মেজো ছেলে খুন হবে। শুধু ওরই কারণে আমার ছোট ছেলে দু-বছর ঘরছাড়া। জানেনই তো, মেনো ব্যাটা এখন রাজনীতি করছে। ওর হাতে এখন অসীম ক্ষমতা।'

তারকবাবু বললেন, 'সেইজন্যই তো লোকটাকে ঘাঁটাতে চাইছি না আমি। তিন লাখ টাকা কম নিয়েও বাড়িটা ওঁকেই দিচ্ছি।'

মোহনবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'না, সেই কারণে বাড়িটা আপনি ওকে দিচ্ছেন না। আসলে আপনি আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছেন। আমি আপনার সঙ্গে অনেক দুর্ব্যবহার করেছি। তারই বদলা নিচ্ছেন আপনি। আপনি চান ওর হাতে আমার ছেলেরা খুন হোক, আপনি চান ওর উৎপাতে আমরা এখান থেকে উৎখাত হই। আপনি...।'

তারকবাবু বললেন, 'ওসব আমি কিছুই চাই না। আমি শুধু চাই আমার মনের শান্তি। মেনো গুণ্ডার হাতে বাড়িটা তুলে দিতে পারলেই দুর্গাপুরের ফ্ল্যাটে গিয়ে জীবনের বাকি দিনগুলো শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারব।'

মোহনবাবু বললেন, 'শেষপর্যন্ত আপনার মনে এই ছিল?'

তারকবাবু স্মিত হেসে বললেন, 'আমি কে? আমি তো নিমিত্তমাত্র। আসলে সবই হচ্ছে গ্রহের ফের।'

মোহনবাবু আর বসলেন না। স্ত্রীকে নিয়ে তখনই বিদায় নিলেন।

তারকবাবু দরজাটা বন্ধ করে সোফায় এলিয়ে দিলেন দেহটা।

শুভ জন্মদিন

আজ অনিতার জন্মদিন। যোগমায়া বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী অনিতা। বিখ্যাত শিল্পপতি অনুপম মিত্রর একমাত্র মেয়ে। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। এমন মেয়ে সচরাচর চোখে পড়ে না। মেমেদের মতো গায়ের রঙ। টানা টানা চোখ। ঘন কালো মাথার চুল। আর তেমনই সুন্দর মুখশ্রী। সুন্দর মুখের জন্য ওর জয় সর্বত্র। ঘরে বাইরে সবাই ওর দিকে চেয়ে থাকে অপলকে। সেই অনিতার জন্মদিনকে কেন্দ্র করে মিত্তির বাড়িতে আজ বিশাল আয়োজন।

সকাল থেকেই বাড়িটা যেন আজ বিয়েবাড়ির রূপ নিয়েছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অতিথি-অভ্যাগতদের ভিড়ে বাড়ি যেন ঠাসা। সন্ধ্যা সমাগমে বাড়ি আলোয় ঝলমলিয়ে উঠল। বাড়ির বাইরে গেটের কাছে নহবত

বসেছে। সানাই-এর সুরে তাই মুখর চারদিক। কলকাতার একজন নামকরা ওস্তাদ সানাইবাদক এসে সানাই বাজাচ্ছেন। যাঁরা নিমন্ত্রিত তাঁরা তো বটেই, যাঁরা নিমন্ত্রিত নন তাঁরাও দূর থেকে শুনছেন বসন্তরাগের সেই সানাই-এর সুর।

বাড়ির পেছনদিকে বাগান। সেখানেই পাল টাঙিয়ে রান্নার আয়োজন করা হয়েছে। লুচি মাংস পোলাও মিষ্টি কত কিছুর আয়োজন। এমনিতেই এ বাড়িতে এই মেয়েকে ঘিরে উৎসবের শেষ থাকে না। মেয়ে নাচে পুরস্কার পেল, অনুষ্ঠান। ভাল রেজাল্ট করে পরীক্ষায় পাস করল, অনুষ্ঠান। একটু শরীর খারাপের পর মেয়ে ভাল হয়ে উঠল, অনুষ্ঠান। এ ছাড়াও যখন তখন মেয়ের স্কুলের বান্ধবীদের নিয়ে নানারকম অনুষ্ঠান তো আছেই। তবে কিনা আজকের যে অনুষ্ঠান এর যেন তুলনা নেই। এমন বড় মাপের আয়োজন এর আগে অনিতাকে ঘিরে আর কখনও হয়নি। সে ঘুরছে ফিরছে, গুনগুন করে গান গাইছে। আনন্দে একেবারে মাতোয়ারা যেন সে। আনন্দের আতিশয্যে ও যেন ওর মধ্যেই নেই আর।

একটির পর একটি গাড়ি আসছে, অতিথি-অভ্যাগতরা নামছেন গাড়ি থেকে। অনুপম মিত্র সকলকে সাদর অভ্যর্থনা করছেন। অনিতার সঙ্গে কেউ করমর্দন করছেন। কেউ বা গাল টিপে দিচ্ছেন। কী ভাল যে লাগছে অনিতার। সবচেয়ে ভাল লেগেছে ওর স্কুলের শিক্ষিকা ও সহপাঠিরা এসেছে বলে। একজনও বাদ যায়নি কেউ।

অনিতা নাচ-গান দুই-ই জানে। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতিতে ওর সঙ্গে পাল্লা দেবে এমন কেউ এই এলাকায় নেই। সবাই তাই অনুরোধ করল এই অনুষ্ঠানে ওকেই গান গেয়ে শোনাতে।

গান হলে সানাই বন্ধ করতে হয়। তাই ওস্তাদ কিছুক্ষণের জন্য বিরতি নিলেন।

অনিতা প্রথমে কয়েকটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে নজরুলগীতি গাইতে লাগল। একের পর এক গান। গান যখন বেশ জমে উঠেছে ঠিক তখনই একটা কলরব শোনা গেল, 'চোর-চোর-চোর-চোর।'

'পাকড়ো—পাকড়ো।'

কিন্তু কোথায় চোর? কোথায় কে? তাই পাকড়াও করবে কাকে?

অর্ধপথেই থেমে গেল গান। প্রাণবন্ত উৎসবেও একটু ভাঁটা পড়ল যেন। সবাই যে যার নিজেকে সামলাতে ব্যস্ত। কেউ কেউ কাঁপতে লাগল।

অনুপমবাবু চেঁচিয়ে বললেন, 'যে ভাবেই হোক ধরতে হবে চোরকে। দেখো যেন পালিয়ে না যায়।'

দারোয়ান রামদীন ততক্ষণে ধরে ফেলেছে চোরকে। চোর তো নয়, রাজপুত্তুর। বছর পনেরো ষোলোর একটি ছেলে। কী দারুণ দেখতে। যেমনই নধরকান্তি চেহারা, তেমনই ফর্সা গায়ের রঙ। মাথার চুল রুক্ষ। দেখলে বেশ ভাল বাড়ির ছেলে বলেই মনে হয়। পরনে ময়লা তালিমারা একটি হাফ প্যান্ট ও একটি ছেঁড়া জামা। মনে হয় খুবই গরিব। রামদীন তার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরেছে। তাকে ঘিরে তখন ঝি-চাকর অতিথি-অভ্যাগত ও অন্যান্যদের ভিড়। তারা কেউ কেউ এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন এই মুহূর্তে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ওকে। একজন ওর কলার ধরে দেওয়ালে চেপে বলল, 'এই ব্যাটাচ্ছেলে, বল এখানে কী মতলবে এসেছিলি?'

ছেলেটি কথা বলবে কি, ভয়ে থরথর করে কাঁপছে তখন।

আর একজন বলল, 'যেরকম কালাভোলা মেরে রয়েছে, তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে একেবারে পাকা চোর। না হলে এত মারের পরও মুখ দিয়ে কথা বেরোচ্ছে না।'

কে যেন বলল, 'উৎসব বাড়িতে বেশি ঝামেলা না করে সরাসরি পুলিশের হাতে তুলে দাও।'

'পুলিশে দেবো কী? ওর পেট থেকে কথা বের করে তবেই ওকে ছাড়ব।' বলেই মুখের ওপর সজোরে একটা ঘুসি।

ছেলেটি সেই আঘাত সহ্য করতে না পেরে ককিয়ে উঠল।

'বল শিগগির কোথায় থাকিস, না হলে আরও মারব।'

ছেলেটির তখন কথা বলবারও শক্তি নেই। ওর ঠোঁট কেটে গলগল করে রক্ত ঝরছে।

'এত মারছি তবু চোখে জল নেই দ্যাখ।'

চোরকে নিয়ে তখন এমনই এক বিশ্রী ব্যাপার শুরু হয়ে গেল যে উৎসবের অনুষ্ঠানটাই পণ্ড হবার জোগাড়। সব আনন্দই যেন ম্লান হয়ে গেল। অনিতার দু'চোখ ভরে এল জলে। কত সাধ ছিল আজকের এই

উৎসবকে কেন্দ্র করে সহপাঠিনী, বান্ধবী ও দিদিমণিদের গান শোনাবে, সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

অনুপমবাবু ভিড় ঠেলে সেখানে গিয়ে ওই অবস্থা দেখেই বললেন, 'আরে, আরে! এ কী করছ তোমরা? এইভাবে কেন মারছ ওকে? অস্থানে লেগে গেলে মরে যাবে যে। তখন খুনের দায়ী হবেটা কে শুনি?'

'আর বলবেন না কাকাবাবু, ব্যাটা চুরি করতে এসে রামদীনের হাতে ধরা পড়েছে। কিছুতেই ওর মুখ থেকে একটা কথাও বের করতে পারছি না।'

'তাই বলে এইভাবে মারে? আমাকে একবার ডাকতে পারতে তো।'

সবাই তখন পিছিয়ে গেল।

অনুপমবাবু বললেন, 'ওকে একটু ফাস্ট এড্ দিয়ে একটা ঘরে চাবি দিয়ে রাখো। পরে আমি দেখছি।' বলে চলে গেলেন।

চলে না গিয়েই বা করেন কি? এখন তো চোরকে নিয়ে মেতে থাকলে চলবে না। এত লোকজন নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটাও খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

যাই হোক, লোকজন খাওয়ানো শুরু হল। ভাল ভাল খাবারের আয়োজন হয়েছিল। সবাই খুব খুশি। খুবই আনন্দ সকলের।

তবু এই উৎসবের হইহল্লায় সুরে বাঁধা তানপুরাটার তার ছিঁড়ে যাওয়ার মতো যেন একটা সুর কেটে গেছে। কেননা সবার মুখেই এখন অন্য প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে চোরকে নিয়েই আলোচনা বেশি। রান্নার প্রশংসা নেই, আয়োজন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কোনও মতামত নেই। সবার মুখেই ওই চোর। আজকের এই শুভ জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অনিতা নয়, চোরই যেন আসল নায়ক।

খাওয়া-দাওয়ার পর অতিথি-অভ্যাগতরা একে একে বাড়ি চলে গেলেন। নানা জনের নানা উপহার সামগ্রিতে ঘরের ভেতরটা স্তূপাকার হয়ে রইল।

সবাই চলে গেলে অনুপমবাবু, তাঁর স্ত্রী অরুণিমা এবং অনিতা ছাড়া আর কেউ-ই রইল না ঘরে।

সবারই মনে টান টান উত্তেজনা।

অনুপমবাবু ডাকলেন, 'রামদীন!'

'বলুন বাবু।'

'চোরকে নিয়ে এসো।'

রামদীন চোরকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল ঘরের ভেতর। ছেলেটি টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সকলের পায়ের কাছে। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল সে। দেখেই বোঝা গেল তার সর্বাঙ্গে প্রচণ্ড মারধরের চিহ্ন।

অনুপমবাবু চোরকে সস্নেহে বললেন, 'চুরি করার পরিণামটা কী ভয়ানক দেখলে তো? আর কখনও ভুলেও একাজ করতে এসো না। আমার লোকরা দেখছি খুবই মেরেছে তোমাকে।' তারপর বললেন, 'যাও ওই চেয়ারটায় গিয়ে বসো।'

চোর তবুও দাঁড়িয়ে রইল।

অনুপমবাবু বললেন, 'বসো।'

বসল চোর, কিন্তু মুখ তুলে তাকাতেও পারল না, মাথা হেঁট। লজ্জায় যেন মরে যাচ্ছে।

অরুণিমা দেবীর খুব মায়া হল চোরকে দেখে। চোরের এমন সুন্দর চেহারা! এ যে ভাবা যায় না। তার ওপর এত অল্প বয়সের চোর! নিশ্চয়ই অভাবে পড়ে স্বভাব নষ্ট করেছে। এ তো পেশাদার চোর নয়। তাই আদরের সুরেই জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি বাবা?'

চোরকে বাবা! তাও এমন নরম সুরে! চোরের চোখেও বুঝি জল এল এবার।

অরুণিমা দেবী আবার বললেন, 'বলো। ভয় নেই।'

চোর কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আমার নাম রাজকুমার রায়।'

অনুপমবাবু হেসে বললেন, 'তা চেহারা তোমার রাজকুমারের মতোই। অভাবে অনটনে শরীরের লাবণ্য ঝরে গেলেও রূপ যাবে কোথায়? কিন্তু বাবা রাজকুমার, তোমার রাজার রাজত্ব ছেড়ে এই গরিবের পর্ণকুটীরে আসতে গেলে কেন হঠাৎ?'

চোর এবার একটু সাহস পেয়ে ভয় কাটিয়ে বলল, 'চুরি করব বলে।'

সবাই চুপ। এমনভাবে কেউ কি বলতে পারে এ কথা? চোর তো হাতে পায়ে ধরবে, কাঁদবে। তার জায়গায় এ কী!

অনিতাও এতক্ষণ এক ভাবে চেয়েছিল চোরটার দিকে। চোরের মিষ্টি চেহারা দেখে ওর মনটা নরম হল। ও ভুলে গেল আজকের এই উৎসবের

দিনে অবাঞ্ছিত এই অতিথির জন্য সবকিছুই ম্লান হওয়ার কথা। বরং সমবেদনায় ওর বুক ভরে উঠল। ওর মনে হল কিছু একটা ব্যাপার আছে। চোর মানেই কালো কুৎসিত বিচ্ছিরি একটা চেহারা। মারধর করলে হাতে-পায়ে ধরবে, কাঁদবে। কিন্তু সে সব কিছুই করল না এই চোর। বিবর্ণ ছিন্ন মলিন পোশাকের পরিবর্তন হলে রীতিমতো ভাল ঘরের ছেলে। তাই চাপা গলায় ও ওর মাকে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে মা এ অন্য সব চোরেদের মতো নয়।'

মা বললেন, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে। তবু ও কি বলে ওর মুখ থেকেই শোনা যাক।'

অনুপমবাবু চোরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার কথা শুনে খুশি হলাম। আমি সব সময় সত্যি কথা বলা পছন্দ করি। যাক, যা তুমি চুরি করেছ তা আমাকে দেখাও। ওগুলো তোমার। ও আমি তোমাকেই দিয়ে দেবো।'

চোরের চোখে জল এল এবার। বলল, 'আমি তো কিছুই চুরি করিনি।'

'তা হলে?'

'বাড়িতে ঢোকামাত্রই ধরা পড়ে গেছি।'

চমকে উঠলেন সবাই।

অনুপমবাবু বললেন, 'সে কী! তা হলে কী জন্য ঢুকেছিলে বাড়িতে?'

'আমি চুরির জন্যই ঢুকেছিলাম।'

অরুণিমা দেবী ওর কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'বোকা ছেলে কোথাকার। এত লোকজনের বাড়িতে এই পোশাকে কেউ আসে? এলেই তো ধরা পড়বে। যাই হোক, তোমাকে দেখেই বুঝেছি তুমি ঠিক সেইসব চোরেদের মতো নও। তা এ লাইনে নতুন নিশ্চয়?'

ছেলেটি নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগল।

অনিতা বলল, 'আজ আমার জন্মদিন। আমি চাই না আজকের এই শুভদিনে আমাদের বাড়িতে এসে কেউ চোখের জল ফেলুক। তোমাকে যারা মারধর করেছে তারা আমাদের না জানিয়েই করেছে। তুমি নির্ভয়ে সব বলো। ও হ্যাঁ, তুমি তো অনেকক্ষণ এ বাড়িতে বন্দি হয়ে আছো। কিছু খাওনি পর্যন্ত। আগে তুমি পেট ভরে দুটি খেয়ে নাও, তারপরে সবকথা খুলে বলো।'

অনুপমবাবু ও অরুণিমা দেবী বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যিই তো এখনও পর্যন্ত কিছুই খায়নি বেচারি। অভাবের তাড়নায় চুরি করতে এসে শুধু মারই খেয়েছে। কার বাছা রে! এই রামদীন! একটা প্লেটে করে যা যা হয়েছে আজ তার সবকিছু নিয়ে এসে খেতে দে ছেলেটাকে।'

অনিতা বলল, 'পেট ভরে খাবে, প্রয়োজনে চেয়ে নেবে। লজ্জা করবে না কিন্তু।'

চোরের দু'চোখে বিস্ময় যেন উপচে পড়ল। ওর চিরকালের ধারণা ছিল বড়লোকেরা হৃদয়হীন হয়। ওদের সম্প্রদায়ের বাইরের মানুষকে তারা ঘৃণার চোখে দেখে। কিন্তু এ তো দেখা গেল সম্পূর্ণ অন্যরকম। বাবুর কথামতো থালাভর্তি খাবার এসে গেল। রামদীন এবং অন্যান্য গৃহভৃত্যরা নিয়ে এল সেইসব খাবার। খাবারের দিকে তাকিয়ে ছেলেটির চোখদুটো এমনই বড় হয়ে উঠল যে দেখে মনে হল সে বোধ হয় এই সব খাবার কখনও চোখে দেখেনি।

যাই হোক, ছেলেটি খুব তৃপ্তির সঙ্গে একটু একটু করে খেতে লাগল যা যা ছিল তার সবকিছু। পরিমাণ এত ছিল যে কোনও কিছু চেয়ে নেবার মতো প্রয়োজন হল না।

খাওয়া-দাওয়ার পর ছেলেটি যা বলল তা বড়ই করুণ। ছেলেটি বলল, 'আমার জীবনে চুরি করতে আসা আজই এই প্রথম। নিজের বিবেকের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করে এই বাড়িতে যখন সাহস করে ঢুকে পড়লাম, তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। অত লোকজনের বাড়িতে না ঢোকাই আমার উচিত ছিল। ভেবেছিলাম চাকর-বাকরদের দলে মিশে যাবো। কিন্তু এখানে তাদেরও যে আলাদা ড্রেস আছে তা জানতাম না। তাই যখন ফিরে যাবো কিনা ভাবছি তখনই ধরা পড়ে গেলাম আপনার লোকেদের হাতে। ধরা পড়ে মারধর খেয়েছি। কিন্তু সেটা ভুলেছি আপনাদের মধুর ব্যবহারে। ভাগ্যে খারাপ কাজ করতে এসেছিলাম, তাই আপনাদের মতো ভালমানুষের সন্ধান পেলাম। কত ভাল আপনারা। শুধু ধনী নয়, সত্যই বড়লোক।'

অনুপমবাবু বললেন, 'তুমিও ভাল ছেলে। শিক্ষিত ছেলে। তাই কত সুন্দরভাবে এতগুলো কথা গুছিয়ে বলতে পারলে। চোর তুমি মোটেই নও। শুধুমাত্র গ্রহের ফেরে আজ তোমার এই অবস্থা। লেখাপড়া কতদূর করেছ তুমি?'

'খুব কম। নবম থেকে আমি যখন দশম শ্রেণীতে উঠি, তখনই আমার বাবা মারা যান। এমনিতেই আমরা খুব গরিব। তারপর বাবা মারা যাওয়ার পর আমরা প্রায় না খেতে পেয়ে পথে বসলাম। ভাল ঘর ছেড়ে স্যাঁতস্যাঁতে বস্তির ঘরে গিয়ে উঠলাম। কিন্তু সেই ঘরেরও ভাড়া ঠিকমতো দিতে না পারায় এখন আমরা ফুটপাতের বাসিন্দা। লেখাপড়া গেল, আশ্রয়হীন হলাম, একটি বোন ছিল, একদিন ফুচকা খেয়ে কলেরায় মরল। এখন শুধু মা আর আমি। দিন আমাদের চলে না। অনেক কাজের চেষ্টা করেও আমি কোনও কাজ পাই না। যা পাই তা করা যায় না। মা কারও বাড়ি কাজের লোক হিসেবে কাজ খুঁজতে গিয়েও কাজ পেলেন না। এর চেয়েও দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে বলুন?'

'সে কী! কারও বাড়িতে কোনও কাজই পেলেন না তোমার মা? অথচ কত লোক একটা কাজের লোক পাবার জন্য মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করছে।'

'ওই তো বললুম দুর্ভাগ্য। আমরা যে ঠিকানা-বিহীন। যদি বস্তিতে থাকতাম তা হলেও লোকে বিশ্বাস করত। কিন্তু ফুটপাতের বাসিন্দার ওপর তো ভরসা করবে না কেউ। অথচ মজা দেখুন, বাবা মারা যাওয়ার পর মা এর-ওর বাড়িতে সাহায্য চাইতে গেলে লোকে কত কথাই না বলত। কেউ কেউ বলত, 'এমন গতর নিয়ে হাত পাততে লজ্জা করে না? লোকের বাড়ি গিয়ে বাসনমাজার কাজও তো একটু খুঁজে নিতে পারো।' মা বলতেন, 'তা হলে তো বেঁচে যাই। ছেলেমেয়ে দুটোর মুখে দু'বেলা দু'মুঠো গুঁজে দিতে পারি। আপনারাই দিন না কারও বাড়িতে একটা কাজের ব্যবস্থা করে।' তখনই উত্তর আসত, 'কথার ছিরি দ্যাখো, আমাদের যেন কাজের লোক নেই।' কেউ কেউ বলত, 'কাজের লোকের অবশ্য খুবই দরকার। আমাদের যিনি মহারানী তাঁর তো হাজাররকম বায়ানাক্কা, তার ওপর কাজেরও কামাই খুব। তবু তোমাকে রাখা যায় না। যদি কখনও চুরি-চামারি করে পালিয়ে যাও, তখন কোন ফুটপাতে তোমাকে খুঁজতে যাবো বলো?'

ওর বৃত্তান্ত শুনে অরুণিমা দেবীর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'আহা রে। এমন কপালও হয়?'

ছেলেটি বলল, 'এইভাবেই দিন কাটে আমাদের। কোনও উপায়েই কোনওভাবে কিছু রোজগার করে বেঁচে থাকার উপায় বের করতে পারি

না। কত চোর-জোচ্চোর গুণ্ডা-বদমায়েশের সঙ্গে নীল আকাশের নীচে রাত কাটাতে হয়। ঝড়-জল বৃষ্টি-বাদলাকে সঙ্গী করেই চলতে চলতে একসময় অসুস্থ হয়ে পড়েন মা। বিনা চিকিৎসায় রোগ আরও বাড়তে থাকে। ডাক্তার দেখাবার পয়সা নেই। তাই হাসপাতালের শরণ নিলাম। আউটডোরে দেখিয়ে ওষুধ খাওয়াই, কিন্তু কোনও কাজই হয় না। ক্রমশ মায়ের শরীর আরও ভেঙে পড়ে। অথচ হাসপাতালেও ভর্তি করে নেয় না মাকে। এখন মায়ের অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। এলাকারই একজন ডাক্তারবাবুর হাতে-পায়ে ধরলাম। উনি এসে বিনা ভিজিটেই দেখে গেলেন মাকে। দেখেশুনে বললেন, 'এ হল রাজরোগ। অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। তবু এখনও ঠিকমতো চিকিৎসা হলে বেঁচে যেতে পারে। আমিই তোমার মাকে সারিয়ে ফেলতে পারব। কিন্তু এই রোগের ওষুধের যা খরচা তা বহন করবে কে? গরিবের ঘরে এ রোগ হলে তাকে নীরবে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলেই বিদায় নিতে হয়। এখন ভেবে দ্যাখো কী করবে।' ডাক্তারবাবুর কথা শুনেই আজ আমি মরিয়ার মতো ঢুকে পড়েছিলাম আপনাদের বাড়িতে। প্রথমে ভেবেছিলাম আপনাদের সকলের হাতে-পায়ে ধরে কিছু সাহায্য চাইব। কিন্তু আগের অভিজ্ঞতায় সে আশা ত্যাগ করে চুরির মতলবই নিয়ে এলাম মাথায়। ভাবলাম সমুদ্র থেকে এক আঁজলা জল তুললে সমুদ্র টেরও পাবে না, তার জলও কমবে না। তাই—।'

অরুণিমা দেবী ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'ছেলেমানুষ, তাই না বুঝে একটা ভুল কাজ করতে যাচ্ছিলে। তবে তোমার মাতৃভক্তি দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।'

অনুপমবাবু বললেন, 'আমার মেয়ের জন্মদিনে আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য ঈশ্বর আজ তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন এখানে। তোমার কোনও ভয় নেই। আমি তোমাকে সাহায্য করব। তোমার মায়ের চিকিৎসা করাবো আমি। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করাবো। ভাল করে তুলব। এই ব্যাপারে তুমি আমার ওপর ভরসা রাখতে পারো।'

ভাগ্যের আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা যে এইভাবে কেটে যাবে, তা ভাবতেও পারেনি ছেলেটি। বলল, 'সত্যি বলছেন? এ আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? আমার মা ভাল হয়ে উঠবে? বিশ্বাস করুন, মা ছাড়া এ জগতে আর আমার কেউ নেই।'

অনিতার দুটি চোখও মমতার অশ্রুতে ভরে উঠেছে তখন। সে মায়াভরা চোখে ওর দিকে একবার তাকিয়ে দেখে বলল, 'আচ্ছা বাবা, আমাদের বাগানে যে ছাগল রাখার ঘরটা অবহেলায় পড়ে আছে, সেই ঘরটা একটু আবর্জনামুক্ত করে ওদের নিয়ে এসে রাখা যায় না? আমার মনে হয় ফুটপাতে থাকার চেয়ে ওই আশ্রয়টা ওদের পক্ষে ভাল হবে।'

অনুপমবাবু বললেন, 'তুই ঠিক বলেছিস মা। তোর জন্মদিনে আজ আমরা অনেক উপহার পেয়েছি। আজ আমাদের তরফ থেকে ফুটফুটে রাজকুমারকে দেওয়া হোক সামান্য একটু আশ্রয়ের উপহার।'

অরুণিমা দেবী বললেন, 'আমিও তাই বলি। ওর মাকে নিয়ে ও এখানেই চলে আসুক। তা ছাড়া হারুকে বাজারে পাঠালে ও নিয়মিত ভাবে পয়সা চুরি করে। গাড়িটাকেও ধোয়-মোছে না ঠিকমতো। এ কাজটা তো এ-ই করতে পারে। হারুরও কাজের চাপ কমবে একটু।'

অনিতা বলল, 'সেইসঙ্গে লেখাপড়াও শিখবে ও। ক্লাস নাইন পর্যন্ত যখন পড়েছে, তখন সুযোগ পেলে আবার নতুন করে পড়াশোনাটা চালিয়ে যেতে পারবে। হারুকে এই কাজের জন্য খাওয়া-পরা বাদে তিনশো টাকা মাইনে দেওয়া হয়, তাকে অন্য কাজে লাগিয়ে ওই মাইনেটা একেই দেবে।'

অরুণিমা দেবী বললেন, 'ঠিক। এখানে থাকলে অনেক উন্নতি হবে ওর। বাড়ির ছেলের মতোই থাকবে।'

ছেলেটির, অর্থাৎ রাজকুমারের মুখে ভাষা নেই। চোখে জল।

অনিতা বলল, 'রামদীন! শুনলে তো সব। যদিও আজ তোমরা খুব খাটাখাটনি করেছ, তবুও সবাইকে নিয়ে চটপট ওই ছাগলঘরটা পরিষ্কার করে দাও। ছাগল-মুরগি যখন নেই-ই, তখন অযথা ঘরটা অবহেলায় পড়ে থাকে কেন? এবারে ওর সদ্‌গতি হোক। পরে সময়মতো একটু সারিয়ে নিলেই হবে। আর বিপিনদাকে বলো গাড়ি বের করতে। ও গিয়ে ওর মাকে আজই এখানে নিয়ে আসুক।'

দেওয়ালের গায়ে আটকে থাকা একটা টিকটিকিও যেন সায় দিল এই ব্যাপারে, ঠিক ঠিক ঠিক।

অভিমান

সানকিভাঙা গার্লস স্কুলের সন্ধ্যাদির ক্লাস যেদিন থাকে, মেয়েরা সেদিন ভয়ে তটস্থ হয়ে যায়। বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ই ঠাকুরের নাম জপতে জপতে আসে। অনেকে বড়বাবার কাছে মানত করে, সন্ধ্যাদি যেন কোনও কারণে আজ স্কুলে হাজির হতে না পারেন। কিন্তু না, কোনও দেবতাই প্রসন্ন হয়ে মেয়েদের এই মনোস্কামনা পূর্ণ করতে পারেন না।

সন্ধ্যাদি নিয়মিতই আসেন। ক্লাস করেন। অন্যান্য দিদিমণিরা কামাই করলেও সন্ধ্যাদির অনুপস্থিতি নেই।

কী সুন্দর দেখতে সন্ধ্যাদিকে। যেমনই চোখ-মুখের গড়ন, তেমনই গায়ের রঙ। একবার তাঁর মুখের দিকে তাকালে চোখ আর ফেরানো যায় না। অথচ কী দুর্দান্ত রাশভারী প্রকৃতির মেয়ে তিনি। কারও দিকে আড়চোখে একবার তাকালে তার বুকের রক্ত জল হয়ে যায়।

সেদিন ছিল দারুণ এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিন। সকাল থেকেই ঘন মেঘে আকাশ ঢাকা ছিল আর থেকে থেকে প্রবল বর্ষণ হচ্ছিল। দু'একজন ছাড়া সব মেয়েই ক্লাসে উপস্থিত। অনেকেই ভেবেছিল, এত দুর্যোগে বোধ হয় সন্ধ্যাদি স্কুলে আসতে পারবেন না। কিন্তু না, সন্ধ্যাদি ঠিকই এলেন। রোল কলও করলেন। তারপর হঠাৎ পেছনের বেঞ্চের একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'ইউ-ইউ—। স্ট্যাণ্ড আপ অন দা বেঞ্চ।'

যাকে একথা বলা হল তার নাম রুবি।

মেয়েটি দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে বেঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়াল।

ওর পাশে যে মেয়েটি বসেছিল তার নাম সেবা। সে তখন হাই বেঞ্চের ওপর মাথা রেখে কান্না শুরু করে দিয়েছে।

সন্ধ্যাদি বললেন, 'তোমার আবার কী হল? তুমি কাঁদছ কেন? বন্ধুর শোকে?'

মেয়েটি নিরুত্তর।

সন্ধ্যাদি বললেন, 'শুধু পড়াশোনায় ফাঁকি নয়, আমার ক্লাসে কেউ অমনোযোগী হলেই আমি তাকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দেবো।'

আর একটি মেয়ে, তার নাম শম্পা। সে কিছু বলবার জন্য হাত তুলল।

সন্ধ্যাদি বললেন, 'তুমি কিছু বলতে চাও?'

শম্পা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'রুবি আর সেবার কোনও দোষ নেই দিদিমণি।'

সন্ধ্যাদি কঠিন গলায় বললেন, 'দোষগুণের কথা এখানে আসছে কেন? ওরা আমার ক্লাসের ডিসিপ্লিন ব্রেক করেছে তাই—। ঠিক আছে, বলো কী তুমি বলতে চাও?'

'রুবির ব্যাগ থেকে দশটা টাকা কে বের করে নিয়েছে।'

সন্ধ্যাদি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'হোয়াট! ওর ব্যাগ থেকে দশটাকা বের করে নিয়েছে?'

'হ্যাঁ দিদিমণি। ও তাই খোঁজাখুঁজি করছিল। ও স্কুলে আসবার সময় ওর মা'র কাছ থেকে টিফিনের পয়সা চেয়েছিল। ভাঙানি ছিল না বলে মা ওকে দশটাকার একটা নোট দিয়েছিলেন। এখন হঠাৎ দ্যাখে টাকাটা ওর ব্যাগে নেই।'

সন্ধ্যাদি সেবার কাছে এসে বললেন, 'তুমি কেন বেঞ্চের ওপর মাথা রেখে কাঁদছিলে?'

সেবা তখনও ফুলে ফুলে কাঁদছিল। বলল, 'আমি গরিবের মেয়ে তো। ওর পাশে বসি। ও তাই আমাকে সন্দেহ করছিল। সেইজন্য লজ্জায় আমি কাঁদছিলাম। আর সব মেয়েদের কাউকেই তো ও সন্দেহ করছিল না। শুধু আমাকে—।' এই পর্যন্ত বলে সেবা আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল। তারপর বলল, 'শুধু ও নয়, ওর পাশে বসা অন্য মেয়েরাও।'

সেই সন্ধ্যাদি যে ভয়ঙ্করী রূপ ছেড়ে এমন স্নেহময়ী হয়ে উঠবেন তা কে জানত? তিনি তখনই সেবাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ছিঃ এমন করে কাঁদে না। কে কী বলল না বলল এর জন্য কেউ মন খারাপ করে? বড় বড় মনীষীদেরও তো কত লোকে কত কথা বলে। তুমি যদি ঠিক থাকো তা হলে কারও সাধ্য আছে তোমাকে ছোট করে? বড় ছোট সবই নিজের কাছে। সবসময় বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে থাকবে, দেখবে অতিবড় শত্রুও একদিন বশ হবে তোমার।'

সন্ধ্যাদির মমতা ভরা কণ্ঠস্বরে বুঝি জাদু ছিল। তাই সেবাও আবার স্বাভাবিক হয়ে চোখের জল মুছে বসল।

সন্ধ্যাদি হঠাৎ করেই আবার আগের মতো গম্ভীর হয়ে গেলেন। কঠিন গলায় বললেন, 'রুবি, তোমার টাকা চুরি গেছে সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কে যে একাজ করেছে তা আমি জানি না। কিন্তু না জেনে না শুনে তুমি সেবাকেই বা সন্দেহ করলে কেন? তোমরা বড়লোক আর ওই মেয়েটা গরিব বলে? তুমি কি জানো, আমি নিজেও একদিন গরিবের মেয়ে ছিলুম? দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরে খেতে পেতুম না। তাই বলে তুমি কি আমাকেও সন্দেহ করবে?'

রুবি মাথা হেঁট করে বলল, 'অন্যায় হয়ে গেছে দিদিমণি। আসলে একটু আগে ও আমার ব্যাগ থেকে একটা বই নিয়েছিল। তাই ওকে জিজ্ঞেস করছিলাম, তুই কি টাকাটা নিয়েছিস রে?'

সন্ধ্যাদি গর্জে উঠলেন, 'তার মানেই তো...। ঠিক আছে, তুমি আগে ক্ষমা চাও ওর কাছে।'

রুবি সেবার হাত দুটি ধরে বলল, 'তুই আমাকে ক্ষমা কর সেবা। আমার অন্যায় হয়ে গেছে।'

সেবা ওর কথায় একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ নামিয়ে চুপ করে বসে রইল।

সন্ধ্যাদি বললেন, 'সেবা, কাল থেকে তুমি ফার্স্ট বেঞ্চে আমার সামনে বসবে, কেমন? রুবির পাশে আর তোমাকে বসতে হবে না।'

ধীরা নামে অন্য একটি মেয়ে বলল, 'কাল থেকে আমিও আর রুবির পাশে বসব না দিদিমণি। ও আমাকেও ফিস ফিস করে বলছিল, 'আমার টাকাটা আর কেউ নয়, বই ঘাঁটতে গিয়ে সেবাই বের করে নিয়েছে। আসলে খুব গরিব তো ওরা, খেতে পায় না।' সেই কথা সেবা শুনতে পেয়ে গিয়েছিল। তাছাড়াও রুবি ওর ব্যাগ হাতড়ে দেখেছিল বলেই ও মনে ব্যথা পেয়েছে খুব। আমারও খুব খারাপ লেগেছে ব্যাপারটা।'

সন্ধ্যাদি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে, তোমরা দুজনেই কাল থেকে সামনের বেঞ্চে বসবে। এখন তোমরা বলো, কে নিয়েছে রুবির টাকা?'

ক্লাসসুদ্ধ মেয়ে নিরুত্তর।

সন্ধ্যাদি বললেন, 'ওর ব্যাগ থেকে যখন টাকাটা চুরি গেছে, তখন তোমাদেরই ভেতর থেকে কেউ যে নিয়েছো তাতে কোনও কিন্তু নেই। এখন বলো কে করেছো এই কাজ?

মেয়েরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। কিন্তু স্বীকার কেউ করে না।

সন্ধ্যাদি আবার শান্তমূর্তি ধরে হেসে বললেন, 'আসল চুরির জন্য তো নয়, কেননা ওই দশটা টাকায় এই বাজারে কী হবে? স্রেফ মজা করার জন্যই যে করেছ কেউ, তা আমি বুঝি। তাই বলি ফিরিয়ে দাও টাকাটা। এমন মজা করতে নেই।'

ঘরের ভেতরে তখন সূচ পড়লেও বুঝি শব্দ হবে।

সন্ধ্যাদি অত করে বলা সত্ত্বেও কোনও মেয়েই টাকা ফিরিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে এল না।

সন্ধ্যাদি বললেন, 'শোনো, আমি যেমন তেমন দিদিমণি নই, কাজেই

তোমরা জেনে রেখো, তোমরা আমার কাছে শুধু ছাত্রী নও, মেয়ের মতো। আমি দীর্ঘদিন এই স্কুলে শিক্ষকতা করছি। তোমরা বিভিন্ন শ্রেণীতে আমার শিক্ষায় শিক্ষালাভ করে বড় হয়েছো। তোমরা চোর হবে এ আমি কখনও সহ্য করতে পারবো না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, চুরির জন্য নয়, কেউ মজা করবার জন্যই একাজ করেছো। যে করেছো সে যদি সৎসাহস দেখিয়ে টাকাটা ফেরত দাও, তাহলে কিন্তু গর্বে আমার বুক ভরে উঠবে। তোমরা ভুলে যেও না, এ দেশের মাটিতে গার্গী মৈত্রেয়ী অপালা জন্মেছিলেন। সতী সাবিত্রীর দেশ এটা। মীরাবাঈ অহল্যাবাঈ-এর দেশ। বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা, মাতঙ্গিনী হাজরা, আরও কত-কত নাম বলব? শুধু তাঁদের মুখ চেয়ে যে একাজ করেছ সে ধরা দাও।'

কিন্তু সন্ধ্যাদির এত কথাতেও কোনও কাজ হল না।

মেয়েরা সবাই মৌন হয়ে মাথা নত করে বসে রইল।

সন্ধ্যাদি বললেন, 'দেখছো তো, একের অপরাধে সবার কেমন মাথা হেঁট হয়। সেইসঙ্গে আমারও মাথা হেঁট হয়ে আসছে।'

কথাটা বড়দিদিমণির কানেও গেল। তিনি এসেই বললেন, 'এত বড় একটা অন্যায় আমার স্কুলে আমি হতে দেবো না। তোমরা যদি নিজের থেকে এগিয়ে না আসো, তা হলে আমি বাধ্য হবো সবার ব্যাগ সার্চ করতে।'

সন্ধ্যাদি বললেন, 'না বড়দি, সেটা করা ঠিক হবে না। আমি জানি আমাদের মেয়েরা অত্যন্ত ভাল। কাল ক্লাস শুরু হবার আগে যে নিয়েছে সে এসে ঠিকই টাকাটা অফিসঘরে জমা দিয়ে যাবে। এই ব্যাপারে ওদের একটা সুযোগ অন্তত দেওয়া হোক।'

বড়দিদিমণি বিদায় নিলেন। ক্লাস শেষ করে সন্ধ্যাদিও চলে গেলেন অন্য ক্লাসে শিক্ষাদান করতে। এ নিয়ে আর কোনও জলঘোলা হল না।

পরদিন ক্লাস শুরু হওয়ার অনেক আগেই সন্ধ্যাদি এসে হাজির হলেন স্কুলে। তখনও অন্যান্য দিদিমণি বা ছাত্রীদের কেউই এসে উপস্থিত হয়নি। নিজেই কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে খবরের কাগজের পাতার ওপর চোখ রেখেছেন, এমন সময় সেবা এসে দরজার কাছে দাঁড়াল।

সন্ধ্যাদির বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। গরিবের মেয়ে বলে লজ্জায় অপমানে যার মাথা কাটা যাচ্ছিল, সেই সেবা—। এও কী সম্ভব!

'ভেতরে আসতে পারি দিদিমণি?'

সন্ধ্যাদি মৃদু হেসে বললেন, 'নিশ্চয়।'

সেবা ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে সন্ধ্যাদির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে দশ টাকার একটি নোট তাঁর হাতে দিয়ে চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল।

সন্ধ্যাদি দরজার কাছ পর্যন্ত ছুটে গিয়ে ডাকলেন তাকে 'এই শোনো-শোনো! সেবা— ! এই—!

কিন্তু সেবা তখন কোথায়?

নির্বাক সন্ধ্যাদি টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে ক্লান্তি দূর করতে লাগলেন। গরিবের মেয়ে বলে যার এত অভিমান, শেষপর্যন্ত সেই মেয়েই যে এই কাজ করবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। যদিও সে তার সততার পরিচয় দিয়েছে, তবুও প্রকারান্তরে সে যে তার দারিদ্র্যতাকে এবং নিজেকেই অপমান করে গেল। ওর বদলে যদি অন্য কোনও মেয়ে এসে টাকাটা দিয়ে যেত তাঁকে, তা হলে তাকে নিয়ে যে কী করতেন তিনি তা তিনিই জানেন। সেই মেয়ের জীবনের মোড়ও ঘুড়িয়ে দিতেন। কিন্তু সততার প্রতিমূর্তি সেবা—। তার কিনা এই কাজ? সন্ধ্যাদি আর ভাবতে পারলেন না।

যথাসময়ে ক্লাস শুরু হল।

সন্ধ্যাদি রোল কল করলেন। সব মেয়েই আজ উপস্থিত, শুধু সেবা ছাড়া। সেবা যে আজ ক্লাস করবে না তা তিনি জানতেন। সত্যি, কী ভুল যে করল মেয়েটা। সন্ধ্যাদি মনে মনে ঘৃণাও করতে লাগলেন সেবাকে। 'আমি গরিব বলে ওরা আমাকে সন্দেহ করছে'—এই কথাটাই কেউটের ছোবলের মতো মনে হল সন্ধ্যাদির। উঃ কী দারুণ কপটতা। কী দারুণ আত্মপ্রবঞ্চনা।

নাম ডাকা শেষ হলে দিদিমণি রুবিকে ডাকলেন, 'রুবি এদিকে এসো।'

রুবি ধীরে ধীরে উঠে এল সন্ধ্যাদির কাছে।

সন্ধ্যাদি দশটাকার নোটটা তার হাতে দিয়ে বললেন, 'দ্যাখো তো, এই টাকাটাই তোমার কিনা?'

রুবি উল্লসিত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। এই তো সেই টাকা। আনকোরা নতুন। আমার বাবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে চাকরি করেন, তাই—।'

'ওসব কথা থাক। টাকা যখন পেয়েছো, তখন সিটে গিয়ে বসো। এবার থেকে যত্নে রেখো টাকা-পয়সা।'

'টাকাটা কে নিয়েছিল দিদিমণি?'

'যেই নিক। নাম বলা যাবে না। আমি আগেই বলেছি, আমার শিক্ষায় যারা শিক্ষালাভ করে তারা কখনও অমানুষ হয় না। দেখলে তো যে নিয়েছে সে এসে তার সততার পরিচয়টা ঠিক দিয়ে গেল? নাও এখন পড়াশোনায় মন দাও।'

মেয়েরা যে যার বই খুলে সন্ধ্যাদির মিষ্টিমুখের দিকে তাকিয়ে ওঁর শিক্ষাদানের প্রতি মনোনিবেশ করল।

এরপর বেশ কয়েকটি দিন কেটে গেলেও সেবা আর স্কুলে এল না। তার বদলে এল এক মর্মান্তিক খবর। সেবা একটি সুইসাইড নোট লিখে ইঁদুর মারা বিষ খেয়েছে। খুবই খারাপ অবস্থা ওর। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ডাক্তাররা কোনও আশা দিতে পারছেন না।

শুনেই স্কুলের দিদিমণিরা প্রায় সবাই ছুটলেন হাসপাতালে সেবাকে দেখতে।

সন্ধ্যাদি সেবার মাথার কাছে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'এ তুমি কী করলে সেবা?'

সেবা ম্লান হেসে বলল, 'টাকাটা রুবিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তো দিদিমণি?'

'দিয়েছি। তবে তোমার নামটা বলিনি।'

'বললেই পারতেন। সবাই জানত বড়লোকদের যত টাকা গরিবরাই চুরি করে।'

সন্ধ্যাদির চোখে জল এল এবার। আঁচলের খুঁটে সেই জল মুছে বললেন, 'কিন্তু তুই এ কাজ কেন করলি মা?'

তুমি থেকে তুই! তার ওপরে 'মা'। প্রাণটা যেন জুড়িয়ে গেল সেবার। বলল, 'গরিবের মেয়ে বলেই করেছি।'

ঘৃণায় শরীর রী রী করে উঠল সন্ধ্যাদির। যাই হোক, ডাক্তারদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রাণপণ চেষ্টায় সেবা ভাল হয়ে উঠল। বাড়িও ফিরে এল সুস্থ হয়ে।

আর ঠিক তখনই একদিন সন্ধ্যেবেলায় হঠাৎ সুমনা এসে কড়া নাড়ল সন্ধ্যাদির দরজায়।

দরজা খুলেই সন্ধ্যাদি অবাক, 'কী ব্যাপার সুমনা, তুমি? তোমার তো কদিন ধরেই শুনছিলাম খুব জ্বর। কেমন আছো তুমি?'

ম্লান হেসে সুমনা বলল, 'একটু ভাল আছি। আচ্ছা সন্ধ্যাদি, লিউকোমিয়া কী রোগ? ওই রোগ হলে মানুষ বাঁচে না?'

শিউরে উঠলেন সন্ধ্যাদি, 'একথা বলছিস কেন? কার হয়েছে এই রোগ?'

সুমনা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'পাপ করলেই তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় দিদিমণি। যে পাপ আমি করেছি, তার উপযুক্ত শাস্তিই আমি পেয়েছি। শুধু আমারই জন্য একটি প্রাণ অকালে ঝরে যেতে বসেছিল। তাই বিনা মেঘে বজ্রঘাতটা নেমে এল আমার ওপরই। আমার ব্লাড রিপোর্টে লিউকোমিয়া ধরা পড়েছে দিদিমণি। ব্লাড ক্যানসার। আমার জীবনের আর আশা নেই। তাই বাঁচবো না জেনেই আপনার কাছে আমি ছুটে এলাম আমার অপরাধের কথা স্বীকার করতে।'

'কীসের অপরাধ তোর? কী করেছিস তুই?'

সুমনার দু'চোখ বেয়ে কয়েকটি জলের ধারা নেমে এল। বলল, 'সেদিন রুবির ব্যাগ থেকে টাকাটা আমি চুরি করেছিলাম। পরে গোলমাল দেখে সবার অলক্ষ্যে সেবার বইয়ের ভাঁজে ওই টাকাটা আমি গুঁজে দিয়েছিলাম। ও-ও জানত না। বাড়ি গিয়ে হয়তো বইয়ের পাতা ওলটাতে গিয়েই ওই টাকা পেয়ে সে তার নিজের ভবিতব্যকে ধিক্কার দিয়ে টাকাটা আপনার হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিল আর নিজের দুর্ভাগ্যের ওপর অভিমানে আত্মঘাতী হতে গিয়েছিল মেয়েটা। সেবা চোর নয় দিদিমণি। বড় ভাল মেয়ে। ওর মতো মেয়ে হয় না।'

সন্ধ্যাদির সেদিনের কথাটা মনে পড়ল। সেবা তাঁর হাতে টাকাটা গুঁজে দিয়েই উধাও হয়ে গিয়েছিল চোখের পলকে। কারও প্রতি কোনও অভিযোগ সে করেনি। এমনকি একটি কথাও সে বলেনি স্বপক্ষে। আজকের দিনে এমন মেয়েও কি হয়? সুমনাকে বিদায় দিয়ে সন্ধ্যাদি চোখের জল মুছলেন।

—০—

মা! আমার মা!

আমার নাম সাগরিকা। ডাক নাম মিলি। আমি জন্মেছিলাম ভয়ঙ্কর এক দুর্যোগের রাতে। তখনই বোধ হয় আমার ভাগ্য নির্ধারণ হয়ে গিয়েছিল। তাই আমার সারাটা জীবনই ছেয়ে গেল দুর্যোগের কালো মেঘে। সবাই বলে কালোর পরে আলো, মেঘের পরে রোদ। কিন্তু আমার বেলায় তার সম্পূর্ণ বিপরীত। কালোর পরে কালো রাত। যে রাতের শেষ নেই। মেঘের পরে মেঘ। তারও পরে বিপর্যয়।

আমার ছোটবেলাটা কেটেছিল বোসপুকুরে নিজেদের বাড়িতে। আমার বাবা-মা দুজনেই খুব কড়া ছিলেন। তাঁদের কঠিন শাসন আমাকে সব সময়ই

মেনে চলতে হত। কাজেই পাড়ায় কারও সঙ্গে বিশেষভাবে মেলামেশা করবার সুযোগ পেতাম না। এমনকি স্কুলেও আমার সঙ্গে সখ্যতা সেরকম কারও হয়ে ওঠেনি। তবে কিনা কথা বলতাম ছোট-বড় সবার সঙ্গেই। সবাই আমাকে ভালবাসত। দিদিমণিরাও প্রায় প্রত্যেকেই ভালবাসতেন আমাকে।

আমার সত্যিকারের বন্ধুত্ব বলতে যা কিছু তা একমাত্র আমার মায়ের সঙ্গেই গড়ে উঠেছিল তাই। তবুও আমার সমবয়সীদের সঙ্গে বন্ধুত্বের যে আনন্দ, সেই আনন্দ থেকে আমি বরাবরই বঞ্চিত ছিলাম। পাড়ার অন্যান্য মেয়েরা কেমন এ-ওর বাড়িতে যেত, ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াত, পিকনিক করত, সেইসব আমার জীবনে কখনও হয়ে ওঠেনি। এর জন্য আমার অন্তরে ক্ষোভের শেষ ছিল না।

বাবা-মা দুজনেই আমাকে খুব ভালবাসতেন। আবার শাসনও করতেন। তবে কিনা বাবাকে আমি খুব একটা বেশি পেতাম না। তার কারণ বাবা সকাল করে অফিস যেতেন আর অনেক রাতে বাড়ি ফিরতেন। রবিবারও বাড়ি থাকতেন না বেশিক্ষণ। তাই মায়ের সঙ্গেই আমার স্নেহ-মমতার বন্ধনটা বেশ জোরালো হয়ে উঠেছিল।

আমার আরও একটা দুঃখ ছিল, আমার মামার বাড়ি থেকে কেউ আসতেন না বলে। কেন যে আসতেন না তা প্রথম প্রথম বুঝতে না পারলেও পরে বুঝতে পেরেছিলাম। এ ব্যাপারে মাকে জিজ্ঞেস করেও কোনও সদুত্তর পেতাম না। আসলে ব্যাপারটা হল কি আমার মা-বাবা বাড়ির সকলের অমতে বিয়ে করেছিলেন। আমার মামার বাড়ির ওরা ছিলেন মস্ত বড়লোক। আর আমার বাবা ছিলেন পুরোপুরি মধ্যবিত্ত। তবে আমার বাবা কিন্তু আমার মাকে খুব যত্নেই রেখেছিলেন। তাঁর কোনও সাধ-আহ্লাদই অপূর্ণ রাখেননি আমার বাবা। কিন্তু এই সুখ আমার মায়ের কপালে বেশিদিন সইল না। মা আমাদের ছেড়ে একদিন চলেই গেলেন।

সে দিনটা ছিল কনকনে শীতের দিন। সেদিনই শীতকালীন ছুটির পর আমার স্কুল খুলবে। আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি। স্কুলে যেতে যাতে দেরি না হয় তাই তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠেছি। মা-ও সকাল সকাল উঠে স্টোভে চায়ের জল চাপিয়েছেন। বাবা গিয়েছিলেন পাঁউরুটি আর মাখন আনতে। আমরা টোস্ট খেয়ে চা খাব তাই।

বাড়িতে তখন আমি মা আর আমাদের কাজের মেয়েটা ছিল। আমি দাঁত

মেজে মুখ ধুয়ে পড়ার ঘরে গিয়ে পড়তে বসেছিলাম। হঠাৎ মা'র চিৎকারে সচকিত হলাম। প্রথমে ভাবলাম মা নিশ্চয়ই ইঁদুর বা আরশোলা দেখেছেন। কেননা এগুলো দেখলে মা খুব ভয় পেতেন, ছুটোছুটি করতেন এবং চেঁচাতেন। কিন্তু সেইসঙ্গে আমাদের কাজের মেয়েটাও চেঁচিয়ে উঠতে আমি পড়া ফেলে গেলাম রান্নাঘরে। গিয়ে দেখি না মায়ের শাড়িতে আগুন লেগে দাউ দাউ করে জ্বলছে।

আমি তখনই আমার গায়ের চাদরটা খুলে মায়ের গায়ে জড়িয়ে দিলাম। ভাগ্যক্রমে তাতেই আগুনটা একেবারেই নিভে গেল। এদিকে হইচই শুনে পাড়ার সমস্ত লোকজন ছুটে এসেছে আমাদের বাড়িতে। সবাই তখন মাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কেউ আমাকে সামলাতে লাগল। এমন সময় বাবা এসে সব দেখেশুনেই তো কপাল চাপড়াতে লাগলেন। এই মুহূর্তে কী যে করবেন তিনি তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না।

পাড়ার ছেলেরা ততক্ষণে অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিয়েছে।

একটু পরেই অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল।

আমাদের পাড়ার ডাক্তারবাবুও খবর পেয়ে এসেছেন তখন। মাকে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন।

বাবা পাড়ার ছেলেদের সঙ্গেই মাকে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে চলে গেলেন নার্সিংহোমে।

আমি দুহাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলাম। আমার স্কুলে যাওয়া মাথায় উঠে গেল। আমাদের পাড়ার এক বৌদি আমাকে কোলে করে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে খবর পেয়ে আমার মামার বাড়ি থেকে আমার ছোটমামা আর আমার এক মাসির মেয়ে বেবিদি এলেন। বেবিদি ছিলেন রূপে লক্ষ্মী আর গুণে সরস্বতী। মামার বাড়ির সঙ্গে এমনিতে আমাদের সম্পর্ক ভাল না থাকলেও পথে-ঘাটে দেখা হলে সবাই আমাকে খুব আদর করত।

যাই হোক, ওরা এসে পাশের বাড়ি থেকে আমাকে নিয়ে নার্সিংহোমে গেলেন মাকে দেখতে।

নার্সিংহোমে গিয়েও তো আমি দারুণ কান্নাকাটি করতে লাগলাম মা'র জন্য। আমার এই এতটুকু ছোট্ট জীবনে মা'ই যে আমার সব। মা ছাড়া আমি বাঁচব কেমন করে? নার্সিংহোমে গেলাম বটে, তবে কিনা আমার শত

কান্নাকাটিতেও ডাক্তারবাবু ও নার্সরা আমাকে একবারের জন্যও আমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে দিলেন না। বললেন, 'তিনদিন না গেলে দেখা হবে না। কেননা, মায়ের অবস্থা নাকি খুবই খারাপ।'

এই কথা শুনে আমি আরও কাঁদতে লাগলাম।

আমার ছোটমামা, বেবিদি আমাকে কত সান্ত্বনা দিতে লাগলেন কিন্তু তাতে কি আমার কান্না থামে। সেই যে আমার জীবনে প্রথম কান্নার শুরু। আমার মন বলতে লাগল, মা আর কখনওই ভাল হয়ে ঘরে ফিরবেন না।

এদিকে বাবার দিকেও আর তাকানো যায় না। বাবাকে দেখে মনে হতে লাগল বাবা যেন পাথর হয়ে গেছেন।

আমার ছোটমামা বাবাকে রাজি করিয়ে আমায় নিয়ে আমার মামার বাড়িতে চলে গেলেন। যাবার পথে মামা কোথায় যেন নেমে গেলেন, আমি বেবিদির সঙ্গে চলে গেলাম মামার বাড়ি। সেখানে গিয়ে দেখি আমার মাসি, অর্থাৎ বেবিদির মা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন আমাদের আসার পথের দিকে চেয়ে। আমরা যেতেই আমার মায়ের নাম করেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। শুধু মাসি নয়। আমার দাদু দিদিমা সবাই কাঁদতে লাগলেন।

সেদিন থেকে মামার বাড়িতেই রয়ে গেলাম আমি। কিন্তু মুশকিল হল মামিকে নিয়ে। উনি ছিলেন অত্যন্ত গরিব ঘরের মেয়ে। বিয়ের পর বড়লোক শ্বশুরবাড়ি পেয়ে অহঙ্কার আর দেমাকে পা পড়ত না তাঁর। আমাকে উনি একদমই সহ্য করতে পারতেন না।

যাই হোক, এখানে থেকে সবার আদরে ও মামির অনাদরে আমার দিন কাটতে লাগল। সামনে আমার পরীক্ষা। তাই রোজই স্কুলে যেতে লাগলাম। কেউ না কেউ আমাকে স্কুলে দিয়ে আসত নিয়ে আসত।

তিনদিনের দিন স্কুল থেকে ফিরে বেবিদির সঙ্গে নার্সিংহোমে মাকে দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম নার্সিংহোমের বাইরে বাবা চুপচাপ এক জায়গায় বসে আছেন। আমাদের দেখেই বাবা বললেন, 'মা আগের চেয়ে একটু ভাল আছেন।'

মা'র ভাল থাকার কথা শুনে কী আনন্দ যে হল তা বলে বোঝাতে পারব না। মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

বেবিদির সঙ্গে দোতলায় উঠে বড় নার্স-এর কাউন্টার পেরিয়ে মা'র ঘরে

গেলাম। গিয়ে দেখলাম মা চুপ করে শুয়ে আছেন। একজন নার্স বসে আছেন মায়ের মাথার কাছে। মা আমাকে ও বেবিদিকে দেখে কেঁদে ফেললেন। মাকে কাঁদতে দেখে আমিও কাঁদতে লাগলাম।

বেবিদি কোনওরকমে আমাদের দুজনকেই চুপ করালেন।

আমি মা'র কাছে যাবার জন্য ছটফট করছিলাম। কিন্তু নার্স আমাকে মা'ব কাছে যেতেই দিলেন না। একটু পরেই বললেন, 'আর দ্যাখা করা যাবে না। সময় হয়ে গেছে। এবার ফিরে যেতে হবে।'

অতএব কী আর করা যায়? বাবার কাছে নীচেই নেমে এলাম। এসে দেখি আমাদের পাড়ার কয়েকজন এসেছেন মায়ের খোঁজখবর নিতে। আসলে আমার মাকে তো সবাই ভালবাসতেন। তার ওপর একটু কর্তব্যবোধের ব্যাপারও আছে।

আমাদের পাড়ার সেই বউদি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে, কেমন দেখলি মাকে?'

বললাম, 'ভাল।'

তারপর বাবার কাছে গেলাম। দেখে মনে হল আমার বাবার মতো অসহায় বুঝি এ জগতে আর কেউ নেই। এই তিনদিনে বাবার যা অবস্থা হয়েছে তা চোখে দেখা যায় না। নাওয়া-খাওয়া সবই বোধ হয় ত্যাগ করেছেন বাবা। আমি বললাম, 'বাবা, তুমি খাওয়া-দাওয়া কোথায় করছ?'

বাবা সেই বউদিকে দেখিয়ে বললেন, 'ওদেরই বাড়িতে। আমার এই বিপদের দিনে ওরা খুব করছে রে।'

আমি বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'বাবা, মা বাঁচবেন তো?'

বাবা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই বাঁচবেন। বাঁচবেন বলেই তো ঠিক সময়মতো তুই তোর চাদরটা চাপা দিয়ে ওর গায়ের আগুনটা নিভিয়ে দিতে পেরেছিলি। তা ছাড়া ডাক্তারবাবু তো বললেন, অন্যদিনের চেয়ে অনেক ভাল আছে আজ। মাস দুয়েকের মধ্যেই সেরে উঠবে।' বলে বললেন, 'তুই কিন্তু এ নিয়ে বেশি মন খারাপ করিস না। পরীক্ষাটা ভাল করে দে, কেমন?'

আমি বললাম, 'আচ্ছা।'

বেবিদি এসে তখন আবার আমার হাত ধরলেন। বললেন, 'মা ঠিকই ভাল হয়ে উঠবে। এখন বাড়ি চল তো দেখি। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

অগত্যা বেবিদির সঙ্গে বাড়ি ফিরে এলাম।

মা'র কী হবে না হবে কিছুই জানি না। তবুও মা ভাল আছেন শুনে মনে একটু জোর পেলাম। পরদিন থেকে মন দিয়ে পড়াশোনা করতে লাগলাম। স্কুল যেতে লাগলাম। এইভাবে আমার জীবনের স্রোত অন্যগতিতে বইতে লাগল। মা রইলেন নার্সিংহোমে, বাবা রইলেন বাড়িতে, আমি রইলাম মামার বাড়ি। অথচ কী সুখের, কী আনন্দের জীবনই না ছিল আমার।

এখনকার জীবন হল ধরাবাঁধা রুটিনমাফিক। সকালে ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট সেরে পড়তে বসা, তারপরে স্কুল যাওয়া, স্কুল থেকে ফিরে চুপচাপ ঘরে থাকা, এর ওপর মামির দুর্ব্যবহার যেন মনকে আমার বিষিয়ে দিল। এখানে আমার একটুও ভাল লাগে না আর। অথচ আমি নিরুপায়। কত অসহায় আমি।

মায়ের কাছে তারপর থেকে আর যাওয়া হয়নি।

বাবাও আসেন না আর।

বেবিদির কাছ থেকে মায়ের খবর নিতাম।

বেবিদিরাও একসময় তাঁদের নিজেদের বাড়ি চলে গেলেন। আর কদিনই বা এখানে থাকবেন তাঁরা? বেবিদিরও তো এটা মামার বাড়ি। মায়ের খবর শুনেই এখানে এসে ছিলেন কদিন। তবে এ বাড়ি থেকে চলে গেলেও বেবিদি মাঝে মাঝেই এসে আমাকে আমার মায়ের খবর দিতেন।

যাই হোক, এইভাবেই আমার দিন কাটে।

এইভাবে ডামাডোলের মধ্য দিয়ে আমার বার্ষিক পরীক্ষাও শেষ হল।

পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ করে ঠাণ্ডা লেগে জ্বরে পড়লাম আমি।

শুনে বাবা এলেন আমায় দেখতে। আমার গায়ে হাত দিয়ে তাপ পরীক্ষা করে বললেন, 'চল তোকে একবার তোর ডাক্তারকাকুর কাছে নিয়ে যাই।'

ডাক্তারকাকু আমাদের পাড়ারই। বরাবরই আমাকে দেখে আসছেন। অনেকদিন বাদে নিজেদের পাড়ায় যাবার আনন্দে মনটা নেচে উঠল। বাবাকে বললাম, 'বাবা, অনেকদিন মাকে দেখিনি। আজ একবার মাকে দেখিয়ে আনবে?'

বাবা বললেন, 'বেশ তো চল। আগে নার্সিংহোমে গিয়ে পরে বরং

ডাক্তারকাকুর ওখানে যাব। তোর মা কালই তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল। বলছিল, ও পড়াশোনা ঠিকমতো করছে কিনা, পরীক্ষা কেমন দিল, এইসব।'

মাকে দেখতে যাবো, সেই আনন্দে মন আমার নেচে উঠল। তাই জ্বরের কষ্ট ভুলে বাবার সঙ্গে নার্সিংহোমেই আগে গেলাম। গিয়েই শুনি মায়ের অবস্থা হঠাৎ খুব খারাপের দিকে।

বাবাও বেশ ঘাবড়ে গেলেন। বললেন, 'সেকী! কালও তো ভাল ছিল। কত কথা বলল।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'এইসব পেসেন্টদের আজকাল বলে কিছু নেই। কখন যে কী হয় তা কেউ বলতে পারে না।'

আমার চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। অস্থির হয়ে উঠল মন। দূর থেকেই দেখলাম মা'র অক্সিজেন চলছে। চোখ ঘোলাটে হয়ে গেছে। আমার কেন জানি না মনে হল মা আর বাঁচবেন না। আমি ছুটে গিয়ে ডাক্তারবাবুর পা দুটি জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, 'আমার মাকে আপনি যেভাবেই হোক বাঁচিয়ে দিন ডাক্তারবাবু। এ জগতে মা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। বাবা তো সারাদিন অফিসেই থাকবেন। কিন্তু মা...।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমরা তো চেষ্টার ত্রুটি করছি না মামণি। ভগবানকে ডাকো, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। কাউকে রাখা না রাখা সবই তাঁর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। আমরা তাঁকে স্মরণ করে অসুস্থ মানুষকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করি মাত্র।'

মনটাকে একটু সংযত করে বাবার সঙ্গে গেলাম আমার জ্বরের জন্য আমাদের পাড়ার ডাক্তারকাকুর কাছে ওষুধ নিতে। উনি বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই। সামান্য সর্দি-জ্বর। একটু সাবধানে থেকো। ঠাণ্ডা লাগিও না।'

ওষুধ খেয়ে ওষুধ নিয়ে বাবার সঙ্গে একটা ট্যাক্সি করে আবার এলাম নার্সিংহোমে। ট্যাক্সিতে ওঠার পর থেকেই আমার মনটা যেন কেমন করছিল। উত্তেজনা বাড়ছিল। ফিরে গিয়ে মাকে আবার কেমন দেখব না দেখব সেইজন্য।

যাই হোক, ট্যাক্সি থেকে নেমে নার্সিংহোমের দোতলায় উঠেই দেখি মা'র ঘরে একটা চাপা উত্তেজনা।

ডাক্তারবাবু ও নার্সরা ছুটোছুটি করছেন।

আমার কান্না আমি আর চেপে রাখতে পারলাম না। আমার বুকের

ভেতরটা যেন ফেটে যেতে লাগল। আমি কেঁদে বললাম, 'মা! মা গো! আমায় এইভাবে ফেলে রেখে তুমি চলে যেও না মা। তুমি ছাড়া আমাকে আদর-যত্ন করবার, আমাকে দেখবার কেউ নেই।'

আমার সেই কান্না মা শুনতে পেলেন না। কী করেই বা শুনবেন? তিনি কি তখন তাঁর মধ্যে আছেন? কেঁদে কেঁদে ভগবানকে বললাম, 'হে ভগবান! এ তোমার কেমন বিচার? আমি একটু বড়ো হওয়া পর্যন্ত আমার মাকে তুমি বাঁচিয়ে রাখতে পারলে না?'

বাবাও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মা'র ঘরে ঢুকে মা'র অবস্থাটা দেখতে গেলেন। ডাক্তারবাবু ও নার্সরা বাবাকেও ঢুকতে দিলেন না ঘরে। বললেন 'পেসেন্টের অবস্থা এখন আমাদের নাগালের বাইরে। বাইরে অপেক্ষা করুন। কোথাও যাবেন না।' বলে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আমরা ওয়েটিংরুমে বসে রইলাম।

একটু পরেই ডাক্তারবাবু এসে বললেন, 'নাঃ। বাঁচাতে পারলাম না।'

বাবা তখনই উল্টে পড়ে যাচ্ছিলেন। ডাক্তারবাবু ও নার্সরা সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেললেন বাবাকে। বললেন, 'এই অবস্থায় এত ভেঙে পড়লে চলে? বাচ্চা মেয়েটাকে মানুষ করতে হবে। কত দায়িত্ব আপনার। মনকে শক্ত করুন।'

আমার মধ্যে তখন আমি নেই। ওই মর্মান্তিক খবর শুনেই মনে হল আমার চোখের সামনে পৃথিবীটা যেন বনবন করে ঘুরছে। পায়ের নীচে ভূমি কাঁপছে। সত্যসত্যই ভূমিকম্প হচ্ছে কী?

এরই মধ্যে ডাক্তারবাবু ও নার্সরা বাবাকে ও আমাকে ধরাধরি করে নীচে নামালেন।

বাবা তখন কোনওরকমে টলতে টলতে ফোন করলেন মামার বাড়িতে। মাসির ওখানে। বেবিদিকে ফোনে বললেন, 'সব শেষ হয়ে গেল রে! তোরা আয়।'

একটু পরেই মামার বাড়ি থেকে, মাসির ওখান থেকে গাড়ি নিয়ে সবাই এসে হাজির হলেন।

ইতিমধ্যে ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য রোগীদের আত্মীয়রা বাবাকে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন।

বেবিদি আসতেই বাবা ডুকরে কেঁদে বললেন, 'সব শেষ হয়ে গেল রে বেবি, সব শেষ হয়ে গেল।'

আমিও কেঁদে বেবিদিকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'আমার মা নেই। এখন আমি কার কাছে থাকব বেবিদি?'

মাসি, বেবিদি আমাকে আদর করে বুকে জড়িয়ে বললেন, 'কেন, তুই আমাদের কাছে থাকবি।'

ততক্ষণ খবর পেয়ে আমাদের পাড়া থেকেও দেখলাম সবাই এসেছে।

নার্সিংহোমের ডাক্তারবাবু এসে আমার মামাকে বললেন, 'আজ আর কিছু করবার দরকার নেই। ডেডবডি আমরা রেখে দিচ্ছি। যা করবার কাল করবেন। তার আগে আপনারা বরং দুটো ধূপকাঠি ওঁর ঘরে জ্বালিয়ে দিয়ে আসুন।

ডাক্তারবাবুর কথামতো মামার বাড়ির ওরা তাই করলেন।

রাত এগারোটা। আমরা সবাই বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়ি মানে মামার বাড়ি। বাবা চলে গেলেন পাড়ার লোকেদের সঙ্গে আমাদের নিজেদের বাড়িতেই।

সেই কালরাত্রিও অবসান হল একসময়। মায়ের শোকে সারারাত কেঁদে কেঁদে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়লাম আমি।

পরদিন ভোর হতেই লোকজন সব এসে গেল। আমার মাকে নতুন শাড়ি পরিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে ফুল বিছানো খাটে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হল শ্মশানে। চির প্রণম্য অগ্নির চিতায় শুয়ে মা আমার ধোঁয়ার কুণ্ডলি হয়ে স্বর্গারোহণ করলেন।

আমার সুখ, শান্তি, ভালবাসা, সবকিছুরই সমাধি হয়ে গেল।

এইভাবেই দিন যায়। বাবা যেন পাগলের মতো হয়ে উঠলেন। মায়ের ওই ব্যাপারটায় প্রচুর দেনা হয়ে গিয়েছিল বাবার। মামার বাড়ির ওরা এই ব্যাপারে বাবাকে একটুও সাহায্য করলেন না।

এদিকে দাদু-দিদিমার শরীরের অবস্থাও ক্রমশই খারাপ হতে লাগল। সেইসঙ্গে বাড়তে লাগল দজ্জাল মামির আমার প্রতি অকথ্য অত্যাচার।

বাবা মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে আসতেন। আমি বাবার কাছে কেঁদে কেটে আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা বলতাম। একদিন আমার কান্না দেখে বাবা বললেন, 'তুই যে বড্ড ছেলেমানুষ মা। তোকে পালন করবে কে? আমি সকাল নটার মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবো, ফিরব রাত

এগারোটায়। সারাটাদিন তুই কী করে কী করবি? তুই একা আছিস জানলে বাড়িতে চোর-ডাকাত ঢুকবে যে?'

আমি বলতাম, 'তা হলে তুমি আমাকে দ্যাখাশোনার জন্য একটা কাজের মেয়ে ঠিক করো।'

বাবা ম্লান হেসে বললেন, 'কাজের মেয়ে চাইলেই কি পাওয়া যায়? যে ছিল সেও তো ও ঘটনার পর কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। একটু বয়স্কা তেমন কাউকে যদি পাই তো এসে নিয়ে যাবো তোকে। তা ছাড়া তোর মায়ের ভাল ভাল শাড়ি-গয়না সব যদি কাজের অছিলায় এসে চুরি করে নিয়ে যায় কাজের লোকেরা, তখন?'

অতএব আমার আর যাওয়া হয় না। দুর্গতিরও শেষ থাকে না।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন দাদু মারা গেলেন।

তারপরই যা হল তা বোধ হয় সভ্যযুগ বলেই সম্ভব। দাদুর শোকে দিদিমা আছাড় কাছাড় করে কাঁদলে মামি তাঁকে কী মুখই না করতেন। হাত-মুখ নেড়ে মস্ত হাঁ করে রাক্ষসীর মতো তেড়ে আসতেন।

মামি পরের মেয়ে। তাঁকে দোষ দেবো না। মামাও সবকিছু দেখেও না দেখার ভান করতেন।

এরপর হল কি, মামা একদিন একটা গাড়ি ডেকে দিদিমাকে রেখে এলেন কোথায় যেন এক বৃদ্ধাবাসে। সেদিন দিদিমার সে কী কান্না! বললেন, 'তুই আমাকে সত্যি সত্যি বউয়ের কথা শুনে আমার স্বামীর ভিটে থেকে তাড়িয়ে দিলি? তোর প্রাণে কি একটুও মায়া-দয়া নেই?'

মামা বললেন, 'তোমার ভালর জন্যই এই কাজ করতে হল মা। বাবা-মাকে বাড়ি থেকে তাড়ানো যায়, কিন্তু বউকে তো তাড়ানো যায় না। ওর বাবা, মা, ভাই, দাদারা তা হলে কোর্টে কেস করে বধূ নির্যাতনের মামলা দায়ের করে আমাকে জেলে পুরবে। খোরপোষ আদায় করবে। কিন্তু বাবা-মা'র ক্ষেত্রে ওইরকম কোনও আইন নেই। যদি কখনও শ্বশুর-শাশুড়ি নির্যাতনের জন্য বধূ অপরাধীকে শাস্তি দেবার কোনও আইন হয়, তখনই তুমি ঘরে ফিরবে। অতএব আমি নিরুপায়। তুমি হলে আমার জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমাকে ক্ষমা করো মা।'

দিদিমা কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিলেন।

আমিও কাঁদলাম কত।

মামি দূর থেকে মুখ ভেংচে আমাকে তিরস্কারের ভঙ্গিতে বললেন, 'এঃ আবার কান্না। যেন কতদিনের আপনজন। জন্মে ইস্তক ভিটে মাড়ায়নি। এখন মাকে চিবিয়ে খেয়ে আমার ঘর জ্বালাতে এসেছে। এই পাপ ভিটেয় ঢোকার পর থেকে আমার সংসারের সুখ-শান্তি সব গেল। সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেল আমার।' বলে বললেন, 'এবার তোরও ব্যবস্থা করছি দাঁড়া। বাপ গেলেই ঢং করে কাঁদতে বসা বের করছি; দূর হয়ে যা এখান থেকে। যে চুলোয় যে আছে সেখানে যা।'

এই ঘটনার ঠিক একদিন পরেই বেবিদি এলেন। আমি বেবিদিকে সব বলে হাতে-পায়ে ধরে কান্নাকাটি করলাম। বললাম, 'আমায় তুমি তোমার কাছে নিয়ে চলো বেবিদি। এখানে আমি একদণ্ডও থাকতে পারছি না। এখানে থাকলে আমি মরে যাবো।'

কথাটা বোধ হয় মামির কানে গেল। বললেন, 'তুই মরবি? আমরা এক এক করে সবাই মরব কিন্তু তুই বেঁচে থাকবি। বেরো তুই এখান থেকে। বেরো বলছি।'

অগত্যা বেবিদি আমার বাবাকে ডাকিয়ে এনে সব কথা বলে আমাকে ওদের বাড়ি নিয়ে গেলেন।

ওখানে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মুশকিল হল ওদের বাড়ি থেকে আমার স্কুলে যাওয়া আসার। স্কুল ওখান থেকে অনেক দূরে। তাই এই কষ্টটা বাবাকেই করতে হত। বেবিদি মাঝে মধ্যে যেতেন।

এইভাবে প্রায় মাসছয়েক কেটে যাওয়ার পর একদিন বেবিদির বিয়ে হয়ে গেল। কী সুন্দর দেখতে জামাইবাবুকে। আমার খুব ভাল লেগে গেল।

বেবিদির বিয়ের পর আমি নিজেকে খুবই একা একা বোধ করতে লাগলাম। মা চলে গেলেন। বাবা থেকেও নেই। বেবিদির কাছেই যা আদর-যত্ন পেতাম আমি। সেই বেবিদিও বিয়ের পর একেবারে জামশেদপুরে চলে গেলেন।

রইলেন শুধু মাসিমা আর মেসোমশাই। তা আমি একবার এমন একটা বেঁফাস কথা বলে ফেলেছিলাম, যার ফলে ওঁরাও আমার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠলেন। আমি বলেছিলাম, 'মাসিমা, মামা না হয় মামির পাল্লায় পড়ে বৃদ্ধা মা'টাকে বৃদ্ধাবাসে দিয়ে এলেন কিন্তু মেয়ে হিসেবে তোমারও কি কোনও

কর্তব্য নেই? তুমিও তো তোমার মাকে নিজের কাছে নিয়ে এসে রাখতে পারো।'

মাসিমা বললেন, 'মানুষ বুড়ো হয়ে গেলে তাদের প্রত্যেককে সংসারের কোলাহলের বাইরে রাখাই ভাল। বৃদ্ধাবাসগুলো তো সেইজন্যই তৈরি হয়েছে। তোর মামা ঠিক কাজই করেছে। তা ছাড়া বাড়িতে বুড়োবুড়ি পোষার ঝক্কি যে কত তার তুই কী বুঝবি?'

মাসির এই কথা শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। হায় ভগবান! একী ভাষা মুখ দিয়ে বেরোলো মাসির? বুড়োবুড়ি পোষার? বাবা, মা, বুড়ো বয়সের এঁরা গৃহপালিত পশু নাকি? এরপরও আকাশে চন্দ্র-সূর্য ওঠে?

সত্যই ওঠে। দিন হয়, রাত হয়। প্রকৃতিও আপন নিয়মে চলে। আমারও চোখের জলের শেষ হয় না। একে আমার ভূতের ভয় খুব। তবু আমাকে আলাদা একটা ঘরে শুতে হয়।

এমন সময় হঠাৎ একদিন মাসি আমাকে বললেন, 'এতদিনে তোর দুঃখের অবসান হল রে। অনেক চেষ্টার পর তোর মেসো তোকে একটা বালিকা আশ্রমে রেখে আসবে ঠিক করেছে। ওখানে তুই সুখে থাকবি। ওরাই তোকে লেখাপড়া শেখাবে। পালন করবে। কত ভাল হবে বল তো?'

আমি বললাম, 'মাসি, আমি কোথাও যাবো না। আমি তোমার কাছেই থাকব। আমার বড় ভয় করছে।'

'ভয় কি মা? তোর যাতে ভাল হয় তাই তো করছি আমরা। তোর দিদা যদি বৃদ্ধাশ্রমে থাকতে পারে, তুই তা হলে বালিকা আশ্রমে কেন থাকতে পারবি না? মাঝে মাঝে আমরা গিয়ে তোকে দেখে আসব।'

আমি কেঁদে বললাম, 'না। তোমরা কেউ আমাকে দেখতে যাবে না। দিদাকে তো একবারের জন্যও কেউ তোমরা দেখতে যাও না? দিদার বুঝি মন খারাপ করে না তোমাদের জন্য? তার চেয়ে এখন থেকে আমি আমার বাবার কাছেই থাকব।'

মাসি বললেন, 'তা হলে তোর বাবার সঙ্গে কথা বলে দ্যাখ। কেননা তোর বাবার সঙ্গে আলোচনা করেই তো আমরা বালিকাশ্রমের ব্যবস্থাটা করেছিলাম।'

আমার পায়ের তলা থেকে পৃথিবীটা যেন দুলে উঠল। বাবার সঙ্গে

আলোচনা করে? বাবা রাজি হলেন এই ব্যাপারে? তাই কি বাবা কম আসেন? আর কম আসেন বলেই তো আমার অর্ধেক দিন স্কুল যাওয়া হয়ে ওঠে না। আমি দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলাম।

মাসি বললেন, 'শোন, এই বয়সে যার মা যায় তার সব যায়। তোর নাম সাগর। নোনাজলই যে তোর একমাত্র সম্বল মা। তোকে এখন অনেক কাঁদতে হবে। বাড়ি গিয়েও তুই সুখে থাকতে পারবি না। ওখানেও তুই দুঃখ পাবি।'

আমি জেদ করে বললাম, 'তবুও আমি বাড়িই যাবো। বাবার কাছেই থাকবো আমি। বাবা অফিস চলে গেলে পাশের বাড়ির বৌদির কাছে থাকবো আমি।'

মাসি হেসে বললেন, 'বেশ। তা হলে যা ভাল বুঝিস তাই কর।'

দিনদুই বাদেই বাবা এলেন। ইতিমধ্যে আমার পরপর পাঁচদিন স্কুল কামাই হয়ে গেছে।

যাই হোক, সব শুনে বাবা বললেন, 'তবে তাই হোক। ওকে তা হলে নিয়েই যাই। না হলে এখানে থেকে ওর পড়াশোনারও ক্ষতি হচ্ছে। আমিও নিয়মিত আসতে পারছি না।' বলে আমাকে বললেন, 'তুই বালিকা আশ্রমে যেতে পারতিস রে। কত মেয়ে ওইসব জায়গায় থেকে মানুষ হয়।'

আমি বললাম, 'তা হোক। আমি মাকে হারিয়েছি। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না বাবা।'

বাবা আর কোনও কথা না বলে মাসির বাড়িতে আমার যা কিছু ছিল সব গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি চলে এলেন।

বাড়িতে এসে দরজায় কড়া নাড়তেই এক ভদ্রমহিলা দরজা খুলে দিলেন। হাসিখুশি ভরা কী মিষ্টি তাঁর মুখখানি।

বাবা বললেন, 'নে পেন্নাম কর। ইনি তোর নতুন মা। এখন থেকে তোর সব ভার উনিই নেবেন।'

আমার মধ্যে তখন আমি নেই। নতুন মায়ের পরনে আমার মায়ের শাড়ি। নতুন মায়ের গায়ে আমার মায়ের গয়না। আমি যেন পাথর হয়ে গেলাম। এইজন্যই কি বাবা আমাকে বালিকা আশ্রমে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন?

আমি নতুন মা'কে প্রণাম করলাম। নতুন মা আমাকে বুকে জড়িয়ে অনেক আদরে কোলে তুলে নিলেন।

চোখের জলে আমার বুক ভেসে যাচ্ছে তখন। সে জলের স্বাদ মিষ্টি নয়। আমি যে সাগর। সাগরিকা। সাগরের সব জলই তো নোনা। নতুন মায়ের অনেক আদর সত্ত্বেও বাবাকে বললাম, 'তুমি আমাকে বালিকা আশ্রমেই পাঠিয়ে দিও বাবা। ওখানে যেতে আমি আর না করব না।'

বাবা বললেন, 'অনেক ভেবেচিন্তে আমি তো সেই ব্যবস্থাই করেছিলাম মা তোর। আমার মনে হয় ওখানেই তুই ভাল থাকবি।'

আমি আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে মায়ের বাঁধানো ছবিটা বুকে নিয়ে কাঁদতে লাগলাম, 'মা! আমার মা! আমাকে তুমি যত তাড়াতাড়ি পারো তোমার কাছে টেনে নাও মা। এভাবে বেঁচে থাকতে আর যে আমি পারছি না।'

আমার মা ছবির ভেতর থেকেও কাঁদলেন কিনা আমি তা দেখতে পেলাম না।

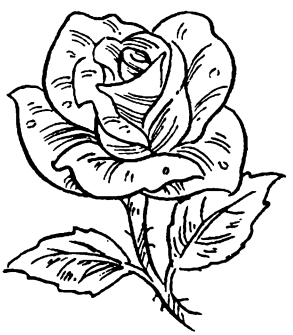

রাজবাড়ির রহস্য

আজিমগঞ্জের কাছে গঙ্গার ধারে সেকালের একটি রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ কিছুকাল আগে পর্যন্ত দেখা যেত। আমরা একবার পুজোর ছুটির পর সেই রাজবাড়ি দেখতে আজিমগঞ্জে গেলাম। ওখানে অজয় নামে আমাদের এক বন্ধু থাকত। তাদেরই বাড়িতে উঠলাম। অজয় ওর দিদির বাড়ি কাসুন্দিয়ায় প্রায়ই আসত। তখনই আলাপ ওর সঙ্গে। সেই সূত্র ধরেই যাওয়া। ওই ভগ্ন রাজপ্রাসাদ সম্বন্ধে অনেক রহস্যময় কাহিনীও শুনেছি ওর মুখে। তার কিছু বিশ্বাস করেছি। কিছু করিনি। সে কারণেই জেদের বশে ওখানে যাওয়া।

সঙ্গী আমরা চারজন। মদন, গোপাল, শ্রীকান্ত ও আমি। প্রথমে আমরা

নলহাটিতে গেলাম। গোপালের মামার বাড়ি সেখানে। দু-দিন ওর মামার বাড়িতে থেকে ওখান থেকেই একটা প্যাসেঞ্জার গাড়িতে চেপে আজিমগঞ্জ।

আজিমগঞ্জে যেখানে আমরা ছিলাম, সেখান থেকে গঙ্গা বেশ কিছুটা দূরে। আর সেই রাজবাড়িটা ছিল আরও দূরে। সেটা যে কতকালের তা কে জানে। দোতলা বাড়ি ভেঙেচুরে পলেস্তারা খসে একশা। চারদিক জঙ্গলে ভর্তি। দিনমানেই সেখানে যেতে ভয় হয়। রাতে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।

এক সুন্দর বিকেলে আমরা সেই ভাঙা রাজবাড়ি দেখতে গেলাম। গঙ্গার ধারে বসে দূর থেকেই তাকিয়ে রইলাম বাড়িটার দিকে।

মদন বলল—ওই বাড়িতে নিশ্চয়ই রাতের বেলা ভূতের উপদ্রব হয়?

অজয় বলল—কী যে হয় তা কে জানে? তবে বাড়িটা রহস্যময়। কেন-না আজ পর্যন্ত সন্ধ্যের পর ওই বাড়িতে ঢুকে কেউ ফিরে আসেনি।

গোপাল বলল—ভারী অদ্ভুত তো। ভূত থাকলে ভয় দেখাবে। মানুষ গুম করবে কেন?

শ্রীকান্ত বলল—আমার মনে হয় ওর ভিতরে কোনো কাপালিকের আস্তানা আছে। কেউ গেলে তাকে দেবীর কাছে বলি দিয়ে তার লাশ গঙ্গায় ফেলে দেয়।

আমি বললাম—নির্ঘাত এটা একটা হানাবাড়ি। ওর মধ্যে আছে কোনো দুষ্টচক্রের ঘাঁটি। কেউ গিয়ে পড়লে তাকে ওরা বরাবরের মতো সরিয়েই দেয়। যাতে সে ফিরে এসে ওদের সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলতে না পারে।

অজয় বলল—জানি না ভাই। পরপর কয়েকজন মানুষ নিখোঁজ হওয়ার কারণে কেউ আর ওর ভিতরে গিয়ে দেখতে চায় না ওখানে কী আছে না আছে। পোড়ো ভাঙা বাড়িতে ভূতের উপদ্রব হয়েই থাকে। আমরা অনেক সময় সারারাত জেগে পাহারা দিয়ে লক্ষ্যও করেছি, ওখানে কোনো আলোটালো জ্বলে কি না তা দেখবার জন্য। কিন্তু না ওখানে কোনো আলো জ্বলে, না কোনো অলৌকিক ব্যাপারস্যাপার চোখে পড়ে। কিছুই হয় না। এমনকি কোনো নাচ-গানের শব্দও ভেসে আসে না ওই বাড়ির ভিতর থেকে।

আমি বললাম—ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। আর সে কারণেই ও বাড়ির রহস্য উন্মোচন না করে আমরা যাব না।

অজয় বলল—মৃত্যু অবধারিত জেনেও ওখানে যাবি?

—অবশ্যই।

—কিন্তু ধর, যদি তোরা ওই বাড়িতে ঢুকে অন্যদের মতো আর ফিরে না আসিস, তখন আমার কী অবস্থা হবে?

—কিছুই হবে না। আমরা একটা কাগজে সব কথা লিখে রেখে তবেই ওই বাড়িতে ঢুকব।

অজয় আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর গঙ্গার শোভা-সৌন্দর্য দেখাতে দেখাতে নিয়ে চলল সম্পূর্ণ অন্য দিকে।

আমরা সন্ধ্যে পর্যন্ত গঙ্গার তীরে ঘোরাফেরা করার পর ওদের বাড়িতে এলাম। সে রাতে ওই বাড়ির রহস্যোদ্ধারে কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় তাই নিয়ে জোর আলোচনায় মেতে উঠলাম।

পরদিন সকালে আমরা আবার এলাম সেই বাড়ির কাছে।

শ্রীকান্ত বলল—আচ্ছা, এই বাড়িতে ঢুকে যারা নিখোঁজ হয়, তারা ফিরে না এলে কেউ তাদের খোঁজখবর নেয় না?

—নেয় বই-কি। পরদিন দলবদ্ধভাবে সবাই গিয়ে তাদের অস্তিত্বও টের পায় না।

—যারা খোঁজ নিতে যায়, তারা ফিরে আসে?

—সবাই ফিরে আসে।

গোপাল বলল—নিখোঁজ হতে যারা যায়, তারা কখন যায়? দিনে না রাতে?

—রাতেই যায়। এবং রহস্যটা এখানেই। দিনদুপুরে ভয় নেই কিন্তু যত বিপদ রাতের অন্ধকারেই।

আমি বললাম—তার মানেই রাতে ওখানে এমন কারও আবির্ভাব হয় যার দৌরাত্ম্যেই ওখানে কেউ গেলে সে আর ফিরে আসে না।

—এবং এটা হচ্ছে অনেক দিন থেকেই। প্রায় দশ-বারোজন মানুষ নিখোঁজ হবার পর আর কেউ যায় না বাড়িতে।

—এই যদি হয় তোরা সবাই একজোট হয়ে ওই বাড়ির সামনেকার জঙ্গল সাফ করে বাড়িটাকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছিস না কেন?

—ও তো এক-আধজনের কাজ নয়। তা ছাড়া গ্রামের মানুষরা নানারকম সংস্কারে ভোগে। তাই কার এত দায় পড়েছে ওসব করতে যাবার?

আমরা সব শুনে স্থির করলাম আজকের রাত্রিটা যাক। কাল সকালে দিনের আলোয় একবার বাড়িটাকে ভালো করে দেখে রাতেই অভিযান শুরু করব। তবে একসঙ্গে সবাই যাব না। এক-একজন ঢুকে অবস্থাটা কী তা বাড়ির ভিতর থেকেই হেঁকে জানাব।

এই ঠিক করে পরদিন সকালে আমরা গঙ্গায় বেড়াতে যাবার নাম করে ওই বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। জঙ্গল সেখানে এত ঘন যে বাড়ির ভিতরে ঢোকবার পথই খুঁজে পেলাম না। যেহেতু কেউ ওখানে আসে না। তাই কারও পদচিহ্ন নেই। অর্থাৎ বোঝাই গেল কোনো বদলোকের যাতায়াত নেই এখানে।

যাই হোক, অতি কষ্টে আমরা বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। অবশ্যই খুব সতর্ক পদক্ষেপে। কেননা এখানকার গর্তে দেয়ালের ফাটলে বিষাক্ত সাপ থাকাও বিচিত্র কিছু নয়। ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। দামি কাঠের জানালা দরজা ভেঙেচুরে কাত হয়ে পড়ে আছে। কেউ খুলেও নেয়নি। এখানকার মানুষজন খুব সৎ বলতে হবে। বাড়ির ভিতরে আশেপাশে কোনো নিখোঁজ মানুষের কঙ্কালও চোখে পড়ল না।

সব দেখেশুনে মদন বলল—আসলে নিখোঁজদের ঘটনা কাল্পনিক। পাছে এই ভাঙা বাড়িতে রাতদুপুরে কেউ কোনো অপকীর্তি করতে আসে—তাই এই রটনা।

আমি বললাম—সত্য-মিথ্যার প্রমাণ আজ রাতেই হয়ে যাবে।

তাই শুধু রাতের জন্যই প্রতীক্ষা।

আমরা প্রতেকে একটা করে টর্চ নিয়ে সন্ধ্যের পর সেই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। অজয়কেও সঙ্গে নিলাম। তবে ও গোড়াতেই বলে দিল—তোরা যা করিস করবি, আমি কিন্তু ভুলেও ওই বাড়ির ভিতর ঢুকছি না।

আমি বললাম—না। কোনো নৈশ অভিযানই কোনো ভীরু কাপুরুষের জন্য নয়। তা ছাড়া এই বাড়ির ব্যাপারে তোদের যখন আতঙ্ক আছে, তখন আমরা কেউই চাইব না অযথা বিপদ বাড়াতে তুই ওই বাড়িতে ঢুকিস। আমরাও এক-একজন যাব, দেখব, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফিরে আসব। একজন ভিতরে গিয়ে ডাক দিলে তবেই এক-এক করে যাব আমরা।

অজয় বলল—তাহলে সত্যিই যাবি তোরা? এখনও কিন্তু সময় আছে ফিরে আসবার। না হলে এই যাওয়াই তোদের শেষ যাওয়া হবে।

আমরা কর্ণপাতও করলাম না অজয়ের কথায়। আত্মরক্ষার জন্য একটা করে ছুরি আর টর্চ নিয়ে ভিতরে ঢোকার প্রস্তুতি নিলাম।

মদন বেশি আগ্রহী। তাই ওই প্রথমে ঢুকল। ও বাড়ির ভিতরে ঢুকে চারদিক দেখে দোতলার বারান্দায় উঠে টর্চের আলোয় আমাদের সংকেত দেবে অথবা নাম ধরে ডাকবে—এমনই কথা হল।

আমরা বাড়ির বাইরে নিরাপদ দূরত্বে থেকে ওর যাওয়া, বাড়ির ভিতরে ঢোকা সবই লক্ষ্য করতে লাগলাম। কিন্তু সেই যে গেল, ওর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। প্রায় ঘণ্টাখানেক পার হয়ে যাওয়ার পরও যখন ওর কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না, তখন আমরাই ওর নাম ধরে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু না, ওর দিক থেকে কোনো প্রত্যুত্তর ভেসে এল না।

গোপাল বলল—আসলে ও একটা সাসপেন্স ক্রিয়েট করতে চাইছে।

শ্রীকান্ত বলল—এটা কিন্তু ঠিক নয়। ওর তো বোঝা উচিত, আমরা এখানে রহস্য উদ্ধারে এসেছি।

অজয় বলল—তোরা যা ভাবছিস তা কিন্তু নয়। আর সকলের মতো মদনও বরাবরের জন্য চলে গেল। এখন ওর মা-বাবার কাছে গিয়ে কী কৈফিয়ত দিবি সেটাই চিন্তা কর।

গোপাল বলল—চালাকি বার করছি ওর । কিচ্ছু হয়নি। শুধু শুধু লুকিয়ে থেকে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। বলেই টর্চ হাতে হন হন করে এগিয়ে গেল সে।

আমি বললাম—তুই যেন আবার ওর মতো করিস না। গিয়েই ওর ঘাড়ে একটা রদ্দা দিয়ে আমাদের ডাকবি।

গোপাল বলল—তোরা রেডি থাক। আমি ডাকলেই যাবি তোরা।

গোপাল দুর্দান্ত সাহস নিয়ে ঝোপঝাড় পার হয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল।

অজয়ের চোখে-মুখে আতঙ্ক।

আমাদের কৌতূহল। মদন ভিতরে ঢুকে কেন সাড়াশব্দ করল না? তবে কি ওই পরিত্যক্ত বাড়ি সত্যি রহস্যময়? কিন্তু গোপাল এত দেরি করছে কেন? ও তো রসিকতা করবার ছেলে নয়।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গেল। ওরও কোনো সাড়াশব্দ নেই।

এবার দারুণ একটা দুশ্চিন্তার মেঘ মনের আকাশ ছেয়ে ফেলল আমাদের।

শ্রীকান্তর মুখ শুকিয়ে গেল। বলল—আর-কোনো পরীক্ষানিরীক্ষা নয়, পালাই চল। এটা ভূতুড়ে বাড়ি। এই বাড়ি সম্বন্ধে যা যা প্রবাদ তার সবই সত্যি। এই মুহূর্তে আমরা এখানকার থানায় গিয়ে ব্যাপারটা জানাই। নাহলে সবাই আমাদের অন্যরকম সন্দেহ করবে।

ভয় আমিও কম পেলাম না। সত্যি যদি ছেলে দুটো ওই বাড়ির রহস্যের অন্ধকারে হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সমূহ বিপদ আমাদেরও। ওদের মা-বাবা আত্মীয়-স্বজনরা আমাদের সহজে ছাড়বে না। তাই ভেবে দেখলাম কোনো কিছু করার আগে আমরাই একবার ওই বাড়িতে ঢুকে ব্যাপারটা কী তা দেখে আসা উচিত। এই ভেবে অজয় ও শ্রীকান্তকে রেখে ছুরি আর টর্চ সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম আমি।

অজয় বলল—না। তোদের দুজনের একজনকেও আর ওই বাড়িতে যেতে দেব না আমি।

শ্রীকান্ত বলল—আমিও তাই বলি। সর্বনাশের চরম যা হবার তো হয়েই গেছে। তাহলে আবার কেন বিপদকে বরণ করতে যাওয়া? ওই বাড়ির ব্যাপারে যা রটনা তার সত্যাসত্যর প্রমাণ তো হয়েই গেছে।

আমি দৃপ্তকণ্ঠে বললাম—জানি। এখান থেকে ফিরে গিয়ে ওদের বাবা-মাকে এ মুখ আর দেখাতে পারব না। তাই আমিও যাতে ওদের মতো বিলীন হয়ে যাই সেই আশাতেই যাচ্ছি। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি ফিরে না এলে তোরা ফিরে যাস। পারলে কাল সকালে লোকজন নিয়ে একবার ঢুকে দেখিস ওই বাড়ির ভিতর আমাদের কারও কোনো হদিস পাস কি না।

অজয় ও শ্রীকান্ত করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি টর্চের আলোয় পথ দেখে হনহন করে সেই বাড়ির দিকে এগিয়ে চললাম।

বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ার আগে এক অজানা আতঙ্কে কেঁপে উঠল বুকের ভিতরটা। হঠাৎই মনে হল টর্চ না জ্বেলেই এর ভিতরে প্রবেশ করা উচিত।

কেন না সত্যিই যদি কোনো দুষ্টচক্রের ফাঁদ কিছু পাতা থাকে এর ভিতরে, তাহলে আলো দেখে তারা সতর্ক হয়ে যাবে।

আমি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে পা টিপে টিপে এগোতে লাগলাম। এই মুহূর্তে আমার সাপের ভয়টাই বেশি হতে লাগল। কিন্তু মদন, গোপাল ওরা গেল কোথায়? ওরা এখানে নেই কেন? তবে কি এই পোড়ো বাড়িতে কেউ ওদের গুম করেছে? হঠাৎই মনে হল ভারী কিছু একটা যেন ক্রমশ বুকে হেঁটে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। ডানদিক, বাঁ-দিক সব দিক থেকেই আসছে। আমি সব ভুলে শুধুমাত্র প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে ছুটে কয়েক ধাপ সিঁড়ির ওপরে উঠে এলাম। হঠাৎই একটা ঝটাপটি শব্দে মনে হল এভাবে এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। তাই সিঁড়ি বেয়ে আরও ওপরের দিকে উঠতে গেলাম। ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। মনে হল কে যেন আমার পা ধরে টান দিল। সেই সঙ্গে মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। আমি তখন আমার মধ্যে নেই। সিঁড়ি বেয়ে দালান বেয়ে ঝোপ-জঙ্গল বেয়ে নেমেই চলেছি। আমি নিজের থেকে নামছি না। কোনো কিছুতেই আমাকে টেনে নামিয়ে নিচ্ছে। একসময় দুর্গন্ধযুক্ত একটি কাদায় পাঁকে ভরাখালের মধ্যে এসে পড়লাম।

পা কামড়ে কোনো কিছুতে আমাকে ওপর দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। হাতের টর্চ সিঁড়িতে পড়ে যাওয়ার সময়ই খসে গেছে। বাঁ-হাতে ছুরিটা ছিল। একমাত্র এটাই আমার আত্মরক্ষার উপায়। ছুরিটা কোনরকমে ডান হাতে নিয়ে সংগ্রামের জন্য তৈরি হলাম। একজনের গ্রাস থেকে আমাকে ছিনিয়ে নেবার জন্য ওই রকম আরও কয়েকটা ধেয়ে আসছে আমার দিকে। বিশাল খেজুর গাছের গুঁড়ির মতো চেহারার অতিকায় কুমিরের দল।

আমি জানতাম কুমিরের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা ওদের চোখ। সকল জীবজন্তুরই। বিশেষ করে চোখে আঘাত পেলে কুমির শিকার ভুলে যায়। তাই প্রাণ বাঁচানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে কুমিরের গলাটা জড়িয়ে ছুরিটা ওর চোখের ওপর চালিয়ে দিলাম। এক আঘাতেই কাত। কুমিরটা আমার পা ছেড়ে বিরাট একটা ঝটকা মেরে কাদায় পাঁকে তলিয়ে গেল। ভাগ্য ভালো যে একটা বিশাল বট গাছের ঝুরি সেই খালের ওপর ঝুঁকে ছিল। আমি তারই একটা ঝুরি বেয়ে গাছে উঠে প্রাণ বাঁচালাম।

সে রাতে আর গাছ থেকে নামতে সাহস হল না। পরদিন সকালে

কোনরকমে জঙ্গল পার হয়ে বাইরে আসতেই দেখি অজয় ও শ্রীকান্ত অনেকে লোকজন নিয়ে আমাদের সন্ধানে আসছে। আমাকে দেখেই 'ওই তো, ওই তো' করে ছুটে এল ওরা। তারপর আমার মুখে সব শুনেই অবাক।

এখানকার হাসপাতালের সুচিকিৎসায় কিছুদিনের মধ্যেই আমার পায়ের ঘা সেরে গেল। দূর হল পোড়া বাড়ির রহস্য। আতঙ্কের কারণ জানা গেল। শুধু ভেবে পেলাম না এখানে এসে নিষেধ অমান্য করে দুই বন্ধুকে খুইয়ে বাড়ি ফিরে সকলের কাছে মুখ দেখাব কী করে।

ঝরা বকুলের ওরা

চারাবাগান বস্তিরই দুটি ছেলেমেয়ে। ফনা আর ফিনকি। একেবারেই হতদরিদ্র ঘরের সন্তান। ফনার বাবা আছে, মা নেই। ফিনকির মা আছে, বাবা নেই। দিনরাত টো টো করে ঘুরে বেড়ায় ওরা। কখনও কারও বাড়ির রকে, কখনও জলার মাঠে পড়ে থাকে। রাস্তার কুকুরগুলোকে নিয়ে হুটোপাটি করে। এইভাবে মানুষ হয় ওরা।

ফনার বাবা ঘরামির কাজ করে। হাতে যে কটা টাকা-পয়সা পায় তা নেশাভাঙ করেই উড়িয়ে দেয়। ঘরে তেল থাকে তো নুন থাকে না, তেল-নুন থাকে তো চাল-ডাল বলতে কিছুই থাকে না। যেদিন কিছু জুটল তো জুটল, না জুটল তো উপোস। ছেলেটা এর-ওর বাড়ি চেয়েচিন্তে খেয়ে পেটটা চালিয়ে নেয়। বাপের কিন্তু নজর নেই ছেলের দিকে।

ফিনকির অবস্থা অতটা খারাপ নয়। ওর মা এর-ওর বাড়ি বাসন মাজে।

একজনদের বাড়ি রান্নার কাজ করে। তাতেই কোনওরকমে চালিয়ে নেয় দিনগুলো। রান্নার কাজ করে যাদের বাড়িতে, তাদের গিন্নিমা খুবই ভাল। রোজই ভালমন্দ খাবার কিছু না কিছু ঠিক পাঠিয়ে দেন ফিনকির জন্য। তাই থেকে কিছু কিছু ফিনকি আবার ফনাকে ভাগও দেয়। ফনা ফিনকি দুজনেই প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। বাড়ির শাসন না থাকায় পড়াশুনাতে মন বসল না ওদের। পড়া পারত না। অঙ্ক পারত না। স্কুলে তাই বকুনি খেত। বকুনি আর মার খাবার ভয়ে স্কুলে যাওয়াই বন্ধ করে দিল ওরা। স্কুলে যাবার নাম করে খেলাধুলোয় সময় কাটাতো। এই করতে করতে স্কুলের পথই ভুলে গেল ওরা।

ফনার বাবা হঠাৎই একদিন বাজারের এক মেছুনিকে বিয়ে করে নিয়ে এল। তাকে ছিল যেমনই পেতনির মতো দেখতে, সে ছিল তেমনই খাণ্ডারনি। ফনাকে সে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। এক একসময় করত কি, ওর ভাতের থালায় ছাই ফেলে দিত। তা একদিন ফনার বাবা করল কি, বউয়ের কথা শুনে ফনাকে মেরে ধরে একটা চায়ের দোকানে কাজে লাগিয়ে দিলে। দোকানের মালিকের নাম বিষ্টু ঘোষ। লোকটার যেমনই ডাকাতের মতো চেহারা, তেমনই সে ছিল বদমেজাজি। কাজকর্মের একটু এদিক ওদিক হলেই কর্মচারীকে মারধর করত। তাই তার দোকানে কোনও লোক টিকত না। সেইজন্য সে করত কি একমাসের মাইনে হাতে রেখে মাইনে দিত। ফনা এসে পড়ল ওই কসাইয়ের পাল্লায়। লোকটা ওকে দিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করিয়ে নিত। শুধু দোকানের কাজকর্মই নয়, রেশন তোলা, তেলের লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে তেল নিয়ে আসা, সব। ওইটুকু ছেলে পারবে কেন অত কাজ করতে? বিনিময়ে দু'বেলা অবশ্য খেতে পেত, তবে মাইনের টাকা যা পেত, তা গিয়ে পড়ত ওর বাবার হাতে। কিছুদিন কাজ করার পর ফনা তাই হাঁফিয়ে উঠল। তার ওপর কাজে এতটুকু ঢিলেমি দেখলেই শুরু হত মারধর।

সেদিন ছিল রবিবার।

পাড়ার একদল বখাটে ছেলে এসে হাজির হল ওদের দোকানে। এসেই চায়ের অর্ডার দিয়ে শুরু করল খবরের কাগজ নিয়ে টানাটানি।

বিষ্টু ঘোষ এদের কাছেই জব্দ। এরা চায়ের পর চা খায়। এক দু'ঘণ্টা দোকানের

চেয়ার বেঞ্চ আটকে রাখে। আর যাবার সময় 'পরে দেবো' বলে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে যায়। বিষ্টু ঘোষ একটি কথাও বলতে পারে না। একবারের জায়গায় দু'বার তাগাদ করলে তেড়ে মারতে আসে ওরা। এমনকি বেশি ঝামেলা করলে দোকান উঠিয়ে দেবে বলেও শাসায়।

খবরের কাগজ পড়তে পড়তেই ওরা দু'দলে ভাগ হয়ে গেল। একদল আর একদলের নেতাদের খারাপ ভাষায় গালাগালি করতে লাগল। পাড়ার রাস্তাঘাট, আলো জ্বলা, সব নিয়েই আলোচনা সমালোচনা করতে লাগল। তারপর কোনও একজনের মধ্যস্থতায় ওই প্রসঙ্গে একটু মিটমাট হলে শুরু হল আসন্ন কালীপুজোর চাঁদা ওঠানোর ব্যাপার নিয়ে তুমুল তর্কযুদ্ধ। একদল রোড কালেশনের দিকে নজর দিল। কীভাবে নিজেরা পেছনে থেকে অল্পবয়সী ছেলেদের লেলিয়ে দিয়ে গাড়ি থামিয়ে চাঁদা ওঠানো যায় সেই আলোচনা করতে লাগলো। আর একদল মধ্যবিত্ত গৃহস্থের প্রতি ভীতি সঞ্চার করে কীভাবে চাঁদা ওঠানো যায় তার পরিকল্পনা করতে লাগল। দু'দলের ভেতর থেকে হঠাৎ করেই একটা তৃতীয় দল গজিয়ে উঠল। তারা বলল, 'ওই সবের দরকার নেই। চাঁদা তুলব ডাঁটের মাথায়। আমরা ভিখারির বাচ্চা নাকি? চাঁদা চাইতে যাবার সময় দলে কমপক্ষেও তিরিশ চল্লিশজনকে থাকতে হবে। এতজনকে দেখলে সাধারণত গেরস্থ ভয়ে কুত্তার মতো কুঁই কুঁই করবে। আমরা ডাঁটের মাথায় বিল নিয়ে এগিয়ে যাবো। পাঁচশো এক টাকা আমাদের দাবি থাকলে পঞ্চাশ একশো টাকা অনায়াসে বের করে দেবে বাছাধনরা। দিয়ে গোরুর মতো নিশ্বাস ফেলবে।' আর একদল বলল, 'অত সস্তা নাকি, যা বলব তাই দিতে হবে। না হলে মেরে তক্তা করে দেবো।'

এমন সময় হঠাৎই শীর্ণকায় একটি ছেলের জামার কলার ধরে কে যেন একজন টানতে টানতে নিয়ে এল দোকানের সামনে। তাকে দেখেই মারমুখী হয়ে উঠল সকলে। কিল চড় ঘুসি বাগিয়ে ছুটে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে চা নিয়ে এসে পড়েছিল ফনা। ফলে একজনের হাতের ধাক্কায় প্লেটে সাজানো সবকটি চায়ের কাপই কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়ে ভেঙে দু'চার টুকরো হয়ে গেল।

আর যায় কোথা! এতক্ষণ এইসব যুবকদের বেয়াদপি দেখে মনে মনে ফুঁসছিল বিষ্টু। এইবার ওর যত রাগ গিয়ে পড়ল ফনার ওপর। মুখে অশ্রাব্য

ভাষায় গালাগালি করে একটা লাঠি নিয়ে ওর দিকে তেড়ে যেতেই ফনা বুঝল এই পিশাচের হাত থেকে আজ আর রেহাই নেই ওর। যতগুলো কাপ ও ভেঙেছে, ওর পাঁজরের ততগুলো হাড় না ভেঙে ছাড়বে না এই শয়তান। তাই মারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রাণপণে ছুটল বড় রাস্তার দিকে।

বিষ্টুও ষাঁড়ের মতো গতর নিয়ে ছুটল।

হঠাৎই অঘটন। একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি রাস্তা ফাঁকা পেয়ে জোর গতিতে আসছিল সেই পথ দিয়ে। ফনা কোনওরকমে রক্ষা পেলেও বিষ্টু ঘোষ একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গাড়ির মুখে। ফলে যা হবার তা হয়ে গেল। ট্যাক্সিটা বিষ্টু ঘোষকে চাপা দিয়ে উধাও হয়ে গেল চোখের পলকে।

মুহূর্তে 'গেল গেল' রব তুলে অনেক লোকজন জড়ো হয়ে গেল সেখানে। বিষ্টু ঘোষের মুখ দিয়ে তখন গল গল করে রক্ত বেরোচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণায় দলা পাকিয়ে গেছে দেহটা। ওই অবস্থাতেই ওর চোখেমুখে জল দিতে লাগল সবাই। তারপর অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল এইসব করার আগেই সব শেষ। অসুরের মতো বিষ্টু ঘোষের চেহারাটা স্থির হয়ে গেল একসময়।

এমন মৃত্যু ফনা এর আগে আর কখনও দেখেনি। তাই সে দু'হাতে চোখ ঢেকে একজনদের একটি গ্যারেজ ঘরে এসে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল গঙ্গার দিকে। বয়সে ছেলেমানুষ হলেও ওরই কারণে যে বিষ্টুকে ওইভাবে মরতে হয়েছে তা বোঝবার মতো জ্ঞান তো ওর হয়েছে। তাই নিজেকে দারুণ অপরাধী বলে মনে হল ওর। বিষ্টুর বউ ছেলেমেয়েরা যখন শুনবে ফনাকে মারতে গিয়েই বিষ্টুর ওই অবস্থা হয়েছে, তখন ওরাও কি ওকে দেখলে জুতোপেটা করবে না? ফনার চোখে তাই জল এল। অথচ বিষ্টু ঘোষ ওর দিকে যে ভাবে তেড়ে এসেছিল, তাতে ও পালিয়ে না গেলে হাড়গোড়গুলোও আস্ত থাকত না ওর।

ফনা যখন বিষণ্ণ বদনে ছলছল চোখে গঙ্গার দিকে যাচ্ছে, তখনই দেখতে পেল ফিনকিকে। ফিনকি তখন বস্তির কয়েকজন লোকের সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে গঙ্গার দিক থেকে আসছে।

ফিনকিকে দেখেই ছুটে গেল ফনা। দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে বলল, 'কী হয়েছে রে ফিনকি? তুই এ পথে কেন?'

ফিনকি ফনাকে দেখেই কেঁদে উঠল। অতি কষ্টে কান্না ধরা গলায় বলল, 'আমার মা।'

'কী হয়েছে তোর মায়ের?'

'কেন, তুই জানিস না?'

'না।'

'হঠাৎ খুব জ্বর হয়ে কাল রাত্তিরে মারা গেছে মা। আমার আর কেউ রইল না রে। আমি এখন কী করব? কোথায় যাব?'

ফিনকির দুঃখে ফনার চোখেও জল এল। ফিনকির মাকে দাহ করে যারা আসছিল তাদেরই একজন বলল, 'তুই ওই বিষ্টু ঘোষের চায়ের দোকানে কাজে লেগেছিস না?'

ফনা ভয়ে ভয়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

'তা তুই এখানে কী করছিস?'

'কিছু না।'

'এদিকে কোথায় যাচ্ছিস তুই?'

'গঙ্গার ঘাটে।'

ফিনকি বলল, 'তুই গঙ্গার ঘাটে যাচ্ছিস, বিষ্টু ঘোষ জানে?'

ফনা বলল, 'না।'

'তা হলে তোকে বকবে না?'

'ও আর কোনওদিনই কাউকে কিছু বলবে না। মারবে না। ওর দফা শেষ।'

অন্যেরা বলল, 'তার মানে?'

'বিষ্টু ঘোষ একটু আগে মোটরগাড়ি চাপা পড়ে মরে গেছে।'

চমকে উঠল সকলে, 'সেকী! কী করে?'

ফনা তখন ভয়ে ভয়েই সব কথা খুলে বলল ওদের। বলেই কেঁদে ফেলল।

ফিনকি বলল, 'তুই কাঁদছিস কেন? তুই বরং বেঁচে গেলি ওই পিশাচের হাত থেকে। তোকে মারবার জন্য না গেলে তো ও গাড়িচাপা পড়ত না। এখন তুই কী করবি তা হলে?'

'জানি না রে।'

ফিনকিকে নিয়ে বস্তির লোকেরা চলে গেল। আর ফনা হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওদের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে। ও আর ফিনকি এখন একই

পথের পথিক। ফিনকির যেমন এ জগতে কেউই আর রইল না। ওরও তেমন বাবা সৎমা থাকা সত্ত্বেও কেউ নেই। বাবা যদিও দেয় তো সৎমা তাকে ঘরে ঢুকতেই দেবে না।

ফনা রামকৃষ্ণপুর ঘাটে যেখানে অনেক লোকজন স্নান করছিল, সেখানে এসে ঘাটের সিঁড়িতে বসল। বসে বসে গঙ্গায় স্টিমার, লঞ্চ ও নৌকোর চলাচল দেখল। দেখতে দেখতে বেলাও বেড়ে চলল। সকাল থেকেই কিছুই তো পেটে পড়েনি ওর। তাই খিদেয় পেট ছিঁড়ে যেতে লাগল ওর।

নিরুপায় ফনা তখন হাত পাতল লোকের কাছে। যেখানে যত স্নানার্থী ছিল সবার কাছে হাত পেতে ভিক্ষে চাইল। ফনার বয়স তো বেশি নয়। মাত্র তেরো বছর। এই বয়সের ছেলে ভিক্ষার জন্য করুণ চোখে চেয়ে হাত পাতলে অনেকেরই দয়া হয়। তাই দু'একজন বাদে অনেকেই কিছু না কিছু দিয়ে সাহায্য করল ওকে।

অবাক কাণ্ড। দেখতে দেখতে সতেরো টাকার মতো রোজগার হয়ে গেল ওর। কী আনন্দ। ও সেই টাকা নিয়ে সোজা চলে এল হাওড়া ময়দানে। এখানে বঙ্গবাসী সিনেমার কাছে কয়েকটা সস্তার হোটেল আছে। সেখানে মাত্র সাত টাকায় পেট ভরে ভাত খেল। ওর তো ক্ষুদে পেট। একবার যা পেল তাতেই হয়ে গেল ওর। ভাত ডাল ভাজা একটা তরকারি। আর কী চাই ওর?

ভাত খেয়ে সারাটা দুপুর ও শুয়ে রইল ডালমিয়া পার্কের কংক্রিট গ্যালারির নীচে। এখন কার্তিক মাস। গরমের দাপট তাই খুব একটা নেই। শুয়ে এক ঘুম দিয়ে ও যখন উঠে বসল তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল।

বাড়ি ফেরার নামগন্ধও করল না ও। কেননা ওর জন্য বিষ্টুবাবুর ওই অবস্থা হয়েছে জানতে পারলে বাবা আর সৎমা ওকে আস্ত রাখবে না। তাই চুপচাপ বসে বসে কী করা যায় ভাবতে লাগল।

হঠাৎই মনে পড়ল ফিনকির কথা। ওর মা-টা যে মরে গেল এখন ও করবে কী? কে ওকে খেতে দেবে? থাকবেই বা কোথায়? ওই নোংরা বস্তিতে পঁচিশ টাকা ঘর ভাড়া দেবার মতো টাকাই বা ও পাবে কোথায়? অথচ যা ওখানকার ব্যাপার, ঘড় ভাড়া দিতে না পারলে দালাল মাসি এসে লাথি মেরে ঘর থেকে বার করে দেবে ওকে। আর দালাল মাসির মুখের

ওপরে কথা বলার সাহস কারও নেই। কেননা খোদ কুবের চক্রবর্তী মশাই দালাল মাসির প্রধান রক্ষক। কুবের চক্রবর্তী বিষ্টু ঘোষের চেয়েও শয়তান। অনেকে বলে চারাবাগানের বস্তিটা আসলে ওরই। দালাল মাসিকে দিয়ে কাজ করায়। তা সে যাই হোক, অনেক ভেবেচিন্তে ফনা ঠিক করল রাত্রিবেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ও চুপি চুপি গিয়ে দেখা করবে ফিনকির সঙ্গে। ফনার তো কোনও আশ্রয় নেই। তাই আজ ফিনকির সঙ্গেই ওদের ঘরে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেবে ও।

দুপুরে খাওয়াটা বেশ জুতসই হয়েছিল ফনার। কতদিন এমন ভরপেট খাওয়া পায়নি ও। তার ওপর বিনা পরিশ্রমে শুধু হাত পেতেই মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যে সতেরোটা টাকা রোজগার। একী ভাবা যায়? অথচ বিষ্টু ঘোষের ওখানে কী কঠোর পরিশ্রমটাই না করতে হত ওকে।

রাত্রিবেলা ডালমিয়া পার্ক থেকে বেরিয়ে আসার সময় হঠাৎই ওর একটা সিনেমা দেখতে ইচ্ছে করল। বঙ্গবাসীতে একটা সিনেমা হচ্ছিল, আলিবাবা ও চল্লিশ চোর। ও সবচেয়ে কমদামি একটা টিকিট কেটে সেই ছবিটাই দেখতে বসে গেল। নাইট শো'র ছবি। ভাঙল রাত বারোটায়। ছবি দেখে পায়ে পায়ে ও এগিয়ে চলল চারাবাগান বস্তির দিকে।

বিষ্টু ঘোষকে এতক্ষণে নিশ্চয়ই পোড়ানো হয়ে গেছে। আপদের শান্তি। এখন ও স্বাধীন। এর-ওর বাড়ি থেকে দু'একটা প্যান্ট জামা চেয়েচিন্তে পরবে। আর ভিক্ষে করে পেট চালাবে। থাকার জন্য এর-ওর বাড়ির দোরগোড়া তো আছেই। অসহায় ফিনকিকেও যদি ও দলে টানতে পারে তা হলে তো কথাই নেই। দুজনে ভিক্ষে করেই ঘরের ভাড়া দিয়ে দেবে।

কিন্তু ফিনকিদের ঘরের কাছে এসেই অবাক হয়ে গেল ফনা। ছিটেবেড়ার ঘর। ঘরের দরজায় তালা দেওয়া। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। কেউ কোথাও নেই। ফিনকি তা হলে গেল কোথায়? ফিনকিকে না দেখে ফনার মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। এই রাতে ও কোথায় খুঁজবে ফিনকিকে? তাই বস্তির বাইরে একটি আটচালার নীচে এসে ও আশ্রয় নিল। রোজ সকালে এখানে বাজার বসে।

অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল ও।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সকাল হয়ে গেছে। ও আবার ফিনকিদের সেই

ঘরের কাছে এল। এসে দেখল এক করুণ দৃশ্য। ফিনকি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর সেই দজ্জাল মাসি ওদের ঘর থেকে টুকিটাকি মালপত্তর যা পাচ্ছে তাই টেনে বার করে বাইরে ফেলে দিচ্ছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে কুবের চক্রবর্তী।

ফনা ছুটে গিয়ে ফিনকির পাশে দাঁড়াল। বলল, 'কী হল ফিনকি, মাসি তোদের সব মালপত্তর বার করে দিচ্ছে কেন?'

ফিনকি কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমার যে মা মরে গেছে। আমি কি এই ঘরের ভাড়া দিতে পারব?'

ফনা বলল, 'কেন পারব না। তুই আমি দুজনে মিলে চেষ্টা করলে ঠিকই পারবো।'

মাসি হঠাৎ ফনাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'অ। তুই ছোঁড়াটা কাল সারাটাদিন কোথায় ছিলি রে? তোর বাপটা তোকে গোরু খোঁজা করল।'

ফনা বলল, 'তার আগে বলো, তুমি ফিনকিকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছ কেন?'

'বেশ করেছি। আমার ঘর, আমি যাকে ইচ্ছে ঘরে রাখব, যাকে ইচ্ছে ঘর থেকে বের করে দেবো। এখনই আমার নতুন ভাড়াটে আসবে। দূর হ তুই এখান থেকে।'

ফনা বলল, 'তোমার ওই পঁচিশ টাকা ভাড়া আমিই দিয়ে দেবো। ওই ঘরে তুমি আমাদের থাকতে দাও মাসি।'

মাসি বলল, 'তুই দিবি পঁচিশ টাকা ভাড়া? পঁচিশটা পয়সা কীরকম তা চোখে দেখেছিস কখনও?'

ফনা বলল, 'তুমি একমাস আমাদের থাকতে দাও, যদি ভাড়া দিতে না পারি তখন তাড়িয়ে দেবে।'

মাসি বলল, 'এখন আর এ ঘরের ভাড়া পঁচিশ টাকা নেই। পঞ্চাশ টাকা হয়ে গেছে।'

ফনা আর কিছু বলতে সাহস করল না। ফিনকিকে বলল, 'কাল রাতে তুই কোথায় ছিলি? আমি কত খুঁজলুম তোকে?'

'বেচুকাকার মা আমাকে ওদের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। ওখানেই ছিলাম কাল রাতে।'

ফনা বলল, 'আয় তুই আমার সঙ্গে। আমাদের ব্যবস্থা আমরাই করে নেবো।'

ফিনকি বলল, 'কী করে যাব? আমি যে বিক্রি হয়ে গেছি।'

'সে কী?'

'ওই কুবের চক্রবর্তী আমাকে নিয়ে যাবে। নিয়ে গিয়ে যারা আমাকে কিনেছে তাদের ওখানে পৌঁছে দেবে।'

ফনা বলল, 'মজা দেখাচ্ছি দাঁড়া। তুই আস্তে আস্তে গা ঢাকা দিয়ে বস্তির বাইরে শেতলা মন্দিরের পাশে গিয়ে দাঁড়া। আমি এদিকটা সামলাচ্ছি।

ফনার কথামতো ফিনকি পালাবার চেষ্টা করতেই কুবের এসে পথ আগলালো ওর। বলল, 'কোথায় যাবি? দাঁড়া বলছি এখানে। আমার নজর এড়িয়ে পালানো এত সহজ নয়, বুঝলি?'

ফনা বলল, 'তুমি একটা পিশাচ। তাই টাকার লোভে পরের মেয়েকে তুমি বিক্রি করে দিচ্ছ। বস্তির লোকগুলো ভেড়া, তাই তোমার ভয়ে কেউ এগিয়ে আসছে না। আমি তোমাকে ভয় করি না। আজ রাতে এই বস্তিতে আমি আগুন লাগাবো, আর তোমার অবস্থা যা করব তা তুমি ভাবতেও পারবে না।'

এত লোকের সামনে এইটুকু একটা ছেলের মুখে এইরকম কথা শুনে কুবেরের মুখ লাল হয়ে উঠল। বলল, 'তবে রে!'

আস্ফালনের ওইখানেই শেষ। একটা মরচে ধরা পেরেক সাঁটা ফাটা বাঁশের একাংশ তুলে নিয়ে তাই দিয়ে ফনা আঘাত করল কুবেরের মুখে। পেরেক গাঁথল শয়তানের চোখে। বিকট চিৎকার করে কুবের লাফালাফি করতে লাগল সেখানে।

ততক্ষণে ছুট-ছুট-ছুট।

ফিনকির হাত ধরে ফনা একেবারে বড় রাস্তায়। ওদের পেছনে তখন হইহই করে বস্তির লোকগুলো ছুটে আসছিল। ওরা কোনওদিকে না তাকিয়ে ছুটে এসে একটা বাসের হাতল ধরে ভেতরে ঢুকে পড়ল। বাসটা হাওড়ার ময়দানে আসতেই ওরা বাস থেকে নেমে পড়ে একটা দোকানে ঢুকে গরম গরম কচুরি, আর একটা করে মিষ্টি খেল।

ফিনকি বলল, 'তুই এত পয়সা পেলি কোত্থেকে রে?'

ফনা গর্বের সঙ্গে বলল, 'কারও চুরি করিনি রে ফিনকি। মেহনতের কামাই। অবশ্য বিনা মেহনতের।'

'তা হলে নিশ্চয়ই তুই ভিক্ষে করেছিস?'

'ঠিক তাই।'

'ভাল করিসনি। এর চেয়ে বিষ্টু ঘোষের দোকানের কাজটা তোর ভাল ছিল।'

'বুঝলাম। কিন্তু এখন তো এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। যতক্ষণ না বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু করতে পারি আমরা ততক্ষণ চেয়েচিন্তেই খাবো। পরে অবশ্য ভিক্ষে করা ছেড়ে দেবো।'

'এখন তা হলে আমরা থাকব কোথায়?'

'এখন আমরা রাস্তার ছেলেমেয়ে, রাস্তাতেই থাকব।'

'সেই ভাল। তা আমি বলি কি, এখানে থাকলে আমরা কিন্তু শান্তিতে থাকতে পারব না। কেননা কুবেরের লোকেরা ঠিক আমাদের খুঁজে বার করবে। পথের ধারে ফুটপাতে কোথাও ঘুমিয়ে থাকলে ওরা আমাদের গলা টিপে মারবে।'

ফনা বলল, 'এটা তুই মন্দ বলিসনি রে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে ওই বস্তির ঘরে আগুন না দিয়ে তো আমি এখান থেকে যাবো না।'

'কী হবে ওইসব করে? তা ছাড়া তুই যেভাবে শাসিয়ে এসেছিস, তাতে ওরা কিন্তু সতর্ক থাকবে।'

ফনা একটু কী যেন ভেবে বলল, 'অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে নেই। তোকে ওইভাবে ঘর থেকে বের করে দিচ্ছিল, বিক্রি করে দিচ্ছিল, অথচ কেউ কোনও প্রতিবাদও করছিল না। এর শাস্তি পেতেই হবে ওদের। আগুন লাগানোর ব্যাপারটা তুই আমার ওপরই ছেড়ে দে। ঘর পোড়া হয়ে ওরা বুঝুক আশ্রয় না থাকার জ্বালাটা কী রকম।'

'যা ভাল বুঝিস কর তবে।'

ওরা পায়ে পায়ে গঙ্গার দিকেই এগিয়ে চলল।

এবারে আর রামকৃষ্ণপুর ঘাটে নয়, তেলকল ঘাট। এখানে স্নানার্থীরা বেশিরভাগই অবাঙালি।

ফনা ফিনকিকে এক জায়গায় বসিয়ে রেখে শুরু করল ওর কাজ।

একবারে জাত ভিখিরির মতো চেহারা তো নয় ওর। তাই ওকে দেখে মায়াদয়া হল অনেকের। কারও কাছে হাত পেতে বিফল হতে হল না ওকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর হাতে পঞ্চাশ টাকার মতো এসে গেল। অভিভূত ফনা আর ভিক্ষা না চেয়ে ছুটে এল ফিনকির কাছে। এসেই অবাক। দেখল ফিনকি কয়েকটা ফুলের মালা নিয়ে হেঁকে হেঁকে বিক্রি করছে। বিক্রি হচ্ছেও। যে কটি মালা ওব হাতে ছিল, সবই বিক্রি হয়ে গেল একসময়।

ফিনকির মালা বিক্রি হয়েছিল কুড়ি টাকায়। সেই টাকাটা ও ফনার হাতে দিয়ে বলল, 'এই নে। কারও কাছে হাত না পেতে এই হয়েছে।'

ফনা বলল, 'কিন্তু এ মালা তুই পেলি কোথায়?'

ফিনকি বলল, 'পাশের ওই শিবমন্দির থেকে জোগাড় করেছি। মন্দিরের পাশে পুজো করা ফুল মালা সব জড়ো করা ছিল। সেখান থেকে নিয়ে এসেছি ওগুলো।'

'তোর আচ্ছা বুদ্ধি তো।'

'এখন থেকে আমি রোজ ফুলই বেচব। তুইও তাই করবি। তা হলে কেউ আমাদের ভিখিরি বলবে না।'

ফনা বলল, 'না রে। ভিক্ষেয় বেশ লাভ আছে। এই দ্যাখ না পঞ্চাশ টাকা হয়ে গেছে আমার। এখন কিছুদিন এরকম না করলে আমাদের চলবে না।'

ফিনকি বলল, 'তুই খুব বোকা। এইভাবে লোকে একদিন দু'দিন দেবে। রোজ দেবে কেন? কিন্তু ফুল রোজই কিনবে।'

ফনা একটু কী যেন ভেবে বলল, 'তুই কথাটা কিন্তু ঠিকই বলেছিস। রোজ ভিক্ষে চাইলে চেনা মুখরা আর দেবে না। তা এইভাবে যে কদিন চলে চলুক। এখন আয় আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'যেখানে হোক। আমাদের তো ঠিকানা নেই। আমরা এখন রাস্তার ছেলেমেয়ে। যখন যেখানে ভাল বুঝব থেকে যাব।'

ওরা দুজনে ফরশোর রোড ধরে শিবপুর বাজারের দিকে এগোল।

এইখানে একটা দোকানে ওমলেট টোস্ট চা ইত্যাদি ব্যবস্থা দেখে ফনা বলল, 'ফিনকি তুই চা খাস?'

ফিনকি বলল, 'না রে। চায়ের তো অনেক দাম। মা তাই লোকের বাড়িতে খেত, আমাদের হত না। তাই খাই না।'

'আজ একটু খাবি?'

'যদি জিভ পুড়ে যায়?'

'চা খেলে আবার জিভ পুড়ে যায় নাকি?'

'একবার একজনদের বাড়িতে খেয়েছিলাম। গরম চা মুখে দিতেই জিভটা এমন পুড়ে গিয়েছিল যে কতদিন অন্য কিছু খেতে পারিনি। কিছু মুখে দিলেই জ্বালা করত।'

'বেশি গরম খেলে জিভ তো পুড়বেই। ঠিক আছে, তুই বরং ওমলেট খা, আমি ওমলেট চা দুটোই খাই।'

ওরা দোকানে ঢুকে বেশ একটা জুতসই দেখে জায়গা বেছে নিল।

দোকানদার এসে বাজখাঁই গলায় বলল, 'এই! তোদের কী চাই রে?'

ফনা বলল, 'আমাদের দুজনকে একটা করে ওমলেট আর আমাকে এক কাপ চা দাও।'

'পয়সা আছে? না ফোকোটিয়া?'

ফনা একগাদা খুচরো পয়সা, দু'-টাকার নোট ইত্যাদি বার করে দেখাল।

দোকানদার দেখে বলল, 'বোস তা হলে। শুধু ওমলেটের দাম দিবি। চায়ের দাম দিতে হবে না।' বলে এক প্লেট ঘুগনি আর দুটো চামচ নিয়ে এসে এগিয়ে দিল ওদের দিকে। বলল, 'ততক্ষণ এটা ভাগ করে খা দুজনে। এরও দাম দিতে হবে না, বুঝলি?'

ওরা তো খুব আনন্দ করেই খেতে লাগল।

দোকানদারের চেহারাটা দেখতে বা কণ্ঠস্বর বাজখাঁই হলেও ভেতরে দরদ আছে।

ওদের সামনের চেয়ারে ষণ্ডামার্কা একজন লোক ওদের দিকে পেছন হয়ে বসে টোস্টে কামড় দিয়ে চা খাচ্ছিল, কী বিচ্ছিরি দেখতে লোকটাকে। কারও দিকে তাকাচ্ছিল না। অবশ্য তাকিয়ে দেখার মতো আর কেউ ছিলও না সেখানে।

একটু পরেই বদখত চেহারার আরও একজন এসে হাজির হল সেখানে। এই লোকটার চোখের চাহনিই বলে দেয় ওর চেয়ে বদ বোধহয় আর কেউ হতেই পারে না। মুখ ভরা বসন্তের দাগ। তার ওপর মাকন্দ। দাড়ি গোঁফ এমনকি ভুরু পর্যন্ত নেই। অথচ আগের লোকটির চাপ দাড়ি মাথায় কদমছাঁট চুল।

আগের লোকটি বলল, 'তোর এত দেরি হল যে?'

'পুলিশের তাড়া খেয়ে শালিমার এক নং গেটের কাছে গা ঢাকা দিয়েছিলাম।'

'শোন, আজ রাতে কাজ আছে। রাত একটায়।'

'কোথায়?'

'বাতাইতলার কাছে, দশ নম্বর চাঁদু লেন। ঠিকানাটা নোট করে নে।'

বসন্তের দাগওয়ালা লোকটি সঙ্গে সঙ্গে ঠিকানাটা নোট করে নিল। বলল, 'কাজটা কী?'

'কাজটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। ডাকাতি এবং প্রয়োজনে খুনের ঝুঁকিও নিতে হতে পারে।'

'খুনের ঝুঁকিটা কি না নিলেই নয়?'

'ওটা যাতে না হয় সেই চেষ্টাই করতে হবে। মনে হয় ভদ্রমহিলাকে বাগে আনতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না। তবে গোলমাল করলেই...।'

'ভদ্রমহিলা! উনি কি একা থাকেন?'

'হ্যাঁ, মিসেস উমা যোশী। কয়েক মাস আগে ওঁর স্বামী রমেশ যোশী মারা গেছেন। কাঁচা ফিল্মের আমদানি রপ্তানির ব্যবসা ছিল ভদ্রলোকের। প্রচুর টাকার মালিক। ওদের বাড়ির কাজের মেয়েটাকে লোভ দেখিয়ে সব জেনে নিয়েছি আমি। রাত্রিবেলা দরজায় নক করলে মেয়েটাই দরজা খুলে দেবে। তারপর ভদ্রমহিলাকে কব্জা করে চলতে থাকবে অবাধ লুণ্ঠন। সঙ্গে থাকবে গোরা আর কালা। কাজের মেয়েটাই আমাদের দেখিয়ে দেবে কোথায় কী আছে না আছে।'

'মেয়েটিকে হাত করলি কী করে?'

'মুম্বাই নিয়ে গিয়ে হিন্দি সিনেমায় চান্স পাইয়ে দেবার টোপ দিয়ে।'

এরপর দুজনেই চুপ।

একটু পরেই ওদের জন্য টোস্ট ও চা এল।

ফনা ফিনকির জন্য এল অমলেট ও চা।

ওরা তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগল।

দুষ্কৃতিরা উঠে গেল একটু পরেই।

ফদা ফিনকিকে বলল, 'কী বুঝলি?'

ফিনকি বলল, 'উঃ কী সাংঘাতিক ওরা।'

'এখন আমাদের উচিত ওই মহিলার জীবন রক্ষা করা।'

'কী করে কী করবি?'

'আমরা এখনই গিয়ে ওঁকে জানিয়ে দেবো সব কথা। ওঁর বাড়ির ঠিকানা যখন জেনে গেছি, তখন বাড়ি খুঁজতে কোনও অসুবিধাই হবে না।'

ওরা আর একটুও দেরি না করে খাবারের দাম দিয়ে পথে নামল। কোথায় বাতাইতলা, কোথায় চাঁদু লেন, কিছুই জানে না ওরা। তাই পথচারিদের জিজ্ঞেস করেই একসময় বাতাইতলায় পৌঁছল ওরা। তারপর ঠিকানা খুঁজে নির্দিষ্ট সেই বাড়িতে।

বাড়ি তো নয়, যেন স্টুডিও। ছোট্টখাট্টো দোতলা বাড়ি। ডিজাইনটাও চমৎকার।

ফনা আর ফিনকি সেই বাড়ির সামনে এসে চুপটি করে দাঁড়াল। আর ভাবতে লাগল কী উপায়ে বাড়ির ভেতর ঢোকা যায়।

অনেক পরে সুযোগ মিলল। ওই বাড়ির ভেতর থেকে বেশ বড়সড় একটি মেয়ে রেশন কার্ড ও কেরোসিন তেলের জায়গা নিয়ে হনহন করে রাস্তা পার হয়ে গেল।

ওরা বুঝল এই সেই কাজের মেয়ে।

ফনা ফিনকি একটুও বিলম্ব না করে সেই সুযোগে টুক করে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভেতর। নীচে কাউকেই দেখতে না পেয়ে সোজা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল ওরা। গিয়ে দেখল এক মধ্যবয়সী সুন্দরী ভদ্রমহিলা তাঁর গদী বিছানায় আধশোয়া হয়ে গভীর মনোযোগে কী যেন একটা বই পড়ছেন। ওদের দেখেই বই রেখে সোজা হয়ে বসলেন তিনি। একটু কঠিন গলায় বললেন, 'অ্যাই! কে রে তোরা? ওপরে উঠে এসেছিস কোন সাহসে?'

ফনা ফিনকি একটুও ভয় না পেয়ে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আমরা চোর নই। চুরি করতে আসিনি।'

'তবে কী করতে এসেছিস? তোদের ভেতরে ঢুকতে দিল কে?'

'কেউ দেয়নি। আপনার বাড়ির কাজের ওই দিদিটা বাইরে গেল, সেই তালে ঢুকে পড়েছি।'

'তোদের সাহস তো কম নয়। যা বলছি এখান থেকে। আর কক্ষনো এইভাবে লোকের বাড়িতে ঢুকবি না। কী চাই তোদের?'

ফনা বলল, 'কিছু চাই না। আমরা আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছি।'

'কী খবর শুনি?'

ফনা প্রায় হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'আজ না, রাত্তিরবেলা আপনার এখানে ডাকাতি হবে। আপনার ওই কাজের দিদিটা রাত একটার সময় ডাকাতদের দরজা খুলে দেবে। ওরা আপনাকে খুনও করতে পারে।'

ভদ্রমহিলা মিসেস যোশী শিউরে উঠলেন সে কথা শুনে। ফনা ও ফিনকিকে আদর করে কাছে ডাকলেন, 'আয় তোরা আয়।'

ওরা কাছে এলে উনি বললেন, 'কিন্তু এসব তোরা কী করে জানলি, তোরা কারা?'

ফিনকি মিসেস যোশীর দিকে পিট পিট করে চেয়ে দেখতে লাগল। আর ফনা এক এক করে সব কথা খুলে বলল মিসেস যোশীকে।

সব শুনে মিসেস যোশী আদরে সোহাগে ওদের দুজনকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, 'আজ কিছুদিন ধরেই আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল। দু'জন লোক কেবলই নজর রাখছিল এই বাড়ির দিকে। একজনের চাপ দাড়ি, আর একজনের মুখে বসন্তের দাগ। তোরা এসে এই খবরটা আমাকে না দিলে আজই মরণ হত আমার। তোরা এক কাজ কর, পাশের এই ঘরটায় থেকে যা তোরা। ঘর থেকে একদম বেরোবি না। চুপচাপ থাকবি কিন্তু। বেশি কথা বলবি না। এখানে যা হোক দু'মুঠো খেয়ে ঘুমো। রাতের ঝামেলাটা মিটে যাক। তারপর...।'

ফনা ফিনকিকে মিসেস যোশী ফ্রিজ থেকে বের করে ডিসভর্তি সন্দেশ রসগোল্লা নিয়ে খেতে দিলেন। জল দিলেন। বললেন, 'বেশি কথা বলবি না কিন্তু কেউ, কেমন? পদি এলে ওকে আমি সামলাচ্ছি। কায়দা করে ওপরেই উঠতে দিচ্ছি না আর। তারপর থানায় গিয়ে ওদের ব্যবস্থা আমি করে আসছি।

ফনা আর ফিনকি তো বেজায় খুশি। একসাথে এত মিষ্টি ওরা কখনও খায়নি। এত কেন, একটা দুটোও কতদিন পেটে পড়েনি ওদের। খেয়েদেয়ে ওরা পাশের ঘরে ঢুকে পড়ল এবং চুপচাপই রইল।

মিসেস যোশী বললেন, 'থানা থেকে ঘুরে এসে তোদের আমি ভাত খেতে দেবো, কেমন? তোদের কথা শুনে হাত-পা যেন কাঁপছে আমার। কতদিন

ভেবেছি এখানকার পাট চুকিয়ে দিয়ে আমার দেশের বাড়ি নাগপুরে চলে যাবো। এখন ভাবছি, এই ঝামেলা মিটিয়ে তাই-ই যাবো আমি, আর নয়।'

অনেক পরে পদি এলে মিসেস যোশী ওপরের ঘরে তালা দিয়ে থানায় গেলেন। সেখান থেকে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর মুখ বেশ প্রসন্ন। এসেই তিনি পদিকে একটা কাজ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন একটু দূরে। তারপর ফনা ও ফিনকিকে নিজে হাতে তেল সাবান মাখিয়ে স্নান করিয়ে খেতে বসালেন।

একটু পরেই দু'জন সাদা পোশাকের মেয়ে পুলিশ সহ দু'জন পুলিশও এল। ওরা বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ম্যাডাম। আপনার গায়ে আঁচড়টিও লাগবে না। সন্ধ্যের পর থেকে বাইরেও পুলিশের নজরদারি থাকবে। শুধু সময়টাকে আসতে দিন।'

দেখতে দেখতে দুপুর গড়ালো। সন্ধ্যে পার হয়ে রাত্রি হল।

মিসেস যোশী পদিকে জানালেন, তাঁর আজ শরীর ভাল নেই। তাই তিনি ওপরের দরজা খোলা রেখেই শোবেন। ও যেন একটু সজাগ থাকে। ডাকা মাত্রই যেন উঠে আসে ও।'

পদি বলল, 'সে কী মা! আপনার শরীর খারাপ একথা শোনার পর তো ঘুমই হবে না আমার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি ডাক দিলেই আমাকে পাবেন।'

পদি নীচে নেমে গেল। ও যাবার কিছুক্ষণ পরেই দু'জন মেয়ে-পুলিশ লুকিয়ে রইল দরজার কাছাকাছি একটু সুবিধেমতো জায়গার দিকে।

সময় এগিয়ে এল।

রাত একটা নাগাদ দরজায় টোকা পড়তেই হন্তদন্ত হয়ে উঠে এসে দরজা খুলে দিল পদি।

একসঙ্গে চারজন ঢুকল বাড়ির ভেতর।

পদি বলল, 'কী ভাগ্য আমাদের। ম্যাডাম আজ শরীর খারাপের জন্য দরজা খোলা রেখেই শুয়েছেন। তবে বাপু একটা কথা, অযথা খুন-খারাবি যেন কোরো না। আর আমার ভাগটা আমাকে দিয়ে আমার হাত-পা বেঁধে রেখেই চলে যেও। পরে তোমরা যেদিন বলবে সেদিনই আমি হাওড়া স্টেশনে তোমাদের সঙ্গে দ্যাখা করব। নায়িকা না হই, ভালমতো একটা পার্ট যেন পাই।'

যার মুখে বসন্তের দাগ সে এবার কড়া গলায় বলল, 'ওসব কথা পরে হবে, এখন কোথায় কী আছে বল।'

পদি বলল, 'চলো ওপরে চলো। সব দেখিয়ে দেবো তোমাদের।'

ওরা পায়ে পায়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এল। দেখল, খাটের বিছানায় তখন চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন অগাধ সম্পত্তির মালিকানী। চারজনের একজন সেদিকে রিভলবার তাক করে একটানে চাদরটা সরিয়ে দিতেই চোখ কপালে উঠে গেল সকলের। দেখল সেখানে মিসেস যোশীর বদলে এক ষণ্ডাগুণ্ডা গোছের কে যেন শুয়ে আছে। ইনি যে পুলিশের লোক তা বুঝতে ওদের দেরি হল না। কেননা শায়িত ব্যক্তির হাতে তখন উদ্যত রিভলবার।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর থেকেও বেরিয়ে এল আরও এক সাদা পোশাকের পুলিশ। ইনি গোয়েন্দা বিভাগের একজন অফিসার। বললেন, 'হ্যান্ডস্ আপ। কেউ নড়াচড়া করবে না বা পালাবার চেষ্টা করবে না। এ বাড়ির চারদিক এখন পুলিশে ঘিরে আছে।' বলেই হুইসিল বাজালেন।

বাইরের পুলিশ সঙ্কেত পেয়েই ভেতরে ঢুকল এবার। এসে চারজনের হাতেই হাতকড়া পরালো।

মেয়ে-পুলিশরা চুলের মুঠি ধরে প্রহার করতে লাগল পদিকে।

ঠিক সেই সময় পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন মিসেস যোশী।

তাঁকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল পদি। বলল, 'মা! মা গো, আমাকে এবারের মতো ক্ষমা করুন মা। এবার থেকে আমি সৎপথে চলব। আপনার বিশ্বাস নিয়ে আপনার চরণ-ধোয়া জল খেয়ে আপনার সেবা করব। চন্দ্র-সূর্য সবাই সাক্ষী মা, আমি জানতাম না এরা এমন চোর-ডাকাত। আমাকে দয়া করুন মা।'

মেয়ে-পুলিশরা পদিকে লাথি মারতে মারতে নামিয়ে নিয়ে গেল। সেইসঙ্গে চলতে লাগল রুলের গুঁতো।

সবাই চলে গেলে একজন পুলিশ অফিসার বললেন, 'এবার আপনি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান ম্যাডাম। আর আপনার কোনও ভয় নেই।'

মিসেস যোশী পুলিশকে বিদায় দিয়ে নীচের দরজায় খিল ছিটকিনি লাগিয়ে পাশের ঘর থেকে ফনা ফিনকিকে এ ঘরে নিয়ে এলেন। তারপর

ওদের দুজনের গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তোদের তো কেউ নেই। আমারও কেউ নেই। এখন থেকে তোরা আমার এখানেই থাকবি। আর আমি যদি বাড়ি বেচে আমার দেশে চলে যাই, তোরাও যাবি আমার সঙ্গে। তোরা আর রাস্তার ছেলেমেয়ে নোস্। এখন থেকেই এ-বাড়ির সব।'

ফনা ও ফিনকির আনন্দ আর ধরে না।

পাশের অন্য একটি ঘরে আলাদা খাট-বিছানায় ওদের শোবার ব্যবস্থা হল। দু'জনে পাশাপাশি শুলে একসময় ফিনকি বলল, 'যাদের কেউ নেই তাদের জন্য ভগবান আছেন, কী বল ফনা?'

ফনা বলল, 'তাই তো দেখছি।'

'তবে একটা কথা, আর তো আমাদের কোনও দুঃখ নেই। তাই ওই বস্তিতে আগুন লাগানোর চিন্তাটা যেন মনেও আনিস না আর। ভগবানকে ডাক, এমন কোনও পরিস্থিতির মুখে যেন আমরা কখনও না পড়ি যাতে আমাদের কোনও খারাপ কাজ করতে হয়।'

ফনা বলল, 'ডাকলাম।' বলেই পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

একটু পরে ফিনকিও ঘুমিয়ে পড়ল। নরম গদীর বিছানায় এমন সুখের ঘুম ওদের জীবনে এই তো প্রথম।